রবিদাস সাহারায়

পান্না হীরে চুনী



পান্না হীরে চুণী

রবিদাস সাহারায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

PANNA HIRA CHUNI
by Rabidas Saharay
Rs. 18·00

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৯৪
মে, ১৯৮৭

Published by –
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta. 700007 (Ist floor)

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদচিত্র :
সুব্রত চৌধুরী

পরিকল্পনা :
দিব্যদ্যুতি পাল

আঠারো টাকা



অজানা রূপকথা

রবিদাস সাহারায়





কবেকার কথা কেউ তা জানে না। সন তারিখের সৃষ্টি হয়নি তখনও। চাঁদ দেখে চলত তখন দিনের গণনা, আর সূর্য দেখে চলত সময়ের হিসাব। সেই সময়কার কথা।

কাজেই কেউ মনে করে রাখেনি, কোন পণ্ডিত পুঁথিতে লিখে যাননি, কোন ভাস্করও তা খুদে রাখেনি পাথরের গায়ে।

এমনি করে দিন গেছে, মাস গেছে, বছর গেছে, যুগ-যুগান্তর পার হয়ে গেছে। তারপর মানুষ গেছে সব ভুলে।

সেই যুগের একটা কাহিনী।

এক দেশে ছিলেন এক রাজা। আর ছিলেন এক মন্ত্রী। সবাই হয়তো ভাববে, এটা হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কথা। কিন্তু না, তখনো হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর জন্ম হয়নি।

রাজা ছিলেন হবুরাম আর মন্ত্রী ছিলেন গবুরাম।

হবুরাম রাজা হলে কি হবে! বুদ্ধিতে একেবারে বোকারাম। মন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া এক পা চলতে পারেন না। গবুরামের পরামর্শ নিয়েই এক পা এগোন আবার গবুরামের কথাতেই এক পা পেছোন।

রাজা হওয়ার পরই সিংহাসনে বসে হবুরাম গবুরামকে জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রি, এবার আমাকে কি করতে হবে?

গবুরাম জবাব দিলেন—এবার সৈন্যদল গঠন করতে হবে।

সৈন্যদল কেন ? সৈন্য দিয়ে কি হবে ?—অবাক হয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

মন্ত্রী বললেন—বাঃ, সৈন্য লাগবে না ? সৈন্য না হলে রাজ্য রক্ষা করবে কে ?

তাও তো বটে !—রাজা মাথা চুলকাতে থাকেন।

রাজ ভাণ্ডারে টাকার অভাব নেই। কাজেই সৈন্যেরও অভাব হল না। সেনাপতি, কোটাল, দ্বাররক্ষী সব নিযুক্ত হল, দরজায় দরজায় বসল পাহারা।

সৈন্যও জুটল অনেক। এদিকে ওদিকে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায় তারা। রাজপ্রাসাদে একটি ইঁদুর বেড়াল ঢোকবারও উপায় নেই।

সৈন্যদের সর্দার হ'ল নিধিরাম।

ইয়া লম্বা তার চেহারা, প্রায় দেড়খানা লোকের সমান উঁচু। ইয়া লম্বা গোঁফ, তার ওপর ফড়িং বসলেও সে টের পায় না।

মস্ত বড় এক লাঠি নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় সৈন্যদের তদারক করতে। কেউ পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়লে লাঠির খোঁচা দিয়ে তাকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়। কেউ বাঁকা হয়ে দাঁড়ালে পিঠে কষে মারে এক লাঠি। বলে—দাঁড়া সোজা হয়ে !

তিরিক্ষি মেজাজ, ভারিক্কী চলাফেরা, নিধিরাম সর্দার সে। কিন্তু সৈনিকরা কেউ তাকে ভাল চোখে দেখে না। সামনে পড়লে মাথা নুইয়ে নমস্কার করে, আর পেছনে গিয়ে কলা দেখায়। কাছে থাকলে সম্মান দেখায় আর দূরে গিয়ে দেয় গালমন্দ। বলে—ব্যাটা যেন আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না ! কায়দায় পেলে একদিন দেখাব মজা।

একদিন সত্যি মজা দেখাল তারা।

তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। খবরদারি করতে করতে সেদিন

নিধিরামের পরিশ্রমও হয়েছে খুব। তাই খাটিয়ার এক কোণে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল।

একে খাটুনি, তার ওপর খাওয়াটা আজ একটু বেশি হয়ে গেছে। নেমন্তন্ন বাড়িতে মাংস, লুচি, দই, সন্দেশ খেয়েছে খুব পেট পুরে। কাজেই বিশ্রাম করতে করতে চোখ দুটো বুজে এল, আর একটু চোখ বুজতেই নাক ডাকা শুরু হল নিধিরামের।

নিধিরামের নাকের ডাক শুনে পা টিপে টিপে একজন সৈনিক গেল তার কাছে। নাকের উপর একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দেখল সত্যি ঘুমুচ্ছে কি না। তারপর একটা ধারাল কাঁচি দিয়ে নিধিরামের লম্বা গোঁফটি ঘঁ্যাচ ঘঁ্যাচ করে কেটে পালিয়ে গেল।

নিধিরাম রাতে কিছুই টের পায় নি।

পরদিন ভোর হতে না হতেই হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ঘুম থেকে উঠে সব কিছু করার আগে গোঁফে তা দেওয়া ছিল নিধিরামের রোজকার অভ্যাস।

কিন্তু সেদিন ঘুম থেকে উঠে যেই গোঁফে তা দিতে গেল অমনি হাত ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল। সর্বনাশ! আজ কোন অঘটন ঘটল নাকি? নিধিরাম অমনি ছুটে গেল আয়নায় মুখ দেখবার জন্য। মুখ দেখে আঁতকে উঠল। এ যেন নিজের মুখই নয়।

নিধিরামের মনে হল আয়নাটা বুঝি গোলমাল করছে। নইলে তার অমন সুন্দর মুখখানা এমন বেয়ারা দেখাবে কেন? কাজেই ছুটল ভাল আয়নার জন্য।

তখন কিন্তু কাঁচের আয়নার সৃষ্টি হয়নি। থালা-বাসন ঝকঝকে করে মেজে তাতেই সবাই মুখ দেখত। বার বার সেই আয়নায় মুখ দেখে যখন নিধিরাম টের পেল যে, তার অতি সাধের গোঁফ আর নেই, তখন সে হাউ-মাউ ক'রে কেঁদে ফেলল।

হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা রাজ্যে। সর্বনাশ! সর্দার কাঁদছে!

কোটালের কানে খবর গেল—সর্দার কাঁদছে!

মন্ত্রীর কানে খবর গেল। তারপর রাজার কানেও খবর গেল—সর্দার কাঁদছে।

কেন কাঁদছে! কেন কাঁদছে !!

না সর্দারের গোঁফ চুরি গেছে।

সর্দারের গোঁফ চুরি! এ তো ভয়ানক ব্যাপার। রাজা হবুরাম মন্ত্রী গবুরামকে জিজ্ঞেস করলেন—বলতো মন্ত্রী, এখন কি করা যায়?

মন্ত্রী বললেন—তদন্তের জন্য লোক পাঠান।

হবুরাম বললেন—তাই হোক।

কোটাল চলল, রাজার দেহ-রক্ষীরা চলল, এমন কি সেনাপতিও চললেন।

তদন্ত শুরু হল।

রাজা হুকুম করলেন—যে সর্দারের গোঁফ চুরি করেছে, ধরতে পারলে তাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে।

সর্বনাশ! কড়া হুকুম।

কে করলে এমন কাজ?

রাজ্যে এমন গুরুতর ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। কাজেই সবার মুখে এক কথা—কে করলে এমন কাজ?

তন্নতন্ন করে সব খোঁজা হল। রাজ্যের লোকদের জিজ্ঞেস করা হল। কেউ কিছু জানে না। আসামীর সন্ধান আর পাওয়া গেল না।

কোটাল ভয় পেয়ে গেল। সেনাপতির মুখও চুন। মন্ত্রী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

রাজা বললেন—রাজ্য থেকে দোষী খুঁজে বের করা গেল না? কি আশ্চর্যের কথা!

মন্ত্রী গবুরাম চিন্তাই করছেন। একবার মাথায় হাত রাখছেন, একবার ঘাড় চুলকোচ্ছেন। অনেকক্ষণ পর তিনি কথা বললেন—একটা উপায় বের করেছি মহারাজ।

রাজসভা সহসা যেন জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সবাই চুপ করে

তাকিয়ে রইল মন্ত্রীর দিকে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কি উপায় ?

মন্ত্রী বললেন—ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হোক, কেউ যদি অপরাধীকে খুঁজে বের করে দিতে পারে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে পঞ্চাশ মোহর।

রাজা বললেন—বেশ, তাই দেওয়া হোক।



এদিকে ব্যাপার হল কি, যে সর্দারের গোঁফ কেটেছিল, তার নাম বেচারাম। সে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল। কখন কে তাকে ধরিয়ে দেয়, সেই ভয়ে রাত্রে তার ঘুম হচ্ছিল না।

কিন্তু তার দলের সবাই খুব সেয়ানা। ঘুণাক্ষরেও কেউ কোন কথা ফাঁস করল না। কাজেই বেচারামের মনে সাহস হল। তখন একটা ফন্দি এল তার মাথায়। ফন্দিটা খুব ভাল করে এঁটে নিয়ে তারপর চুপি চুপি নিজেই একদিন রাজার কাছে গিয়ে বলল—মহারাজ, আমি অপরাধী ধরিয়ে দিতে পারি।

রাজার তো চক্ষুস্থির। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—পারবে তুমি ?

বেচারাম জবাব দিল—হ্যাঁ মহারাজ, নিশ্চয়ই পারব।

রাজা তখনই তাকে পঁচিশটি মোহর আগাম দিয়ে দিলেন। বললেন—নিয়ে যাও এই অর্ধেক পুরস্কার। কিন্তু যদি আসামী ধরিয়ে দিতে না পার তবে তোমাকেও জ্যান্ত মাটিতে পোঁতা হবে।

বেচারাম বলল—আমার সঙ্গে লোক দিন মহারাজ, আজকেই আমি আসামী ধরিয়ে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে যেন সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

সেনাপতি চললেন, কোটাল চলল, তাদের পেছনে পেছনে চলল হাজার হাজার সৈন্য।

বিরাট এক মিছিল।

এমন ব্যাপার রাজ্যে কখনো হয়নি। দেখে মনে হয় যেন কোন রাজা নতুন রাজ্য জয় করতে চলেছে।

মন্ত্রীও চললেন। তার পেছনে পেছনে চললেন রাজা। হাতি চলল, ঘোড়া চলল, পেছনে পেছনে ঘেউ ঘেউ করতে করতে চলল রাজ্যের যত সব কুকুর। প্রজারাও ছুটল পিছু পিছু।

হৈ-চৈ পড়ে গেল সারা রাজ্যময়। বেচারাম এগোয় আর তার পেছনে পেছনে সৈন্যরাও এগিয়ে চলে।

হঠাৎ এক জায়গায় বেচারাম দাঁড়াল। অমনি সৈন্যরাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যেখানে নিধিরাম সর্দারের গোঁফ চুরি গিয়েছিল, তার কাছেই এক জায়গায় বেচারাম চুপ করে বসল। সেখানে ছিল ছোট্ট একটি ইঁদুরের গর্ত।

একটা সরু কাঠি দিয়ে গর্তের ভেতর কি যেন খুঁজতে লাগল। তারপর টেনে বার করল নিধিরামের সেই হারানো গোঁফ।

চেঁচিয়ে উঠল বেচারাম—পেয়েছি! পেয়েছি!

সেনাপতি এগিয়ে এলেন। মন্ত্রীও এগিয়ে এলেন কাছে।

ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? সবাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল।

বেচারাম বলল—ব্যাপার আর কি? ইঁদুরই সর্দারের গোঁফ চুরি করেছে।

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন—তুমি জানতে পারলে কেমন করে?

বেচারাম বেশ একটু বিনয়ের ভাব দেখিয়ে বলল—দেখুন মন্ত্রীমশাই, আমি একটু আধটু জ্যোতিষ বিদ্যাও জানি। তাই গণনা করে জেনেছি যে, সর্দারের গোঁফ এই ইঁদুরের গর্তের ভেতর আছে।

কেমন করে এল?—জিজ্ঞেস করলেন সেনাপতি। সঙ্গে সঙ্গে কোটালও।

বেচারাম বলল—তবে শুনুন। সেদিন রাত্রে পাহারা দিতে দিতে নিধিরাম সর্দার ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাছেই ছিল এই ইঁদুরের গর্তটি। এমন তেল-ঘি মাখানো গোঁফ! ইঁদুরের ভারি লোভ হল। কুট্‌কুট্‌ করে গোঁফটি কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল।

সবাই থ' বনে গেল। মন্ত্রী আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন—সত্যি কথা বলছ?

সত্যি না তো মিথ্যে কথা বলছি? নইলে গোঁফ এই গর্তের ভেতর থেকে বের করলাম কেমন করে?—বেচারাম জবাব দিল।

সেনাপতি মাথা নাড়লেন—হ্যাঁ, তাও তো ঠিক কথা!

অমনি কোটালও মাথা নাড়ল—হ্যাঁ, ঠিক কথা!

এবার বেচারাম মহারাজ হবুরামের কাছে গিয়ে হাজির হল। বলল—এখন অপরাধীর সাজা দিন মহারাজ, আর আমারও পুরস্কার দিন।

মন্ত্রী বললেন—হ্যাঁ, অপরাধীর সাজা দিতেই হবে। রাজার বাক্য মিথ্যা হবে না। অমনি তিনি হুকুম করলেন—অপরাধীকে ধরা চাই। খুঁজে বের কর ইঁদুরকে।

আবার সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

শত শত লোক ছুটল কোদাল নিয়ে, হাজার হাজার লোক ছুটল খোন্তা নিয়ে মাটি খুঁড়ে ইঁদুর বের করতে। হৈ-হৈ করে মাটি খোঁড়া হতে লাগল।

কোদালের শব্দ হয় ঠন্ ঠন্! খোন্তার শব্দ হয় খন্ খন্।

একটু একটু করে এক ক্রোশ দু' ক্রোশ, এমন কি দশ ক্রোশ মাটি খোঁড়া হয়ে গেল, তবু ইঁদুরের দেখা নেই।

সবাই বলল—এখন কি হবে?

সেনাপতি বললেন—ইঁদুর পালাবে কোথায়? চালাও জোরে কোদাল।

আবার চলল মাটির ওপর শয়ে শয়ে কোদালের কোপ, হাজার হাজার খোন্তার কোপ। দেখতে দেখতে প্রায় অর্ধেক রাজ্যটাই খুঁড়ে ফেলা

হল। এবার পাওয়া গেল ইঁদুর।

বেচারাম বলল—মহারাজ, এই সেই ইঁদুর। এই পুঁচকে জানোয়ারটাই বেচারাই সর্দারের গোঁফ কেটেছে।

শুধু কাটেনি, চুরিও করেছে!

চুরিও করেছে!—সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল হাজার হাজার লোক।

সৈন্যদের ভেতর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তারা ইঁদুরটাকে বেঁধে, লোহার খাঁচায় পুরে নিয়ে এল রাজদরবারে।

সেই ইঁদুরটাকে দেখবার জন্য ভিড় করতে লাগল হাজার হাজার লোক। অনেক কষ্টে তাদের হটিয়ে দেওয়া হল।

এবার শুরু হল বিচার।

যে ক'জন সৈনিক নিধিরাম সর্দারের ওপর মনে মনে চটে ছিল তারা এবার সুযোগ বুঝে রাজদরবারে এগিয়ে এল। হাত জোড় করে বলল—মহারাজ, সুবিচার যেন হয়।

হবুরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কিসের সুবিচার?

সৈনিকরা বলল—নিধিরাম সর্দার তার কর্তব্য কাজে অবহেলা করেছে।

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন—কাজে অবহেলা করেছে? তোমরা তা বুঝলে কেমন করে?

সৈনিকরা জবাব দিল—সে পাহারা দেবার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। নইলে ইঁদুরে তার গোঁফ কাটল কি করে? এর বিচার করতে হবে।

রাজা বললেন—সত্যি তো! এ ব্যাপারটা তো আমার মাথায় আসেনি।

কোটাল বলল—সত্যি তো, এর বিচার দরকার। বেচারামও কাঁচুমাচু হয়ে বলল—হ্যাঁ মহারাজ, এরও বিচার করতে হবে।

রাজা সমস্যায় পড়লেন। মাথা চুলকাতে চুলকাতে মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—এখন কি করা যায় মন্ত্রি? কোন্ বিচারটা আগে করা দরকার?

বেচারাম জবাব দিল—সর্দারের বিচারটাই আগে করা দরকার মহারাজ। কারণ তার অপরাধটাই আগে ঘটেছে। আগে ঘুম তারপর গোঁফ চুরি।

মন্ত্রী বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লেন—হ্যাঁ, সত্যি কথা।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—তা হলে এর কি বিচার করা যায়?

মন্ত্রীও মাথা চুলকাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ মাথা চুলকানোর পর তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বললেন—একটা বিচার করা যায় মহারাজ—

রাজা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি বিচার?

মন্ত্রী একটু থেমে বললেন—আবার গোঁফ না গজানো পর্যন্ত নিধিরাম সর্দারি করতে পারবে না। কারণ, গোঁফ ছাড়া তাকে মোটেই মানায় না।

রাজা খুশী হয়ে বললেন—হ্যাঁ, এই বিচারই ঠিক। সত্যি তোমার বুদ্ধি আছে মন্ত্রী।

বিচার শুনে নিধিরাম কপাল চাপড়াতে লাগল। হায়রে, গোঁফও গেল, চাকরিও গেল। কী পোড়া কপাল! ওদিকে বেচারাম আর তার দলের লোকেরা মনের খুশীতে যার যার নিজের গোঁফে তা দিতে লাগল।

এবার হল ইঁদুরের বিচার। ইঁদুরটাকে জ্যান্ত মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হল আর বেচারাম পেল আরও পঁচিশটি মোহর পুরস্কার।

হ্যাঁ, ভাল কথা। বেচারাম আরও কিছু পেল। সে তো ছিল সৈনিক; এবার তাকে করা হল সরফরাজ। এটা কম কথা নয়। সে বুদ্ধি দেবে মন্ত্রীকে, বুদ্ধি দেবে রাজাকে। এমন কি ইচ্ছে করলে দু'একটা লোকের মুণ্ডুও কেটে ফেলবার হুকুম দিতে পারে সে।

বেচারাম এবার আনন্দে তিড়ি-বিড়িং নাচতে শুরু করে দিল।

এদিকে নিধিরাম বেচারার অবস্থা কাহিল। সে গোঁফের শোকে দশ দিন দশ রাত্তির ঘুমুল না, খেল না, এমন কি জল গ্রহণও করল না। তারপর রাজার লোকেরা বলে কয়ে তাকে ভাত খাওয়াল। পাড়াপড়শীরা এসে তাকে ঘুম পাড়াল।

আবার সর্দারি পাওয়ার আশায় নিধিরাম গোঁফে তেল মাখতে শুরু করল। গোঁফটা তাড়াতাড়ি লম্বা করবার জন্য গেল বদ্যির কাছে ওষুধ আনতে।

বুড়ো জবুথবু বদ্যি। বয়েস পাঁচকুড়ি কি দশকুড়ি তা বোঝা মুশকিল। তবু বুড়োর অসাধারণ ক্ষমতা, রোগীদের দূর থেকে দেখেই রোগ চিনতে পারে।

বদ্যির দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতেই নিধিরামকে সে পাগল বলে ঠাউরে নিল। তাই চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল—ভৃঙ্গরাজের রস দশ ফোঁটা, গোরোচনা পাঁচ ফোঁটা আর মধু তিন ফোঁটা।

তারপর নিধিরামকে শুইয়ে দিল মাটির ওপর। নাড়ী পরীক্ষা করল, পেটে টোকা মারল, চোখের পাতা উল্টিয়ে দেখল। কিন্তু কিছুতেই কোন রোগের হদিস না পেয়ে বলল—ঐ ওষুধই খাবে রোজ তিনবার করে।

নিধিরাম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠল—ওতেই আমার গোঁফ তাড়াতাড়ি বড় হবে?

গোঁফ? বদ্যি বুড়োর চোখ কপাল ছেড়ে মাথায় ওঠবার যোগাড় হল।

হ্যাঁ, গোঁফ!—নিধিরাম বলল—আমার গোঁফ আগের মতো ভাল হবে তো? বেশ বড় আর তাগড়াই হবে তো?

বদ্যি বুড়ো এবার সত্যি পড়ল বিপদে। বলেই ফেলল—গোঁফেরও আবার অসুখ হয় নাকি?

—আজ্ঞে গোঁফের অসুখ হয়নি। গোঁফটা ইঁদুর কেটেছে। আমার বড় সাধের গোঁফ, সেটাকে আবার তৈরি করতে চাই।

বুড়ো বদ্যি ভুরু কুঁচকে বলল—ইঁদুর খেয়েছে? নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে

ইঁদুর, না ছুঁচো? সর্বনাশ! ছুঁচোর মুখ ভারি অপয়া! ছুঁচোতে খেলে সেটা তো আর বড় হবে না। গোঁফটা সবটুকু চেঁচে ফেলে দিলে যদি আবার গজায়।

নিধিরাম ভয় পেয়ে গেল—সর্বনাশ, যেটুকু আছে সেটুকুও তা হলে ফেলে দিতে হবে?

—হ্যাঁ, ভাল চাও তো সবটুকু ফেলে দাও, নইলে একবার ছুঁত লেগে গেলে আর রক্ষা নেই।

নিধিরাম কি আর করবে! সবটুকু গোঁফ চেঁচে ফেলে দিয়ে গোমড়া মুখে বাড়ি ফিরে এল। গোঁফের ওষুধ আনতে গিয়ে যে তার বাকি গোঁফটুকুও খোয়াতে হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

যাই হোক, সে দিন গুনতে লাগল কবে আবার গোঁফ গজাবে, কবে সেই সর্দারি আবার ফিরে পাবে। এমনি করে গোঁফের কথা ভাবে আর সারারাত গোঁফের স্বপ্ন দেখে।



একদিন রাজা হবুরাম সিংহাসনে বসে আছেন। মন্ত্রী গবুরাম বসে আছেন পাশে। সেনাপতি বসেছেন একটু দূরে। প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে।

হবুরাম জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রি, এবার কি করতে হবে?

গবুরাম জবাব দিলেন—এবার অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে হবে।

—অস্ত্রশস্ত্র কেন?

—রাজ্য রক্ষা করতে হবে তো?

—কেন, রক্ষা তো হচ্ছেই।

—যদি অন্য কোন রাজা আমাদের রাজা আক্রমণ করে?

—সর্বনাশ! আরো রাজা আছে নাকি কেউ?

—হয়তো থাকতে পারে। সসাগরা পৃথিবীর সব খবর কি আমরা জানি ?

—কেন, কেউ কি বলতে পারে না সে খবর ?

সবাই মহা ভাবনায় পড়ে গেল।

সেনাপতি এবার মুখ খুললেন। বললেন—মহারাজ, ডাকুন বেচারামকে। সে তো গুনতে পারে, গুনে বলুক আর কোন্ কোন্ রাজ্য আছে পৃথিবীতে।

রাজা বললেন—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ সেনাপতি, তুমি ভাল কথা মনে করেছ। এজন্য দিলাম তোমাকে দশটি মোহর পুরস্কার।

এবার ডাক পড়ল বেচারামের। জরুরী ডাক। বেচারাম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

রাজা বললেন—বেচারাম, গুনে বল তো আমার মতো কে আর রাজা আছে পৃথিবীতে ?

বেচারামের মুখ শুকিয়ে গেল। সে যে কিছুই জানে না। ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে এতকাল। হায়রে, এবার বুঝি সব ফাঁকি ধরা পড়ে যায় !

কিন্তু বেচারাম ভারি চালাক। মনের ভাব গোপন করে বলল—মহারাজ, আমি গুনে দিতে পারি, কিন্তু কিছুদিন সময় দিতে হবে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কতদিন সময় লাগবে ?

বেচারাম বলল—আজ্ঞে, তিন মাস।

রাজা চোখ কপালে তুলে বললেন—বা-ব্বা ! এতদিন সময় ?

বেচারাম বলল—হ্যাঁ মহারাজ। বড় কঠিন গণনা কি-না !

—আর কিছু কম সময়ে হয় না ? এদিকে যে মন ছটফট করছে।

বেচারাম মাথা চুলকিয়ে ভাবতে লাগল। একটু ইতস্ততঃ করে তারপর বলল—কিছু পুরস্কার আগাম দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কত চাও ? দশটি মোহর দিলে পারবে ?

—আজ্ঞে না, পঁচিশটি।

—আচ্ছা, পঁচিশটি মোহরই দিচ্ছি। সময় লাগবে ক'দিন ?

—এক মাস।

শেষে এক মাস সময়ই মঞ্জুর হল।

রাজা বললেন—দেরি করলে তোমার মুণ্ডু কাটা যাবে।

বেচারাম রাজী হয়ে চলে গেল। মনে মনে ভাবল, যাই হোক, তবু একমাস সময় পাওয়া গেল। এই একটা মাস তো নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারবে। তারপর কপালে যা থাকে তাই ঘটবে।

বেচারী বেচারাম কি আর করবে ? খায়-দায়, ঘুমোয় আর রাজার কাছে কি বলবে মনে মনে ফন্দি আঁটে।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন করে একমাস কেটে গেল।

এবার রাজা ডেকে পাঠালেন বেচারামকে।

দুরু দুরু করছে বুক, তবু বেচারাম গিয়ে হাজির হল রাজসভায়।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—গণনা শেষ হয়েছে?

বেচারাম জবাব দিল—হ্যাঁ মহারাজ, হয়েছে। মুখে বলল বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে বুকটা তার শুকিয়ে উঠল।

মহারাজা একটু নড়েচড়ে বসলেন। মন্ত্রী গোঁফ জোড়া পাকাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রাজা বললেন—গণনা করে কি পেয়েছ বলো ?

বেচারাম বলল—গণনায় যা পেয়েছি তা আপনাদের সামনেই আঁক কষে দেখাতে চাই।

রাজা বললেন—বেশ দেখাও।

বেচারাম খড়িমাটি দিয়ে মেঝের উপর হিজিবিজি দাগ কাটতে লাগল। তারপর গালে হাত দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। শেষে গম্ভীর হয়ে বলল—মহারাজ, এ দেশের ঠিক উত্তরেও নয়, ঠিক দক্ষিণেও নয়, তার মাঝামাঝি আছে এক রাজ্য।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ দিকে ? পশ্চিমে ?

—না, ঠিক পশ্চিমেও নয়, পুবেও নয়, তারও মাঝামাঝি।

—কত দূরে ?

—এখান থেকে বারো হাজার বারোশো বাহান্ন ক্রোশ হতে পারে কিংবা তেরো হাজার তেরোশো তিপান্ন ক্রোশও হতে পারে! সেখানে এক রাজা আছে।

—সর্বনাশ! কি রকম রাজা? আমার মতো?

—না, আপনার চেয়েও বড় রাজা, জোয়ান রাজা।

—কি তার নাম?

এবার বেচারাম সত্যি বিপদে পড়ে গেল। একটা রাজার মতো মানানসই নাম তার মনে এল না। কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বলল—নামটা এখনো গণনায় পাওয়া যায়নি। তবে শীগ্‌গিরই পাওয়া যাবে।

—কেমন করে?

—সেই রাজা বারো হাজার বারোশো বারো জন সৈন্য নিয়ে আপনার দেশ দখল করতে আসবে।

—তাই নাকি?···সভার প্রায় সকলে চেঁচিয়ে উঠল।

হ্যাঁ! বেচারাম বলল—যখন সেই রাজা পাঁচশো পাঁচ ক্রোশের মধ্যে এসে পড়বে তখন আমার গণনায় তার নাম পাওয়া যাবে।

ভয়ে হবুরামের মুখ শুকিয়ে গেল। মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রি, তাহলে এবার কি উপায় হবে?

মন্ত্রী বললেন—অস্ত্র তৈরি করতে হবে। কারণ বিদেশী সৈন্যদের রুখতে হলে আমাদের অনেক অস্ত্রের দরকার।

রাজা বললেন—তবে তাই হোক। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।



রাজার হুকুম। দলে দলে কামার এল।

মন্ত্রী বললেন—অনেক নতুন নতুন অস্ত্র তৈরি করতে হবে।

কামারেরা তো অবাক। অস্ত্র বলতে তারা বোঝে দা আর লাঠি। কাজেই তারা মহা ভাবনায় পড়ল। আবার কি অস্ত্র তৈরি করবে তারা?

তবে হ্যাঁ, তীর ধনুকের প্রচলন তখন হয়েছে। এবার ডাণ্ডা লাগিয়ে বড় বড় তীরের মতো অস্ত্র তৈরি হতে লাগল। যাতে ধনুকে না লাগিয়েই সে অস্ত্র ছোঁড়া যায়, লোককে খোঁচা মেরে ঘায়েল করা যায়।

সেই থেকে তৈরি হল বর্শা বা সড়কি। আর তৈরি হল বড় বড় রামদা।

হবুরাম এবার নিশ্চিন্ত হলেন।

এবার নিধিরাম সর্দারের কথা একটু বলি, কেমন?

তার আবার গোঁফ গজাচ্ছে। কাজেই মন তার খুব খুশী। নতুন গজানো ছোট ছোট গোঁফ রোজ আয়নায় দেখে আর গুন্ গুন্ করে গান গায়।

এমনি করে দিন যায় আর গোঁফ বাড়ে। শেষে সত্যি তার আগের মতো গোঁফ গজিয়ে উঠল।

নিধিরাম সর্দারের মনে আহ্লাদ আর ধরে না। সে প্রায় নাচতে নাচতে ছুটে গেল রাজার সভায়।

মন্ত্রী বললেন—উহুঁ, ঠিক আগের মতো গোঁফ হয়নি এখনও। দর্জিকে ডেকে দেখাতে হবে।

দর্জি এল। এসেই একটি ফিতে বের করে নিধিরামের গোঁফ মাপতে লাগল।

মাপ শেষ হলে বলল—ডাইনে দু' আঙুল আর বাঁয়ে দেড় আঙুল বাড়লে ঠিক আগের মতো হবে।

নিধিরাম দেখল, মহা বিপদ। এত পরিশ্রম করে এতদিন ধৈর্য ধরে এতটা গোঁফ তৈরি করা হল, আবার ডাইনে দু' আঙুল আর বাঁয়ে দেড় আঙুল বাড়াতে কতদিন লাগবে কে জানে?

এ জীবনে আর তা হলে তার সর্দারি করাই হবে না।

নিধিরাম উপায় না দেখে এবার রাজার পায়ে গিয়ে পড়ল—মহারাজ আমাকে দয়া করুন। সর্দারি না দিলে আমাকে স্ত্রী পুত্র নিয়ে উপোস

করে মরতে হবে। আজ আমি আপনার পায়ে মাথা কুটে মরব।

রাজার দয়া হল। নিধিরামকে সর্দারি পদে বহাল করলেন।

আবার সর্দার হল নিধিরাম। এবার আর বাঁশের লাঠি নয়। এক হাতে বর্শা আর এক হাতে রামদা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে। এমনি করে সৈন্যদের দেখাশোনা করে। সৈন্যদের হাতেও আর বাঁশের লাঠি নেই। তাদের হাতেও বর্শা। রাজ্যের চেহারাই যেন বদলে গেছে।

নিধিরাম কিন্তু বেচারামের ওপর মোটেই খুশী নয়। সেই ইঁদুরের গর্ত থেকে গোঁফ বার করার পর থেকেই নিধিরাম তাকে আর দু' চোখে দেখতে পারে না।

নিধিরাম এখন দিনরাত ভাবতে লাগল কেমন করে বেচারামকে রাজার সভা থেকে তাড়ানো যায়!

এদিকে হল কি, রাজার কাছে বেচারামের কদর দিন দিন বাড়তেই লাগল। রাজা এখন বেচারামকে সব সময় কাছে কাছে রাখেন। রাজার আর মন্ত্রীর সিংহাসনের কাছেই বেচারামের জন্য আসন তৈরি হল।

এইভাবে দিন যায়। মাঝে মাঝে রাজা জিজ্ঞেস করেন—বেচারাম, সেই ভিন্‌দেশী রাজা আজ কতদূর এগিয়ে এল?

বেচারাম গালে হাত দিয়ে চিন্তা করার ভান করে। তারপর ভারিক্কি মেজাজে বলে—এই তো মহারাজ প্রায় সাত ক্রোশ এল।

পরের দিন আবার রাজা জিজ্ঞেস করেন—আজ ক'ক্রোশ এসেছে?

বেচারাম জবাব দেয়—আজ তিন ক্রোশ।

মহারাজের মুখ আনন্দে ভ'রে ওঠে। বলেন—আজ এত কম কেন?

বেচারাম বলে—সৈন্যরা খুব খেয়েছে, তারপর বিশ্রাম করেছে, সেই জন্য ঘুম থেকে উঠতেও দেরি করেছে তারা। তাই বেশি পথ আজ এগুতে পারেনি।

পরের দিন আবার জিজ্ঞেস করেন রাজা—আজ ক'ক্রোশ?

বেচারাম জবাব দেয়—আজ দশ ক্রোশ।



নিধিরামের লম্বা গোঁফটি ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কেটে ফেলল।



হবুরাম জিজ্ঞেস করলেন—আজ ঐ রাজার সৈন্যরা কতদূর এগিয়েছে ?

কথা শুনে রাজার মুখ শুকিয়ে যায়। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পান না।

পরের দিন আবার জিজ্ঞেস করেন রাজা—বেচারাম, আজ ঐ রাজার সৈন্যরা কতদূর এগিয়েছে ?

বেচারাম জবাব দেয়—আজ মোটে এক ক্রোশ এগিয়েছে মহারাজ।

খুশি হয়ে রাজা জিজ্ঞেস করেন—আজ এত কম কেন ?

মাথা চুলকিয়ে বেচারাম বলে—মহারাজ, আজ একটা নদীর সামনে এসে তারা আটকে গেছে। কিছুতেই পার হতে পারছে না।

তাই নাকি ? রাজা আরও খুশী হয়ে ওঠেন। শেষে মন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলেন—ওরা আটকে থাকলেই ভালো হয়, কি বলো মন্ত্রি ?

মন্ত্রী মুচকি হেসে জবাব দেন—সে কি আর বলতে !

বেচারাম বলল—কিন্তু এরা বেশিদিন আটকে থাকবে না। শীগগিরই নদী পার হবার ব্যবস্থা করছে।

রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন করে ?

বেচারাম বলল—নৌকার যোগাড় হলেই পার হতে পারবে।

রাজা এবার মাথা দুলিয়ে বললেন—তা হলে ওদের খুব বুদ্ধি আছে বলতে হবে।

বেচারাম বলল—হ্যাঁ, বুদ্ধি আছে বৈকি !

এমনি ক'রে দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়।

এদিকে সেনাপতি, কোটাল আর সর্দাররা রাম দা আর বর্শার বোঝা বয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। একে তো বর্শাটাও ভারী, তার ওপর রাম দাটা এমন বেয়াড়া যে সেটাকে কোমরেও ঝুলিয়ে রাখা যায় না, হাতে ধরে ঘোরানোও চলে না। মহা মুশকিল !

তারা তখন রাজার কাছে প্রস্তাব করল—মহারাজ, এর চেয়ে হাল্‌কা কোন অস্ত্র তৈরি করতে হবে।

হাল্‌কা অস্ত্র ? তা কেমন করে হবে ?

তিন মাস ধরে রাজসভায় পরামর্শ চলল। কেউ কোন বুদ্ধি ঠিক করতে পারল না।

তখন রাজ্যের সব কামারদের ডেকে আনা হল। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে—পারবে তোমরা কোন হাল্‌কা অস্ত্র তৈরি করতে?

কেউ কিছু বলতে পারল না।

শেষে এক বুড়ো কামার এগিয়ে এসে বলল—মহারাজ, আমি পারব।

রাজা খুশী হয়ে বললেন—বেশ, যদি পারো তবে তোমাকে পুরস্কার দেব।

বুড়ো কামার হাত জোড় করে বলল—মহারাজ, আমাকে এক মাস একুশ দিন সময় দিতে হবে।

রাজা বললেন—এক মাস একুশ দিন সময়? এ যে অনেক দিন।

কামার বলল—তার আগে করলে ভালো অস্ত্র তৈরি হবে না।

রাজা বললেন—বেশ, তাই হবে। এই নাও দশ মোহর আগাম। অস্ত্র খুব ভালো হওয়া চাই।

—হ্যাঁ, খুব ভালো হবে মহারাজ।

দশ মোহর অগ্রিম নিয়ে বুড়ো কামার চলে গেল।

যত দিন যায় রাজা অধৈর্য হয়ে ওঠেন।

হিসাব করেন কবে এক মাস একুশ দিন পূর্ণ হবে। আর ওদিকে বেচারামের কাছে খোঁজ নেন, বিদেশী রাজার সৈন্যরা কতদূর এগোল।

ঠিক এক মাস একুশ দিন পর বুড়ো কামার একটা অস্ত্র এনে হাজির করল রাজসভায়। অস্ত্রটি ঠিক রামদার মত লম্বা কিন্তু সরু। রামদার চেয়ে অনেক হাল্‌কা।

রাজা দেখে খুশী হলেন। খুশী হল সবাই।

সেনাপতি সেটাকে হাতে ধরে খানিকটা ঘুরিয়ে নিলেন। বাঃ! বেশ তো ঘোরানো যায়!

মন্ত্রীও একটু ঘুরিয়ে দেখলেন—বাঃ, বেশ তো!

রাজা বুড়ো কামারকে একশো মোহর পুরস্কার দেবার আদেশ দিলেন।

বুড়ো কামার জীবনে এত মোহর কখনো চোখে দেখেনি। সে তো মহা খুশী।

রাজা তাকে আরও অস্ত্র তৈরি করতে আদেশ দিলেন।

ভয়ানক খুশী হল বুড়ো কামার। কিন্তু সে চালাকও কম নয়। সে কি করলে জানো? ঠিক এক মাস একুশ দিন পর পর একটি অস্ত্র এনে হাজির করে আর একশো করে মোহর নিয়ে বাড়ি যায়। তার আগে আসে না কখনও। প্রথমটায় পেয়েছিল একশো দশ মোহর। এখন পাচ্ছে একশো। ঘন ঘন এলে রাজার কাছে অস্ত্রের দাম কমে যাবে, পুরস্কারও কম পাওয়া যাবে, সেজন্য সে আসে ঠিক এক মাস একুশ দিন পরে।

এক মাস একুশ দিন যায়, আর একটি করে অস্ত্র তৈরি হয়।

এই অস্ত্রই হল তরোয়াল। ছ' মাসে অস্ত্র তৈরি হল মাত্র তিনটি।

প্রথম তরোয়ালটি রাজা নিজে দড়ি বেঁধে কোমরে ঝুলিয়ে রাখলেন। দ্বিতীয়টি মন্ত্রী আর তৃতীয়টি নিলেন সেনাপতি।

কোটালও একটি তরোয়ালের জন্য কান্নাকাটি করতে লাগল।

তাকে তরোয়াল দেওয়া হবে কিনা সেজন্য গোপন পরামর্শ শুরু হল। কারণ তরোয়াল তো আর সবাইকে দেওয়া যায় না। তরোয়াল থাকা যে একটা মস্ত বড় সম্মানের ব্যাপার।

অনেক পরামর্শের পর ঠিক হল কোটাল একটা তরোয়াল পাবে আর তার সঙ্গে পাবে একটা ঢাল। কারণ নগর রক্ষার ব্যাপারে তাকে সর্বদাই ঘোরাফেরা করতে হয়। কখন কি বিপদ ঘটে কে জানে? কাজেই ছোটখাট একটা ঢালও দরকার।

কোটাল তো ঢাল-তরোয়াল পেল, নিধিরামের হল চক্ষুশূল। কোটাল ঢাল হাতে নিয়ে তরোয়াল কোমরে বেঁধে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ায়। তা দেখে নিধিরাম জ্বলে পুড়ে মরে।

লোকে নিধিরামকে ঠাট্টা করে বলে—ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, সে হল নিধিরাম সর্দার।

নিধিরাম ক্ষেপে ওঠে। হাতে লাঠি নিয়ে গাঁয়ের পথ দিয়ে যখন সে যায় তখন গাঁয়ের ছেলেরাও চেঁচিয়ে ওঠে—দেখ দেখ, আমাদের সর্দার কেমন! ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার!

নিধিরাম লাঠি হাতে নিয়ে তেড়ে যায় ছেলেদের দিকে। ছেলেরা ছুটে পালিয়ে যায় ঝোপের আড়ালে, বাড়ির আনাচে কানাচে।

একদিন নিধিরাম নিরুপায় হয়ে রাজার দরবারে গিয়ে হাজির হল।



রাজসভায় রাজা বসে আছেন, মন্ত্রী বসে আছেন আর বসে আছে পারিষদরা। এমন সময় নিধিরাম সেখানে গিয়ে হাজির হল। মুখ গম্ভীর, যেন কাঁদো কাঁদো ভাব।

তাকে এ অবস্থায় দেখে রাজা জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি হে নিধিরাম?

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন—কি হল তোমার?

নিধিরাম ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

ব্যাপার দেখে রাজসভার সবাই অবাক।

কান্না আর নালিশের পালা শেষ হলে নিধিরাম তার দাবি জানাল, তারও ঢাল-তরোয়াল চাই। নইলে তার মান থাকবে না।

রাজা ও মন্ত্রী মহাভাবনায় পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে জরুরী সভা ডাকা হল। সেই সভায় ঠিক হল যে, নিধিরামকেও ঢাল-তরোয়াল দেওয়া উচিত।

এদিকে নিধিরাম ঢাল-তরোয়াল পাবে শুনে বেচারাম কিন্তু হিংসায় জ্বলে উঠল। সে মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগল, কি ভাবে এটাকে

বন্ধ করা যায়। অনেক ভেবেচিন্তে পরদিন সে গিয়ে হাজির হল হবুরামের কাছে। বলল—মহারাজ, নিধিরামকে ঢাল তরোয়াল দেওয়া উচিত হবে না।

কেন ?—হবুরাম জিজ্ঞেস করলেন।

—আমি গুনে দেখলাম, তাকে অস্ত্র দিলে রাজবংশের হানি হবে।

তাই নাকি ?—রাজা শিউরে উঠলেন—সর্বনাশ! তা হলে তো কিছুতেই দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ভাল করে গুনে দেখেছ তো ?

বেচারাম বলল—হ্যাঁ, খুব ভাল করে গুনে দেখেছি।



কিন্তু নিধিরাম নাছোড়বান্দা। যেই সে শুনতে পেল রাজা তাঁর মত বদল করেছেন, অমনি সে আবার ছুটে গেল রাজদরবারে। কেঁদে কেটে সে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

মন্ত্রীর মনে একটু দয়া হল। তিনি রাজাকে বললেন—কিছুতেই কি এর একটা ব্যবস্থা করা যায় না মহারাজ ?

আবার ডাক পড়ল বেচারামের। সব কথা শুনে সে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল—হ্যাঁ যায়, তবে সেই তরোয়ালটা আমাকে দিয়ে পরখ করিয়ে নিতে হবে।

কি রকম ?—সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

বেচারাম বলল—আমি নাকে শুঁকে দেখব যে সেই তরোয়ালের ভেতর কোন দোষ আছে কিনা। যদি না থাকে তবে সেটা দেওয়া যাবে নিধিরামকে। নইলে যে কোন তরোয়াল নিয়ে সে অনর্থ বাধিয়ে বসবে।

শেষে তাই স্থির হল। বুড়ো কামারকে বলা হল তরোয়াল তৈরি

করতে। সে একমাস একুশ দিন পরে তরোয়াল এনে হাজির করল।

নিধিরামের তর্ সয় না। এক মাস একুশ দিন অতি কষ্টে অপেক্ষা করে খুশী মনে নির্দিষ্ট দিনে এসে উপস্থিত হল রাজদরবারে।

বেচারাম তরোয়ালটা হাতে নিয়ে নাকের সামনে ধরে শুঁকতে লাগল। ছ'তিনবার শুঁকে বলল—না, এ চলবে না।

রাজা বললেন—কেন ?

মন্ত্রী বললেন—কেন ?

বেচারাম জবাব দিল—এই তরোয়ালে অনেক কিছু দোষ রয়েছে।

নিধিরামের মন দমে গেল। রাজা কামারকে হুকুম দিলেন—আর একটা তরোয়াল বানাও।

আবার এক মাস একুশ দিন পর বুড়ো কামার এনে হাজির করল আর একটি তরোয়াল।

বেচারাম এবারও বলল—না, এটাতেও চলবে না।

বুড়ো কামার ভারি বেকুব বনে গেল। এমনটি তো আগে কখনো হয়নি।

রাজা খবর পাঠালেন রাজ্যের সব কামারকে। ছুটতে ছুটতে ঘামে নেয়ে কামাররা সব এসে হাজির হল।

রাজা নিজের তরোয়ালটা দেখিয়ে বললেন—এই রকম একটা তরোয়াল তৈরি করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি—

রাজার হুকুম। কামারদের ঘরে ঘরে তরোয়াল তৈরি হতে লাগল। হাতুড়ির খটাখট আর লোহার ঝন্ঝন্ কন্কন্ শব্দে রাজ্যের লোকদের কানে তালা লাগার যোগাড়! কিছুদিন তো রাত্রে কেউ ঘুমুতেই পারল না।

কয়েকদিনের মধ্যেই তরোয়াল তৈরি করে নিয়ে কামাররা দলে দলে আসতে লাগল রাজবাড়ির দিকে।

বেচারামকে খবর দেওয়া হল তরোয়াল পরখ করবার জন্য। সে এসে ভারিক্কী চালে বসে রইল।

কামাররা এক একটি তরোয়াল এনে তার কাছে হাজির করে, আর সে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে বলে—না, এতে চলবে না।

এমনি করে যত তরোয়াল তৈরি হয়েছিল, সবই গেল বাতিল হয়ে। কামারের দল মুখ নিচু করে যার যার বাড়ি চলে গেল।

এদিকে বেচারাম চুপি চুপি দু' একজন কামারকে ডেকে বলল—দেখ, কেউ যদি দশটি মোহর আর দশ ধামা ধান আমাকে ঘুষ দিতে পার, তবে তার তরোয়াল আমি মঞ্জুর করতে পারি। তবে সাবধান, এ ঘুষের কথা কেউ যেন রাজা বা মন্ত্রীর কাছে বলো না। তাহলে কিন্তু কারুর ঘাড়েই মুণ্ডু থাকবে না। জানো, আমি গুনতে পারি?

কামাররা সবাই গরীব। তারা কেমন করে দেবে মোহর আর ধান? কাজেই তারা সবাই চুপ করে রইল। আবার মুণ্ডু যাওয়ার ভয়ে রাজার কাছেও কেউ নালিশ করতে সাহস পেল না।

সেই বুড়ো কামার কিন্তু তার অপমানের কথা ভোলেনি। সে পুরনো একটা তরোয়াল ঘষে-মেজে ঝক্ঝকে করে নিয়ে চলল রাজদরবারে।

এবার সে তরোয়ালের ধারালো দিকটায় কিছু কড়া তামাক পাতার গুঁড়ো মাখিয়ে নিল। তারপর বেচারামের কাছে গিয়ে বলল—হুজুর, এবার একটা খুব ভাল তরোয়াল এনেছি, পরখ করে দেখুন।

বেচারাম কামারের ট্যাঁকের দিকে তাকাল। অর্থাৎ ইশারায় জিজ্ঞেস করল যে, ঘুষের দরুন কিছু এনেছে কিনা?

বুড়ো কামার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ বুঝিয়ে দিল, সে কিছুই আনেনি।

বেচারাম বিরক্ত হয়ে তরোয়ালটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকতে গেল। তার মনের ভাবখানা এই যে, তাড়াতাড়ি অস্ত্রটাকে বাতিল করে দেবে।

কিন্তু ঘটে গেল এক বিপত্তি। তরোয়ালটা নাকের কাছে নিতেই তামাক পাতার গুঁড়োর কড়া গন্ধ গিয়ে ঢুকল তার নাকের ভেতর।

যেই নাকে ঢোকা, অমনি হ্যাচ্চো···হ্যাঁচ্চো···হ্যাচ্চো···ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ ঘ্যাচ্চো! ঘ্যাঁচ করে নাকটা গেল কেটে। হাউ-মাঁউ করে কেঁদে উঠল বেচারাম।

ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। রাজা ছুটলেন, মন্ত্রী ছুটলেন, ছুটল কোটাল আর সেনাপতি। কিন্তু বেচারামের নাক কাটা যে গেল— তা গেলই।

ওঝা এল, বদ্যি এল—কিছুতেই বেচারামের নাক আর জোড়া লাগল না।

নিধিরাম সর্দার তো বেচারামের হাল দেখে খুব খুশী। রাজার কাছে এসে হাতজোড় করে বলল—মহারাজ নাক কাটা লোককে রাজসভায় রাখতে নেই। তাতে আপনার অমঙ্গল হবে। এখনই বেচারামকে তাড়িয়ে দিন।

রাজা ভাবলেন—তাই তো, কি করা যায়।

মন্ত্রী ভাবলেন—তাই তো।

শেষে বেচারামকে সরিয়ে দেওয়াই ঠিক হল। আস্তে আস্তে তার কুচক্রের কথাও এতদিন পর ফাঁস হয়ে পড়ল।

নিধিরাম পেল ঢাল তার তরোয়াল। এবার সত্যি সত্যিই সর্দার হয়ে উঠল সে।

রাজা হবুরাম। মন্ত্রী গবুরাম। সর্দার নিধিরাম।

আর বেচারাম? হায় বেচারা!



এবার বলছি কেনারামের কাহিনী।

কেনারাম আর কেউ নয়, সেই দেশের এক বুড়ো নাপিত। দেখতে ক্যাবলা ক্যাবলা চেহারা। লম্বা সরু দেহটার উপর মস্ত বড় বেমানানো তার মাথাটি। হঠাৎ দেখলে দৈত্য-দানবের মাসতুতো ভাই বলে ভুল হয়।

তা'হলে কি হবে, রাজার সে দাড়ি কামায়। কাজেই তার মনে খুব

দেমাক। যার তার দাড়ি সে কামাতেই চায় না। কেউ যদি বলে—ও কেনারাম, আমার দাড়িটা একটু কামিয়ে দেবে? অমনি সে বলবে—জানিস্, আমি রাজার দাড়ি কামাই? তোর দাড়ি কামাবো কোন্ দুঃখে?

কাজেই অনেকেই কেনারামকে সমীহ করে চলে। তার মেজাজ বুঝে কথা বলে। চুল দাড়ি বড় হলেও কেউ তাকে সহজে ডাকতে সাহস পায় না।

কিন্তু একদিন কেনারামের দেমাকও ভাঙল।

সেদিন সে দাড়ি কামাতে গিয়ে রাজার গাল খানিকটা কেটে ফেলল। রাজা লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেনারামও।

এই খবর শুনে মন্ত্রী ছুটে এলেন। সর্বনাশ, কি অলুক্ষুণে কাণ্ড!

রাজা হুকুম দিলেন—এখনই নাপিত ব্যাটাকে বেঁধে ঘোড়াশালে আটকিয়ে রাখ।

কেনারাম হাত জোড় করে বলল—মহারাজ, ক্ষমা করুন। এতদিন ধরে কামাচ্ছি, কৈ কোনদিন তো এমনটি হয়নি। নিশ্চয়ই আপনার কোন খারাপ সময় আসছে।

রাজা কিন্তু গালের ব্যথাটা ভুলতে পারছিলেন না। তাই তিনি বললেন—সে ভাবনা পরে হবে; কিন্তু তোমাকে ছাড়ছি না। যতদিন আমার গালের ব্যথা না সারবে ততদিন তোমাকে আটক থাকতে হবে।

হবুরামের আদেশে কেনারাম ঘোড়াশালে বন্দী হল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘোড়াশাল। তার ওপর মশার উৎপাত। কেনারাম দিনরাত ছট্‌ফট্ করে।

এদিকে হল কি, রাজার গালে যেখানটায় কেটে গিয়েছিল সেখানে হল ঘা। সেই ঘা বেয়ে রক্ত পড়ে, পুঁজ বেরোয় আর ভ্যান ভ্যান করে মাছি এসে সেখানে বসে। রাজা ভারি বিপদে পড়লেন। হাত নেড়ে তাড়িয়ে দেন মাছিগুলিকে। কিন্তু তারা আবার এসে বসে।

মাছির সঙ্গে মশাও এবার এসে হাজির হল।

শেষে বস্ তো বস্, একেবারে গালের ওপর এসে বসল কয়েকটা মশামাছি। রাজা খুব বিরক্ত হয়ে গেলেন।

তারপর একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন মশামাছিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মশামাছি উড়ে গেল আর সেই থাপ্পড় লাগল তাঁর নিজেরই গালে। রাজা তো রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। এমন বেয়াদপ মশামাছি!

রাজা হুকুম দিলেন—রাজ্যে যত মশামাছি আছে সব মারো!

চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সেনাপতি এল। কোটাল এল। সৈন্য ছুটে এল শত শত।

মন্ত্রী হুকুম দিলেন—মশা মারো, মাছি মারো।

সেনাপতি তরোয়াল তুলল। কোটালও তুলল ঢাল তরোয়াল। সৈন্যরা বর্শা নিয়ে তৈরি হল। নিধিরামও তার নতুন পাওয়া ঢাল-তরোয়াল নিয়ে একবার ঘরের এদিক আর একবার ঘরের ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল।

ভ্যান ভ্যান করে মশামাছি ওড়ে আর সৈন্যরা বর্শা নিয়ে তাক করে তাদের মারতে। সেনাপতি, কোটাল সবাই দল বেঁধে তরোয়াল ঘোরাতে শুরু করে দেয়। মশামাছিগুলোও যেন বেয়াড়া হয়ে উঠল এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে। তারাও দলবেঁধে ছোটাছুটি করতে লাগল।

পুঁচকে মশা। পুঁচকে মাছি। তাদের এত আস্পর্ধা!

সৈন্যদের রাগও গেল বেড়ে। তারা এবার বর্শা ছুঁড়তে শুরু করল।

কিন্তু মশামাছির গায়ে বর্শা লাগে না। লাগে গিয়ে অন্য সৈন্যদের গায়ে। শুরু হল হৈ-চৈ, কান্না আর চীৎকার!

সে এক ভয়ানক ব্যাপার!

সেদিন যখন এই মশামাছিগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হল তখন দেখা গেল মশামাছি মরেনি একটাও। অথচ সৈন্য মরেছে মোট পঁচিশজন আর ঘায়েল হয়েছে পঞ্চাশ জন।

ওদিকে কেনারাম তখনও ঘোড়াশালে বন্দী। ঘোড়াশালের নোংরা আবর্জনায় মশামাছির আড্ডাখানা। তাদের জ্বালায় কেনারাম ঘুমুতে

পারে না। কানের কাছে ভ্যান ভ্যান, নাকের কাছে প্যান প্যান··· কেনারাম রেগে মেগে চড় চাপড় মারতে থাকে। গালে লাগে চড়··· পিঠে লাগে চাপড়···দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ···মশামাছিও মরে দশ, কুড়ি, ষাট। কেনারাম মশামাছি মারে আর এক জায়গায় জমিয়ে রাখে।

জমতে জমতে সেখানে হল এক ছোটখাটো পাহাড়, মশামাছির পাহাড়।

এর মধ্যে রাজা একদিন এলেন ঘোড়াশাল দেখতে। সেখানে এসে মশামাছির পাহাড় দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

ঘোড়াশালের রক্ষীকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি ব্যাপার?

রক্ষী বলল—আজ্ঞে, এটা কেনারামের কাণ্ড। একটা কথা আছে না মহারাজ—কাজ নেই তো খৈ ভাজ! কেনারাম তাই মশামাছি মারে আর জমিয়ে জমিয়ে পাহাড় তৈরি করে।

রাজা ত্থ' চোখ কপালে তুলে বললেন—কি আশ্চর্য, কেনারামের এই কাণ্ড! আমার পালোয়ান পালোয়ান সৈন্যরা পারল না একটি মশামাছি মারতে আর একা কেনারাম কিনা মেরে ফেলল এক পাহাড় মশামাছি?

রক্ষী বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ!

রাজা বললেন—তা'হলে লোকটার বাহাত্থরি আছে তো!

রক্ষীও সায় দিয়ে বলল—তা বটে মহারাজ!

রাজা তখনই কেনারামকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। আর বেচারামের জায়গায় নিযুক্ত করলেন তাকে।

কেনারামও ভারি খুশি। তাকে ক্ষুর কাঁচি নিয়ে আর লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না। এবার সে একেবারে রাজসভার সরফরাজ।

কেনারাম মনে মনে ভাবতে লাগল, বাঃ, ব্যাপার তো মন্দ নয়! রাজার গাল কেটে হলাম সরফরাজ, কান কাটতে পারলে হয়তো মন্ত্রীই হতে পারতাম।

কথাটা ভেবেই কিন্তু কেনারাম বেশ দমে গেল। ইস্, কি ভুলই না করলে সে। এমন দাঁওটা ফস্কে গেল!

আবার সেই সুযোগের আশায় দিন গুনতে লাগল কেনারাম।

দিন যায়। রাত যায়। দিনে রাতে মাস যায়।

রাজা হবুরাম সোনার পালঙ্কে ঘুমান, মন্ত্রী গবুরাম ঘুমান রুপোর পালঙ্কে।

কোন ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। বেচারাম বরখাস্ত হওয়ার পর থেকে বিদেশী রাজার সৈন্য আসার চিন্তাও হবুরাম আর গবুরামের মাথা থেকে উঠে গেছে। তবু সৈন্যরা দিনরাত জেগে থেকে পাহারা দেয়।

গাঁয়ের লোকদের কিন্তু অত সুখ নেই। বিদেশী সৈন্য না এলেও বন থেকে বাঘ আসে, ভালুক আসে, বুনো হাতিও ছুটে আসে মাঝে মাঝে। তারা এসে ভয়ানক উৎপাত শুরু করে। গরু বাছুর ধরে খায়, বাগে পেলে মানুষও যায়।

প্রজারা দলে দলে এসে রাজার কাছে নালিশ জানায়—মহারাজ, বনের বাঘ ভালুকের উৎপাতে যে মারা গেলাম। এর একটা উপায় করুন।

রাজা আশ্বাস দিলেন—আচ্ছা, তোমরা এখন যাও, আমরা বিবেচনা করে দেখি।

প্রজারা চলে গেল।

তিন দিন তিন রাত্তির ধরে চলল আলোচনা। কেউ বলল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাহারা দেওয়া হোক, যাতে বাঘ ভাল্লুক এলেই তরোয়াল আর বর্শা দিয়ে মেরে ফেলা যায়।

কেউ বলল—প্রজাদেরও ঢাল তলোয়ার দেওয়া হোক। তারাও সবাই রাত জেগে পাহারা দেবে।

কেনারাম বলল—আজ্ঞে, সেটা হয় না। রোজ রাত জেগে ক'দিন পাহারা দেবে তারা?

রাজা বললেন—তাই তো, তা'হলে উপায়?

কেনারাম বলল—বনের সব বাঘ ভালুককে মেরে সাফ করে দেওয়া হোক্।

রাজা খুশি হয়ে বললেন—হ্যাঁ, এ যুক্তিটা ভাল। এজন্য তোমাকে দিলাম দশ মোহর পুরস্কার।

শেষে স্থির হল যে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজা ও মন্ত্রী নিজেরাই বাঘ-ভালুক মারতে যাবেন বনে। রাজা আর মন্ত্রী থাকবেন হাতির পিঠে আর সৈন্যরা যাবে হেঁটে।

রাজা ভাবলেন, কেনারামকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যে এত মশা ও মাছি মারতে পারে, সে বাঘ ভালুক মারবার ফন্দীও নিশ্চয়ই ভাল জানে। তাই হুকুম করলেন—কেনারাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।

কেনারাম ঘাবড়ে গেল। সে এতদিন লোকের চুল কেটেছে, নখ কেটেছে আর মেরেছে মশা মাছি, কিন্তু বাঘ ভালুক তো মারেনি কোন দিন। এ আবার কি ফ্যাসাদ! কিন্তু রাজার হুকুম। মানতেই হবে।

রাজা চললেন, মন্ত্রী চললেন, সঙ্গে চলল সৈন্যদল। আর চলল কেনারাম। বুক করে ধড়ফড়···দাঁত করে কড়মড়···মশা মেরে কেনারাম হয়েছে সরফরাজ···বাঘ মারতে গিয়ে বুঝি প্রাণ যায় আজ।

কেনারাম চলেছে আলাদা ঘোড়ায় চেপে।

এক পা এগোয়, তু'পা পেছোয়। তু'পা এগোয় তিন পা পেছোয়।

রাজা হবুরাম হাতির ওপর থেকে ডেকে বলেন—কেনারাম, পিছিয়ে পড়ছ কেন? ভয় করছে নাকি?

কেনারাম বলে—না মহারাজ, আমি ভয় করব কেন? ঘোড়াটা ভয় পেয়েছে, তাই মোটেই এগোতে চায় না।

—ওঃ, তাই নাকি? তা'হলে হাতিতে এসো।

এবার মুখ শুকিয়ে উঠল কেনারামের।

রাজা কেনারামকে হাতিতে উঠিয়ে নিলেন। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে সৈন্যরা এগিয়ে চলল বনের দিকে।

হাতি ঘোড়ার পায়ের চাপে মাটি কাঁপে।

বাতাস বহে শন্ শন্। অস্ত্র করে ঝন্ ঝন্।

রাজা হবুরামের দল এগিয়ে চলে।

তারপর ঐ বিরাট দল যখন বনে এসে পৌঁছুল, তখন সে কি হুলুস্থুল কাণ্ড! বনের পশুদের ভেতর লেগে গেল ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি। কার আগে কে পালাবে তাই নিয়ে সবাই ব্যস্ত।

বনের পশুরা এমন বিদ্ঘুটে ব্যাপার আর কোনদিন দেখেনি। এমন করে দল বেঁধে মানুষেরা ওদের আক্রমণ করেনি আর কোনদিন। কাজেই ওরা দিগবিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে লাগল যে যেদিকে পারে।

কেউ ছোটে গভীর ঝোপের ভেতর আবার কেউ ছোটে বন ছেড়ে বাইরে।

কিন্তু ঝোপের ভেতর পালিয়েও তো ওদের নিস্তার নেই। সৈন্যরা সব তছনছ করতে লাগল ঝোপ-জঙ্গল।

ভয়ে বাঘ ছুটে পালায়, হরিণ ছুটে পালায়, শূয়োর ওদের বাচ্চাগুলো নিয়ে ছুটতে থাকে। ভালুক, শেয়াল, খরগোশ কেউ থাকে না সুস্থির, সবাই বন তোলপাড় করে ছুটতে থাকে বনের বাইরে।

হরিণ এসে জিজ্ঞেস করে বাঘকে—দাদা, এখন কোথায় যাই ?

বাঘ বলে—তাই তো, কোথায় যাওয়া যায় ?

খরগোশ জিজ্ঞেস করে শেয়ালকে—পণ্ডিতমশাই, এখন কোথায় গিয়ে ঠাঁই নেবো ?

শেয়াল মাথা চুলকিয়ে বলে—তাই তো, কোথায় ঠাঁই পাওয়া যায় ?

ভোঁদড় এগিয়ে আসে শকুন মামার কাছে বুদ্ধি নিতে। বিপদে আজ কেউ কাউকে ভয় করে না। সবাই এক। বাঘ, ভালুক, মোষ, শেয়াল, বাঁদর সবাই আজ সবাইকার বন্ধু।

বিপদে তাই হয়ে থাকে। কোন পাড়ায় যদি আগুন লাগে বা খুব অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়, তখন সেই পাড়ার সবাই কি এক হয়ে যায় না ?

যাক্, এখন আসল কথা বলি।

বাঘ, ভালুক, মোষ, হরিণ, বাঁদর, শেয়াল সবাই তো বন-বাদার ছেড়ে ছুটতে শুরু করেছে। কারোর কোন হুঁশ নেই, যে যেদিকে পারে সেদিকেই ছোটে।

হঠাৎ একটা বাঘ ভারি বিচ্ছিরি এক কাণ্ড করে বসে। দিক্-বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে এসে পড়ে একেবারে হবুরাম রাজার হাতির ওপরে। রাজা আর মন্ত্রী তো কোনরকমে হাতির শুঁড় আঁকড়িয়ে ধরে সে-যাত্রায় রক্ষা পেলেন। কিন্তু কেনারাম ছিটকে পড়ে গেল নিচে।

তাও মাটিতে পড়লে কোন কথা ছিল না। পড়ল একেবারে একটা শেয়ালের ঘাড়ে। শেয়ালমশাই বেমক্কা আঘাত পেয়ে দিনদুপুরেই ডাক ছেড়ে দিল—হুক্কা-হুয়া—হুঁ···আঃ—

কেনারাম অস্ত্র ফেলেই দে দৌড়···দে দৌড়···ছুটতে ছুটতে একেবারে নিজের বাড়িতে এসে হাজির।



এদিকে হয়েছে আর এক মজার ব্যাপার।

বাঘ ভালুক বন ছেড়ে সব এসে পড়েছে লোকালয়ে। দলে দলে এসে ঢুকেছে তারা মানুষদের ঘরে। লোকেরা তো ভয়েই জড়সড়—কেঁপে থর থর! শেষে তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে, ঘর ছেড়ে দিয়েছে ভোঁ দৌড়।

বাড়িতে এসে নিজের ঘরে ঢুকেই তো কেনারামের চক্ষু চড়কগাছ। ঘরে লোকজন কেউ নেই, কেবল ভেংচি কেটে দাঁড়িয়ে আছে দুটো বড় বড় বাঘ।

দেখেই কেনারাম দে দৌড়···আবার দৌড়···

এবার একেবারে রাজবাড়িতে এসে হাজির হল। সুখের কথা যে,

বাঘ ভালুক রাজবাড়ির খোঁজ পায়নি তখনও।

কেনারাম সদর দরজার কাছে আসতেই প্রহরী দরজা খুলে দিল। কেনারাম সটান চলে গেল রাজদরবারে।

কেনারাম একবার রাজার শূন্য সিংহাসনটায় বসে নিল। রাজা থাকলে তো বসবার সুযোগ হবে না কোনদিন, তাই বসে আরাম করে নিল কিছুক্ষণ।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, এখানেও বেশিক্ষণ বসে থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ ভালুক আসতে কতক্ষণ? তারা হয়তো এখনই এসে পড়বে। তাই আগে থেকেই সে লুকিয়ে থাকবার জায়গা খুঁজতে লাগল।

একবার এখানে বসে, একবার ওখানে বসে, কিন্তু কিছুতেই ভয় কাটে না কেনারামের। এবার সে রাজার সিংহাসনের তলায় ঢুকে পড়ল। চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে মরার মতো পড়ে রইল সেখানে।

এদিকে রাজা আর মন্ত্রী কেনারামকে না দেখে চিন্তায় আকুল। সর্বনাশ, লোকটা গেল কোথায়?

সারা বন তছনছ করেও যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন তাঁরা ভাবলেন, নিশ্চয় কেনারামকে বাঘে খেয়েছে।

রাজা বললেন—মন্ত্রি, এটা কেমন হল?

মন্ত্রী বললেন—যাক্, আপদ গেছে। অপয়া লোকটাকে এনেই তো আমাদের এ দুর্দশা।

রাজা বললেন—ঠিক বলেছ। তা'হলে চলো এখন রাজপুরীতে ফেরা যাক্।

অমনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাজা আর মন্ত্রী চললেন রাজ্যের দিকে।

কিন্তু রাজ্যে ঢুকে দেখলেন আশ্চর্য কাণ্ড! একি! কোন লোকজন নেই, সব বাড়িঘর খাঁখাঁ করছে।

রাজা বললেন—মন্ত্রি, দেশের লোকগুলো সব গেল কোথায়?

মন্ত্রী বললেন—তাই তো, কাউকে যে দেখছি না।

শূন্য রাজ্যের পথ দিয়ে একটা লোকও হাঁটে না।

রাজা মন্ত্রী অবাক হয়ে ভাবেন—হঠাৎ কি রাজ্যটা বদল হয়ে গেল নাকি? না, আমরা অন্য কোন রাজ্যে এসে পৌঁছলাম?

রাজপুরীর সামনে এসে দেখেন—রাজপুরীটা ঠিকই আছে। কিন্তু একি! সদর দরজা যে খোলা। প্রহরী, কোটাল সব কোথায়? কারুর যে টিকিরও দেখা নেই।

রাজা ও মন্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে বললেন—সর্বনাশ, একি হল?

কয়েকজন সৈন্য রাজপুরীর ভেতর ঢুকে পড়ল। ঢুকেই দেখে অবাক কাণ্ড। বাঘ, ভালুক, মোষ, হরিণ প্রভৃতি নানা রকম সব জানোয়ার রাজদরবারে বসে আছে।

রাজা উঁকি মেরে দেখলেন—তাঁর সিংহাসনে বসে আছে একটা জাঁদরেল বাঘ।

মন্ত্রী উঁকি মেরে দেখলেন—তাঁর আসনে বসে আছে একটা কালো কুচকুচে ভল্লুক!

রাজা বললেন—মন্ত্রি, ব্যাপার কী?

মন্ত্রী বললেন—ব্যাপার তো কিছু বুঝতে পারছি না মহারাজ।

—এখন কি করা যায়, বলতো?

—লক্ষণ বিশেষ সুবিধের নয়। চলুন ফিরে যাই।

—কোথায়?

—আপাততঃ বনে। তারপর ভেবেচিন্তে সব ঠিক করা যাবে।

কাঁদ-কাঁদ স্বরে রাজা বললেন—রাজপুরীর ভেতর রানীরা রইল, দাস-দাসীরা রইল, তাদের কি দশা হবে?

মন্ত্রীও প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন—আমারও তো সেই দশা মহারাজ? কিন্তু তারা কি আর এখনো আছে? প্রহরীদের সঙ্গে তারাও কোথায় চলে গেছে।

অগত্যা সবাই আবার ফিরে চলল বনের দিকে। রাজার পা চলে তো মন চলে না, মন চলে তো পা চলে না। মন্ত্রীর চোখ-মুখ

কান্নায় ভরা।

সৈন্যেরা মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হাঁটে। আজ যেন তারা রাজ্য হারিয়ে সব বনবাসে চলেছে।

বনের ভেতর এসে বাসা বাঁধলেন হবুরাম রাজা আর গবুরাম মন্ত্রী।

দরবার নেই, সিংহাসন নেই—তবু সেখানেই বসল রাজ্যপাট।

কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই। মন্ত্রীর চোখেও ঘুম নেই।



রাজার সিংহাসনে বসে আছে একটি বাঘ আর মন্ত্রীর সিংহাসনে একটা ভল্লুক।

রাজার নেই রানী, মন্ত্রীর নেই মন্ত্রিনী, তাঁরা গেলেন কোথায়? রাজ্যের লোকেরাই বা দল বেঁধে কোথায় চলে গেল?

রাজা বললেন—মন্ত্রি, এখন কি করা যায়?

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, তাঁদের খোঁজবার জন্য চারদিকে লোক পাঠান।

রাজা বললেন—হ্যাঁ, তাই হোক।

অমনি খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল চারদিকে। সৈন্যরা কেউ

ঘোড়ায় চড়ে, কেউ পায়ে হেঁটে চারদিকে ছুটতে লাগল। রাজা ও মন্ত্রী হাতিতে চড়ে এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন।

অদ্ভুত ব্যাপার! একটিও মানুষ নেই রাজ্যে। বাঘ-ভালুক, শেয়াল-গাধা এরাই সব মানুষের বাড়ি-ঘরে বসে ঘরকন্না করছে।

রাজা ও মন্ত্রী যে বাড়িতে গিয়েই উঁকি মারেন, দেখেন বাঘ আর ভালুক, না হয় শেয়াল আর গাধা মানুষের খাটিয়ায় শুয়ে আছে, না হয় তো উনুনে হাঁড়ি আর কড়াই চাপিয়ে ভাত চচ্চড়ি রান্না করছে।

রাজা জিজ্ঞেস করেন মন্ত্রীকে—মানুষগুলো কি তা হলে সব জন্তু হয়ে গেল?

মন্ত্রী মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন—তা হতে পারে।

তাহ'লে উপায়? রাজা এবার ঘাবড়ে যান।

তাই তো! মন্ত্রীর মাথাও ঘুলিয়ে যায়।

রাজা বললেন—চলো মন্ত্রী, আমাদের রানীদের অবস্থাটা দেখে আসি একবার।

মন্ত্রী বললেন—চলুন।

দু'জনেই চললেন পুরনো রাজবাড়ির দিকে।

কিন্তু সদর দরজার কাছে এসেই তাঁরা থেমে গেলেন। দেখলেন এক বিরাটকায় সিংহ সেখানে পাহারা দিচ্ছে।

রাজা বললেন—মন্ত্রী, ব্যাপার তো বড় সুবিধের নয়। এখন ভেতরে যাই কি করে?

মন্ত্রী বললেন—তাই তো, এ যে একেবারে সিংহদ্বার।

শেষে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দু'জনে ঠায় বসে রইলেন। ভাবলেন, সিংহটা যখন সরে যাবে, তখন চুপি চুপি রাজপুরীর ভেতরে গিয়ে ঢুকবেন তাঁরা।

রাজা বললেন—রানী কি বাঘই হয়ে আছে, না হরিণ হয়ে আছে তা জানব কী করে?

মন্ত্রী বললেন—তাই তো, আমার গিন্নীই বা কি হয়ে আছে কে

জানে? কি উপায় হবে!

হঠাৎ রাজার মাথায় এক বুদ্ধি এল। তিনি বললেন—শোন মন্ত্রী, রানী পশু হয়ে গেলেও আমাকে চিনতে পারবে নিশ্চয়ই।

মন্ত্রী বললেন—আমার গিন্নীও আমাকে চিনতে পারবে তা' হলে। আমিও তাকে চিনতে পারব ঠিকই।

রাজা ও মন্ত্রী ঠায় বসে রইলেন। সিংহও সরে না, তাঁরাও আর ভেতরে ঢুকতে পারেন না।

দিন গিয়ে বিকেল হয়। বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা হয়। রাজা ও মন্ত্রী বসেই থাকেন। তারপর সন্ধ্যা গিয়ে রাত হয়। রাজা ও মন্ত্রী তখনও বসেই থাকেন।

এমন সময় হঠাৎ সিংহটা চলে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন রাজা ও মন্ত্রী। গুটি গুটি করে হেঁটে চললেন তাঁরা অন্দরমহলের দিকে।

একবার চলেন, আবার থামেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেন কোনো জন্তু বসে পাহারা দিচ্ছে কিনা।

পা টিপে টিপে অন্দরমহলে পৌঁছেই তারা রানীর ঘরে গেলেন। হীরা-মুক্তোর গয়না পরে সোনার পালঙ্কে ঘুমুতেন রানী যে ঘরে, সেই ঘরে এলেন।

সে ঘরে বাতি জ্বালাতে হয় না। দেয়ালের গায়ে মণি-মুক্তো ঝোলে, তারই আলোয় আলোময় হয় সারা ঘর।

রাজা ও মন্ত্রী সে-ঘরে ঢুকেই দেখেন—সর্বনাশ! দুনিয়ার সব ভল্লুকী আর গাধানী এসে ঠাঁই নিয়েছে সেখানে।

কতকগুলো 'শেয়ালও ছিল সেই ঘরে। মানুষের সাড়া পেয়েই তারা ছুটে পালাল।

কিন্তু ভল্লুকীরা আর গাধানীরা পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। হুঁশ নেই কারুর। বড় রানীর পালঙ্কের ওপর চোখ বুজে শুয়ে আছে দুটি গাধানী।

হঠাৎ একটা গাধানী চোখ মেলে রাজার দিকে চাইল। একবার নয়, হু'বার নয়, তিনবার। রাজা বললেন—মন্ত্রী, এ নিশ্চয়ই আমার দিকে তাকাচ্ছে।

মন্ত্রী বললে—হ্যাঁ মহারাজ, তাই হতে পারে।

এদিকে দ্বিতীয় গাধানীটিও ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। সেও এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মন্ত্রীর দিকে।

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ, আমার গিন্নীকেও আমি চিনে ফেলেছি। ঐ দেখুন।

রাজা বললেন—তাই তো, এ কেমন ব্যাপার? আমার রানীও হল গাধানী। এখন উপায়?

মন্ত্রী বললেন—আমার গিন্নীর কিন্তু আপনার বড় রানীর সঙ্গে খুব ভাব ছিল, তাই হু'জনে একসঙ্গে গাধানী হয়ে গেছে।

—তা অন্য কিছু হলেও তো পারতো।

—কেন?

—আমাদের গিন্নী যখন গাধানী তখন আমরা হলুম গাধা।

—তা তো বটে!

—এখন কি করা যায়?

—চলুন দেখি, বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওদের মানুষ করা যায় কি না।

রাজা ও মন্ত্রী হু'জনেই পালঙ্কের কাছে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু এবার হল উল্টো ব্যাপার! গাধানী হুটো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। উঠেই বেয়াড়া চীৎকার শুরু করল।

আর যাবে কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে হুলস্থুল পড়ে গেল রাজপুরীর ভেতর। বাঘ-ভালুক-বাঁদর সবাই ছুটে এল। পালঙ্কের নিচেই ঘুমিয়েছিল একটা বাঘ। সে হালুম করে এসে লাফিয়ে পড়ল একেবারে রাজা আর মন্ত্রীর নাকের কাছে।

ওঃ বাবা গো! বলেই রাজা আর মন্ত্রী দিলেন ছুট। দরজার চৌকাঠে হোঁচট লেগে হু'জনেই পড়লেন হুমড়ি খেয়ে। রাজা পড়লেন

মন্ত্রীর ঘাড়ের ওপর। 'উঃ বাবা গো' বলে দু'জনেই চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর দু'জনেই আবার তাড়াতাড়ি উঠে শুরু করলেন ছুটতে।

বাঘটাও বুঝি তাঁদের পেছনে পেছনে ছুটতে শুরু করেছে। কিন্তু পেছনে তাকাবার আর অবসর নেই। ভারী দেহ নিয়ে ছোটা যায় না। তবু অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এলেন সে-যাত্রায়।



এখন আবার কেনারামের কাহিনী বলছি।

কেনারাম সেই থেকে কানে হাত দিয়ে, চোখ বুজে সিংহাসনের তলায় পড়ে আছে। এদিকে জন্তুরা এসে যে রাজদরবার দখল করে বসে আছে, সে-খবর সে জানে না। কাজেই অনেকক্ষণ বাদে সে যখন সিংহাসনের তলা থেকে উঠে একটু মুখ বাড়াল, তখন ব্যাপার দেখে তো তার চোখ ছানাবড়া।

রাজার সিংহাসনে বসে আছে বাঘ, আর মন্ত্রীর আসনে ভল্লুক। এরপর তাকিয়ে আর কিছু দেখবার মত সাহস হল না তার, সময়ও হ'ল না। ধপ্ করে পড়ে গিয়েই সে একেবারে মূর্ছা গেল।

একদিন এক রাত্তির পরে তার মূর্ছা ভাঙল।

আবার সিংহাসনের তলা থেকে মুখ বের করে তাকিয়ে দেখে কেনারাম। দেখেই আবার যায় মূর্ছা।

এবার দু'দিন দু'রাত্তির পর মূর্ছা ভাঙল।

এবারও সিংহাসনের তলা থেকে একটু মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখল কেনারাম। আবার গেল মূর্ছা।

এবার মূর্ছা ভাঙল তিনদিন তিন রাত্তির পরে।

এদিকে খিদেয় তার পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। তাই

নিরুপায় হয়ে সে একদিন চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল। খিদের চোটে হাঁটতে পারে না। শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু তাও কতক্ষণ পারে? এতদিন অনাহারে থাকার পর, তার শরীরে আর কিচ্ছু নেই। খিদের চোটে পারে তো মাটি কামড়ে খায়।

কাছেই ছিল কতগুলো ঘাস আর পচা মাংস। কয়েকটা খরগোশ, শূয়োর আর শেয়াল সেগুলো ভাগাভাগ করে খাচ্ছিল। কেনারাম সেখানে গিয়ে ভাগ বসাল তাদের সঙ্গে।

একেই কেনারাম চলছিল হামাগুড়ি দিয়ে, তার ওপরে ধূলোবালি গায়ে লেগে তার চেহারাটি হয়েছে কিম্ভুত কিমাকার! কাজেই পশুরা মনে মনে ভাবল—এ মানুষ নয় নিশ্চয়ই, আমাদের সগোত্র কোন জন্তু। এই ভেবে তারাও কেনারামের পাশে বসে আনন্দে একসঙ্গে ভোজন করতে লাগল।

এদিকে, সেই পচা মাংস আর কাঁচা ঘাস খেয়ে কেনারামের যেন কি হল। সে যে মানুষ, সে কথাই সে গেল ভুলে। খেয়ে দেয়ে আর গুটিসুটি মেরে সিংহাসনের তলায় গিয়ে শুয়ে রইল। তিন দিন তিন রাত্তির আর বেরুল না। তারপর আবার যখন বেরুল তখন বাঘমশাই সিংহাসনে বসে ঝিমুচ্ছিল। কেনারামকে দেখেই কাটল এক ভেংচি, করল এক বিরাট হাঁ!

কেনারামের আত্মারাম গেল শুকিয়ে।

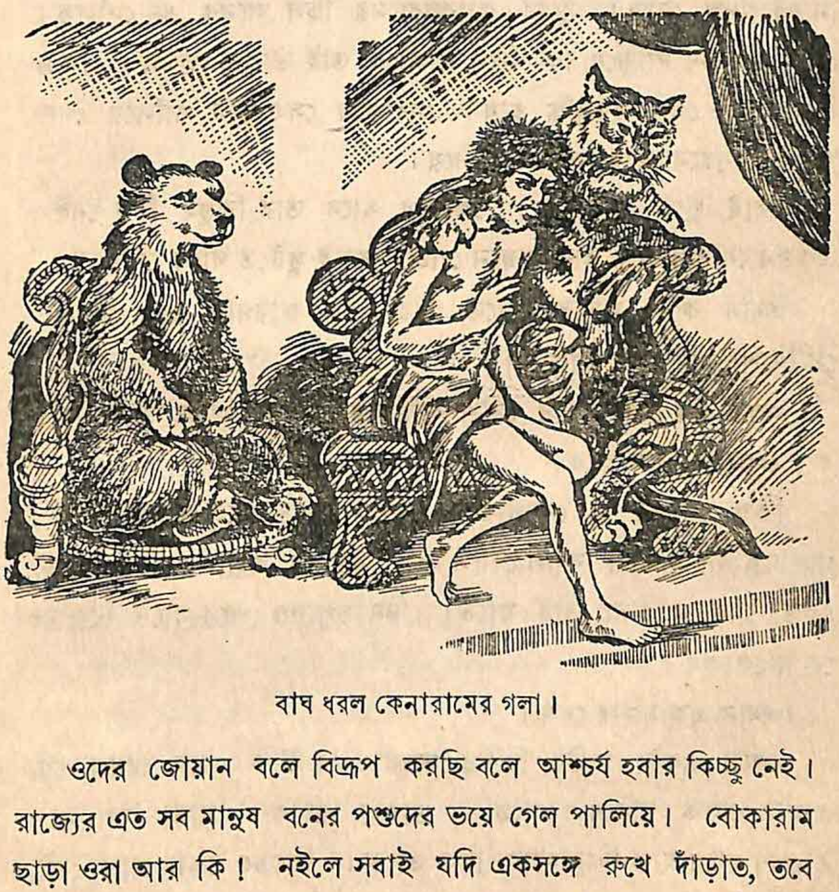
সে তখন করলে কি, মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে এক ডিগবাজি খেয়ে নিল। বাঘ তা দেখে তো ভারী খুশি। সে ভাবল, এটা মানুষ নয় নিশ্চয়, আমাদেরই দলের কেউ। তাই বাঘ চটপট কেনারামের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে নিল।

বাঘ ধরল কেনারামের গলা, অমনি কেনারামও ভয়ে ভয়ে ধরল বাঘের গলা। গলাগলি করে দু'জনেই এসে সিংহাসনে বসল।

কেনারাম মনে মনে ভারী খুশি। এবার সত্যি সত্যি সেও রাজা হল। কিন্তু মনে তার বড় ভয়। কি জানি কখন বাঘ বাবাজী এক

থাবা মেরে বসে! কাজেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে জন্তুদের কথা মতোই সে চলতে লাগল। বাঘের কথায় ওঠে; ভালুকের কথায় বসে।

এখন রাজ্যের লোকদের কথা বলি। বাঘ ভালুকের ভয়ে রাজ্যের সব ছেলে বুড়ো এমনকি জোয়ান জোয়ান লোকেরাও কোথায় চলে গেল, তার খবর জানতে ইচ্ছে কার না হয়?



বাঘ ধরল কেনারামের গলা।

ওদের জোয়ান বলে বিদ্রূপ করছি বলে আশ্চর্য হবার কিচ্ছু নেই। রাজ্যের এত সব মানুষ বনের পশুদের ভয়ে গেল পালিয়ে। বোকারাম ছাড়া ওরা আর কি! নইলে সবাই যদি একসঙ্গে রুখে দাঁড়াত, তবে সাধ্য কি যে, বনের পশুরা ওদের ঘর বাড়ি দখল করে! এমনি করেই কিন্তু একতার অভাবে অনেক দেশ ছারখার হয়ে যায়!

ব্যাপারটা হয়েছিল কি, বাঘ ভালুকদের আসতে দেখেই রাজ্যের লোকেরা সব পালাতে শুরু করেছে। যে যেদিকে পারছে ছুটছে।

কেউ হয়তো লাঠি হাতে নিয়ে মারতে এসেছিল বাঘকে, কিন্তু মারবে কি, শেষে লাঠি হাতে নিয়েই দিল দৌড়। মেয়েরা কেউ হয়ত রাঁধছিল, খুন্তি হাতে নিয়েই দৌড়ে পালাল। কে যে কি নিয়ে পালাবে বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করতে পারল না কিছুই। কেউ টাকার বাক্স নিতে গিয়ে পুতুলের বাক্স নিলে, কেউ কাপড় চোপড় নিতে গিয়ে ছেঁড়া কাঁথা নিয়েই দিল দৌড়। বুড়ো ক্যাবলরামের ছিল অনেক ধন-দৌলত। সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, কি নিয়ে পালাবে তাই ভাবতে লাগল। কিন্তু বিপদে সেও গেল হতবুদ্ধি হয়ে। অবশেষে সেও ছুটে পালিয়ে গেল শুধু তার পুরনো ভাঙা হুঁকোটা নিয়ে।

সবাই ছুটে পালাচ্ছে। কোথায় যাবে তার কিছুই ঠিক নেই একজন যেদিকে যায় তার পেছনে পেছনে সবাই ছুটতে থাকে সেদিকে।

এমনি করে ছুটতে ছুটতে তারা এক জায়গায় এসে থামল। সে দেশের নাম কেউ জানে না।

অদ্ভুত এক দেশ। সে দেশে বাড়ি-ঘর নেই। মাটির ঢিপি তৈরি করে লোকেরা বাস করে।

কিন্তু লোকই বা কোথায়? সেখানে মাঠ পড়ে আছে খালি; গরু চরে না, চাষীরা ফসল বোনে না। বড় বড় জলাশয় পড়ে আছে, কেউ স্নান করে না তার ঘাটে। দিন দুপুরেও পথে-ঘাটে চলে না কোন লোক।

এমনি এক মজার দেশ।

শেষে একটা মাটির ঢিপির ভেতর সবাই উঁকি মেরে দেখল যে, একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। ডাকল তাকে। সাড়া দিল না। তারপর গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিল তাকে। তাতেও কোন সাড়া নেই, লোকটা মরেই গেছে বোধ হয়।

আরও একটি ঢিপির ভেতর উঁকি মেরে দেখল তারা। সেখানেও

সেই ব্যাপার। একটা লোক শুয়ে আছে। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড! সেও মরা। এমনি করে যত জায়গায় যায়, সব জায়গাতেই দেখে শুধু মরা মানুষ, জ্যান্ত নেই কেউ।

সবাই তখন ভাবল, এ আবার কোন্ ভূতের দেশে এসে পৌঁছল তারা! গালে হাত দিয়ে তারা ভাবতে লাগল—এখন উপায়?

এদিকে হল কিন্তু ভারি এক মজার কাণ্ড। হবুরাম রাজার রাজ্যের লোকদের কাছে দেশটা ভূতুড়ে মনে হলেও তারা কিন্তু ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছোট ছোট শিশুরা নেচে নেচে ছুটে বেড়াতে লাগল এদিক-ওদিকে। তাদের পায়ের ছোঁয়া লেগে সেই নাম না-জানা দেশের লোকেরা উঠল বেঁচে! গাছপালাগুলো ছিল শুকিয়ে, সেগুলোও উঠল সবুজ হয়ে। যে গাছে অনেকদিন ফুল ফুটত না, সে গাছেও ফুল ফুটতে শুরু করল।

সবই যেন আজব ব্যাপার!

বেঁচে উঠে লোকগুলোর আনন্দ আর ধরে না। ধেই-ধেই করে নাচতে শুরু করল—শেষে হবু রাজার দেশের লোকদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—তোমরা কোত্থেকে এলে গা?

—হবু রাজার দেশ থেকে।

—হবু রাজার দেশ। সে আবার কি?

—আমাদের দেশের রাজার নাম হবুরাম। আমরা সে দেশেরই প্রজা। কিন্তু তোমাদের দেশের রাজা কে?

—আমাদের দেশে রাজাও নেই, প্রজাও নেই। থাকি একা একা। কারুর সঙ্গে মেলামেশা নেই, ভালবাসা নেই। কাজেই আমরা ছিলাম মরে। তোমাদের সাড়া পেয়ে আমরা বাঁচলুম।

হবু রাজার দেশের লোকেরা বলল—তবে চলে এসো আমাদের দলে। সবাই মিলে আমরা নতুন দেশ গড়ে তুলি।

নতুন একটা জাগরণ এল যেন সেই নাম না-জানা দেশে। ঘরবাড়ি তৈরি হতে লাগল। পুকুর কাটা হল, পথঘাট তৈরি হল। ফসলে

ফসলে ভরে উঠল মাঠ।

এই নাম না-জানা দেশ এতদিন সত্যিই মরেছিল। এবার মানুষের ছোঁয়া পেয়ে বেঁচে উঠল তারা।



এবার রানীদের কথা বলি।

রানীরা কোথাও হারিয়ে যাননি। তাঁরাও কিন্তু পৌঁছে গেছেন আর এক রাজ্যে। তবে সেখানে রানীদের দুর্দশার অন্ত নেই।

এ রাজ্যে নেই তাঁদের সোনার পালঙ্ক ; নেই দুধের ফেনার মত নরম বিছানা। এখন তাঁরা ঘুমোন শুকনো ঘাসের বিছানার ওপর, আর বসেন কাঠের পীড়েতে।

খুব কষ্ট হয়েছে তাঁদের সেখানে পৌঁছতে, কারণ কোনদিন তো তাঁরা রাজপুরী থেকে কোথাও বের হননি। এবার তাঁদের প্রাণের দায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে অনেকখানি পথ।

রানীদের পা গিয়েছে ফুলে। দাস-দাসীরা মাসের পর মাস ধরে মালিশ করতে লাগল তাঁদের পা। তবু রানীদের পায়ের ফুলো কমে না। ফলে দাস-দাসীরাও চোখের পলক ফেলতে পারে না, সারাদিন-রাত জেগে বসে রানীদের পা টেপে।

রাজা আর মন্ত্রীর কথা ভেবে ভেবে ওদিকে রানী আর মন্ত্রিনীর মুখে অন্নজল রোচে না।

ওদিকে সেনাপতি, কোটাল, আরও অনেকেই কিন্তু অন্য সব লোকের সঙ্গে নাম না-জানা দেশেই এসেছে। কি ক'রে কখন যে তারা রানীদের দল ছাড়া হয়ে গেছে তা কেউ বলতে পারে না। নিধিরাম সর্দারও এসেছে তাদের সঙ্গে। সেনাপতি, কোটাল, সর্দার সবাই রাজা আর মন্ত্রীর শোকে কাতর।

এমনি করে দিন যায়, রাত যায়, আবার আসে দিন।

এখন সবাই ভাবে, কবে তারা রাজা আর মন্ত্রীকে ফিরে পাবে।

এদিকে রানীরাও ভেবে অস্থির হন, কবে তাঁদের প্রাণ জুড়োবে।

ওদিকে রাজা আর মন্ত্রী রাজ্য হারিয়ে বনে বাস করছেন বটে, কিন্তু তাঁদের মনেও সুখ নেই।

রাজা ভাবছেন, হায়রে প্রজারা সব পশু হয়ে গেল, রানীরাও হল। আমরা রাজ্যে থাকলে আমরাও হয়তো পশু হয়ে যেতাম।

মন্ত্রী ভাবছেন, বুড়ো বয়সে স্ত্রী-পুত্র তো গেলই, এমন কি মন্ত্রীগিরিটাও বুঝি এবার যায়।

কেমন করে আবার ওদের মানুষ করা যায় সে কথা ভাবতে ভাবতে রাজা আকুল হয়ে উঠলেন। একদিন মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রি, চারদিকে খোঁজ করে দেখো তো কোন গুণী লোক পাও কিনা। তবে সত্যিকার গুণীন হওয়া চাই, যেন পশুকে মানুষ করতে পারে।

মন্ত্রী বললেন—আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠাচ্ছি।

রাজার আদেশ। তাই মন্ত্রী পাঠালেন সৈন্যদল। সৈন্যরাও ছুটল চারদিকে।

রাজা বলে দিলেন—যে ভালো গুণীন খুঁজে এনে দিতে পারবে, সে পাবে অনেক পুরস্কার।

সৈন্যরা শুধু ঘোরে আর ঘোরে। ফিরে আসে না কেউ। তবু তারা ঘুরতেই থাকে, কারণ পুরস্কারের লোভও তারা ছাড়তে পারে না!

উত্তর দিকে যে সৈন্যদল গিয়েছিল তারা আটকে গেল এক পাহাড়ের কাছে গিয়ে। বিরাট উঁচু পাহাড়। কেমন ক'রে তারা সেই পাহাড় ডিঙোবে, হাঁ করে তাই ভাবতে লাগল।

পশ্চিম দিকে যে সৈন্যদল গিয়েছিল তারা আটকে গেল এক বনের ধারে এসে। দেখে, সামনে বিরাট গভীর বন। তাই আর এগোতে পারে না। শেষে সেখানে বসেই তারা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, কেমন করে বন পেরিয়ে ওদিকে যাবে।

দক্ষিণ দিকে যে সৈন্যদল গিয়েছিল তারাও অনেক দূরে গিয়ে এক জায়গায় থেমে গেল। কি আশ্চর্য! সামনে যে বিরাট সমুদ্র! অমনি মাথায় হাত দিয়ে তারাও ভাবতে লাগল, কেমন করে পাড়ি দেবে সেই সমুদ্রে।

কেবল পূব দিকে যে সৈন্যদল গিয়েছিল তারাই শুধু চলতে লাগল। চলতে চলতে তারা এসে গেল সেই নাম না-জানা দেশে। সেই দেশ দেখে তারা ভারি খুশি। কি সুন্দর দেশ! কেমন সুন্দর সব গাছপালা, আর কেমন সুন্দর সেইসব গাছের রঙ বে-রঙের ফুল।

পথেই সে দেশের একজন লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। অমনি লোকটিকে তারা জিজ্ঞেস করল—তোমাদের এই রাজ্যের নাম কি?

নাম? লোকটি অবাক হয়ে গেল। রাজ্যের আবার নাম থাকে নাকি?

—তোমাদের রাজা কে?

—রাজা আবার কে? আমরা সবাই রাজা। এতকাল আমরা মরেছিলুম। কিছুদিন হল বেঁচে উঠেছি।

—কেমন করে বাঁচলে তোমরা?

হেঁ-হেঁ-হেঁ!—লোকটি হেসে উঠল—তা বলব না। বললে তোমরাও বেঁচে উঠবে।

সৈন্যরা ভাবল, লোকটা পাগল নয় তো! তাই ধমক দিয়ে বলল—আমরা বেঁচে উঠব কিহে? আমরা তো বেঁচেই আছি।

আরো জোরে হাসতে লাগল লোকটি। বলল—বাঁচার মত কি আর তোমরা বেঁচে আছো? মরার মত বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। বাঁচলে বাঁচার মতই বাঁচতে হয়।

সৈন্যরা এবার ভাবল, লোকটা নিশ্চয় গুণী। মানুষ বাঁচাবার কৌশল যখন জানে তখন নিশ্চয়ই পশুকেও মানুষ করতে পারবে। তাই তারা বলল—তুমি আমাদের রাজার কাছে চলো।

লোকটি বলল—তোমাদের রাজা আবার কে? আমি রাজা-টাজা মানি না। আমি কারুর কাছে যাবো না।

সৈন্যরা দেখল মহা বেগতিক। অথচ এমন একটা লোককে হাতছাড়া করাও চলে না। অমনি তারা চটপট লোকটাকে ধরে ফেলল। তারপর তাকে বেঁধে নিয়ে চলল তাদের রাজার কাছে।

রাজার কাছে এসে যখন তারা পৌঁছল তখন সকলের আনন্দ দেখে কে! মনের খুশিতে সবাই ধেই-ধেই করে নাচতে শুরু করল।

বাঁধন-ছাদন খুলে লোকটাকে পেট পুরে খাওয়ান হল। খেয়ে-দেয়ে সে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। কাজেই মনে যেটুকু রাগ ছিল সেটুকু গেল ভুলে।

রাজা হবুরাম বললেন—শুনেছি তুমি নাকি মস্ত গুণী। মরা লোক কি করে বাঁচে তার কৌশল নাকি তুমি জান। আমার রাজ্যের যে-সব লোক পশু হয়ে আছে তাদের মানুষ করে দিতে পারবে?

লোকটি তো মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। রাজা যে এমন আদেশ করবেন তা সে ভাবতে পারেনি কখনো। তাই সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। অনেকক্ষণ পর লোকটা বলল—ওসব আমি পারব না মহারাজ।

জবাব শুনে হবুরাম গেলেন ভয়ানক রেগে। অমনি হুকুম করলেন—লোকটাকে অন্ধকার ঘরে পুরে রাখো। যতদিন সে পশুকে মানুষ করায় কৌশল বলে না দেবে, ততদিন ওখানেই আটক থাকবে।

লোকটি আর কি করবে? অন্ধকার ঘরেই শুয়ে শুয়ে দিন কাটায় আর চোখের জল ফেলে।



ওদিকে নাম-না-জানা দেশে বেধেছে এক হুলস্থূল ব্যাপার। যখন সৈন্যরা ওই লোকটাকে বেঁধে আনে, তখন দুর থেকে আর একটা লোক

তা দেখে ফেলেছিল। অমনি সে দৌড়ে গিয়ে সেই খবরটা বলে দিয়েছিল অন্য সবাইকে। তারপর সবাই যখন ছুটে এল, তখন তারা দেখে যে, লোকটাকে নিয়ে সৈন্যরা চলে গেছে অনেক দূরে।

তা হলে হবে কি? এ ব্যাপার এখানেই শেষ হল না।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নাম-না-জানা দেশের লোকেরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব ঠিক করে ফেলল।

স্থির হল যে, তারা সবাই দল বেঁধে গিয়ে সে দেশ খুঁজে বার করবে। তারপর আক্রমণ করবে, যুদ্ধ করবে।

নাম-না-জানা দেশের লোকেরা মরে ছিল বললে কি হবে? বুদ্ধি তাদের কিন্তু খুব ছিল। কি ভাবে অস্ত্র তৈরি করতে হয়, কেমন করে যুদ্ধ করতে হয়, সেসব তারা ভালই জানত।

কে জানে কোন্ অভিশাপে তারা এতদিন মরে ছিল? আজ একতার জোরে হয়ে উঠল তারা এক শক্তিশালী জাতি। তাদের বুদ্ধি আজ কাজে লাগল।

একজনের বুদ্ধি, আর একজনের শক্তি, তারই যোগাযোগে গড়ে ওঠে জগতের সব কিছু।

নাম-না-জানা দেশে আজ নতুন প্রাণের সাড়া এসেছে।

তীর-ধনুক, তরোয়াল তৈরী হল। তৈরী হল আরো কত নতুন অস্ত্র। তারপর দল বেঁধে তারা এগিয়ে চলল অভিযানে।

কুচকাওয়াজ করে চলল তারা।

দ্রুত···ধীরে···দ্রুত।

ডাইনে···বাঁয়ে···সামনে।

তিন দিন তিন রাত্তির চলার পর তারা পৌঁছে গেল সেই বনের ভেতর, যেখানে হবুরাম রাজা রাজ্য তৈরি করে রাজত্ব করছিলেন।

তখন অনেক রাত। জোছনায় ঝলমল করছে চারদিক।

দূর থেকে তারা হাঁক দিল—হেঁইও—ও···ও···

রাজার ঘুম গেল ভেঙে। ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি। মন্ত্রীও

উঠে বসলেন। ব্যাপার কি? এত রাত্তিরে আবার কোন্ উৎপাত এসে জুটল!

গলা বাড়িয়ে একটু দেখেই তো তাঁদের চক্ষু স্থির! একি! হাজার হাজার লোক এল কোত্থেকে? জোছনার আলোয় ঝলমল করছে তাদের হাজার হাজার তরোয়াল, বর্শা আর তীর-ধনুক।

রাজা আর মন্ত্রী ঘাবড়ে গেলেন। দু'জনেই ভাবলেন, তা'হলে কি সেই বেচারামের কথাই ঠিক হল? সেই বিদেশী রাজা কি সৈন্য সামন্ত নিয়ে আক্রমণ করল এই দেশ?

রাজা বললেন—মন্ত্রি, এখন উপায়?

মন্ত্রী বললেন—উপায় আর কি? হয় যুদ্ধ করতে হবে না হয় সন্ধি করতে হবে।

রাজা বললেন—যুদ্ধ করব, এত সৈন্য কোথায়? গুণী লোক খুঁজতে বেরিয়ে এখনো তো সবাই ফিরে আসে নি। যুদ্ধ করে দরকার নেই। সন্ধিই করব।

—যদি ওরা আপনার অর্ধেক রাজত্ব চায়?

—আমার আবার রাজত্ব কোথায় যে ভাগ দেব? সব তো নিয়ে নিয়েছে বাঘে। যে কোন শর্তে ওদের সঙ্গে সন্ধি কর।

সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে একজন প্রহরী চলল। তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—তোমরা কি চাও? যা চাও তাই পাবে। তা'হলে যুদ্ধ করবে না তো?

—না।

—কি চাও তোমরা?

লোকগুলি জবাব দিল—আমরা চাই রাজার মুণ্ডু।

রাজার মুণ্ডু? সর্বনাশ!—কথা শুনেই প্রহরী তো দিল দৌড়। এক দৌড়ে রাজার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মহারাজ, ওরা আপনার মুণ্ডু চায়।

—আমার মুণ্ডু?

—হ্যাঁ। মুণ্ডু পেলে তারা আর যুদ্ধ করবে না।

এই কথা শুনে রাজা নিজের মুণ্ডু নিয়ে কোথায় পালাবেন ভেবে পেলেন না। শেষে খাটিয়ার তলাতেই ঢুকে পড়লেন।

মন্ত্রী এবার আর একজন প্রহরীকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই প্রহরী গিয়েও লোকদের জিজ্ঞেস করল—তোমরা কি চাও? মন্ত্রী আমাদের সেই খবর নিতে পাঠিয়েছেন।

লোকগুলো জবাব দিল—মন্ত্রীর মুণ্ডু চাই। আমাদের দেশের একজন লোককে তোমরা বন্দী করে রেখেছ। তাকে শীগ্‌গির ছেড়ে দাও। নইলে তোমাদের রাজার আর মন্ত্রীর মুণ্ডু আমরা কেটে নিয়ে যাবো।

কথা শুনে সেই প্রহরীও দিল লম্বা দৌড়। মন্ত্রীর কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মন্ত্রীমশাই, ওরা আপনার মাথাও চায়।

—আমার মাথা? সর্বনাশ! আমার মাথা দিয়ে কি করবে ওরা?

—যে লোকটাকে বেঁধে এনেছিলাম তাকে ওরা ছেড়ে দিতে বলছে।

মন্ত্রীমশাই তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন—লোকটাকে এখনই ছেড়ে দাও ওদের সামনে। বলেই ভয়ে খাটিয়ার তলায় লুকিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে বিপক্ষ দল বীরদর্পে এগিয়ে এল। তারা ভাবল, নিশ্চয়ই এ রাজ্যের রাজা প্রজা সবাই বোকা। নইলে একটা লোকও এগিয়ে এল না যুদ্ধ করতে! তারা মহানন্দে হৈ চৈ করতে করতে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে, রাজার নতুন রাজপুরীতে।

সেখানে ঢুকে তারা দেখল রাজার সৈন্যরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ভয়ে তীর-ধনুক লাঠি-সোটা সব ফেলে দিয়েছে হাত থেকে।

তখন তারা রাজা আর মন্ত্রীকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় গেল রাজা আর মন্ত্রী। এদিকে নেই, ওদিকে নেই, কোথাও নেই! কোথায় পালিয়েছে কে জানে?

সারা রাত ধরে তারা খুঁজল। খুঁজতে খুঁজতে রাত কাবার!

ভোরের আলোয় দেখা যেতে লাগল সেই সব মানুষগুলোর মুখ। দেখেই সৈন্যরা চমকে উঠল। এ কি, এ যে তাদেরই রাজ্যের সব লোক!

যোদ্ধার দলও অবাক হয়ে গেল—এ কি, তোমরা এখানে?

সবাই যে সবার চেনা লোক। কি আশ্চর্য ব্যাপার!

তখন কোলাকুলির কি ধূম পড়ে গেল!

ওদিকে রাজা ও মন্ত্রী খাটিয়ার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁদের দেখে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সেনাপতি ও কোটাল এল এগিয়ে। সামনে এসে বলল—একি মহারাজ, একি মন্ত্রীমশাই, আপনারা এখানে?

রাজা ও মন্ত্রী কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন—কি করব, সবই কপালের ফের! তা না হলে তোমরাই বা কেন পশু হয়ে যাবে?

কথা শুনে সবাই অবাক। বলল—পশু হয়ে গেলাম? না তো! আমরা তো চলে গেলাম সেই নাম-না-জানা রাজ্যে।

রাজা আর মন্ত্রী কথা শুনে একেবারে হতভম্ব। বললেন—তাই নাকি? তা'হলে রানী, মন্ত্রিনী আর রাজকন্যারা কোথায়?

—তাদের খবর তো জানি না।

রাজা আর মন্ত্রী দু'জনেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তখন প্রজারা বলল—আর সকলের যখন খোঁজ পাওয়া গেল তখন তাঁদেরও পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

কোটাল জিজ্ঞেস করল—মহারাজ, আপনাদের এ দুর্দশা কেন?

মন্ত্রী জবাব দিলেন—আমাদের রাজপুরী দখল করেছে বাঘ-ভালুকেরা। কাজেই বনে চলে আসা ছাড়া আর উপায় কি?

প্রজারা বলল—তা'হলে চলুন, আমরা সবাই মিলে রাজপুরী আবার দখল করি। নগর মানুষের জন্যই, পশুর জন্য নয়। আমাদের বোকামি আর ভীরুতার সুযোগ নিয়ে পশুরা আমাদের সবকিছু অধিকার কেড়ে

নিয়েছে। সেই অধিকার আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

রাজা হবুরাম অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর প্রজাদের মুখের দিকে। এমন কথা তো তাদের মুখে আগে কোনদিন শোনেন নি। তা'হলে প্রজাদের ভেতর কি জেগে উঠল নতুন মানুষের জীবন!

প্রজারা বলল—আমাদের মনের মানুষ এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, আমরা তা জানতে পারিনি। নাম-না-জানা দেশে এসে আমাদের সেই মানুষ জেগে উঠেছে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন মন্ত্রীকে—মন্ত্রি, এখন কি করা যায়?

মন্ত্রী জবাব দিলেন—চলুন, আমাদের রাজ্যেই ফিরে যাই।

এরপর দল বেঁধে সবাই চলল রাজপুরী দখল করতে।



তিন দিন তিন রাত্তির পার হল। একদিন খুব ভোরে তারা গিয়ে পৌঁছল নিজেদের রাজ্যে। সূর্য তখনও ওঠেনি। হৈ-হল্লা আর এতগুলো মানুষের পায়ের দুপ-দাপ শব্দে চারদিক ভরে গেল।

সেই শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই পশুরা চমকে উঠল।

একি! কিসের এক সোরগোল?

শেয়াল উঠল সবার আগে। সে ছুটে গিয়ে খবর দিল—বাঘ মহারাজ, মানুষ সৈন্যরা আবার আসছে। এবার ওরা ওদের রাজ্য কেড়ে নেবে। এখন কি উপায় হবে আমাদের?

অমনি সবাই তাড়াতাড়ি জেগে উঠে পরামর্শ করতে লাগল, কি করা যায়। এমন সুখের রাজ্যপাট ছেড়ে যেতে কেউ রাজী নয়।

বাঘ বলল—সিংহাসন আমি ছাড়ব না।

সিংহ বলল—আমিও সিংহদ্বার ছাড়ব না।

গাধানী বলল—সোনার পালঙ্ক ছেড়ে আমি মোটেই নড়ব না।

ভালুক বলল—এখানে এসে আমার চিরকালের জ্বরটা সেরে গেছে।

জায়গাটা খুবই ভাল, তাই এখানে আরও কিছুদিন থাকব।

ওদিকে সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। শোনা যাচ্ছে দুপ-দাপ তাদের পায়ের শব্দ। তারা এগিয়ে আসছে আর চেঁচিয়ে উঠছে—

হারে-রে-রে-রে-রে!

তোরা জেগে আছিস কে রে?

রাজবাড়ির ফটকের কাছে এসেই তারা থমকে দাঁড়াল। একি! এ যে প্রকাণ্ড এক সিংহ দাঁড়িয়ে আছে দ্বারে।

অমনি তারা তীর ছুঁড়ল। কিন্তু সিংহ ভারি সেয়ানা। তীর খেয়ে সে গর্জন করে উঠল! মাটি উঠল কেঁপে। তারপর দল বেঁধে ছুটে এল যত বাঘ, বাঁদর আর ভালুক।

শুরু হল লড়াই।

সে এক আজব লড়াই। মানুষে আর পশুতে এমন লড়াই আর কেউ কোনদিন দেখে নি।

মানুষেরা তীর ছোড়ে, বর্শা ছোড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আর বাঁদরগুলো লাফিয়ে পড়ে মানুষদের ঘাড়ে।

নগরের রাজপুরীতে বাস করে পশুরাও হয়ে উঠেছে যুদ্ধবাজ। হয়ে উঠেছে আরো বেশি সাহসী।

এদিকে কেনারাম, সেই কেনারাম, যে এতদিন পশুদের সঙ্গে মিশে পশুর মত হয়ে আছে, সে করল এক অবাক কাণ্ড। এই হট্টগোল শুনে আবার সিংহাসনের তলায় ঢুকে পড়ল সে।

বাইরে তখন চলেছে ভয়ানক লড়াই।

তিন দিন তিন রাত্তির ধরে সমানে লড়াই চলল। পশুরা কি আর মানুষদের সঙ্গে পারে? অবশেষে জিৎ হল মানুষদেরই।

তখন পশুরা সব লেজ গুটিয়ে আবার বনের পথেই ছুটল।

রাজ্য আবার ফিরে পেয়ে মানুষদের সে কি আনন্দ!

রাজা বসলেন গিয়ে সোনার সিংহাসনে, মন্ত্রী বসলেন গিয়ে রূপো

সিংহাসনে। সেনাপতি, কোটাল সবাই যার যার আসনে গিয়ে বসল।

রাজা কিন্তু সিংহাসনে বসেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মনে হল সিংহাসনটা নড়ছে। রাজা ডান দিক ঘেঁষে বসে ছিলেন, এবার বাঁ-দিকে সরে বসলেন। তবু নড়ছে। আবার সরে বসলেন মাঝামাঝি। তবু নড়ছে। কি ব্যাপার?

রাজা ঘাবড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন সিংহাসন ছেড়ে।

মন্ত্রী, সেনাপতি সবাই লাফিয়ে উঠল রাজার দেখাদেখি। তারা বলল—কি হল মহারাজ?

দেহরক্ষীরা এগিয়ে এল—সর্বনাশ, এ আবার হল কি!

রাজা বললেন—নিশ্চয়ই সিংহাসনের তলায় কোন বাঘ ঢুকে আছে।

বাঘ!—সৈন্যরা এগিয়ে এল বর্শা নিয়ে।

সেনাপতি, কোটাল যে যার মত তরোয়াল বের করে বুক টান করে দাঁড়াল।

মন্ত্রী সিংহাসনের তলায় উঁকি দিয়ে দেখলেন। তারপর 'ও-মা গো, এ আবার কি!' বলেই তিনি একেবারে অজ্ঞান।

বুক টান করা সেনাপতি আর কোটালের বুক দুরদুর কাঁপতে লাগল। কি হল হঠাৎ!

ঘটিতে ঘটিতে জল এল। তারপর এল কলসীতে কলসীতে। সবাই মিলে মন্ত্রীর মাথায় জল ঢালতে লাগল।

রাজসভা জলে একেবারে থৈ থৈ!

পুরো একশো কলসী আর দুশো ঘটি জল ঢালার পর মন্ত্রী মাথা তুলে বসলেন।

সেনাপতি এবার উঁকি মেরে দেখলেন সিংহাসনের তলায়। তিনিও চেঁচিয়ে উঠলেন—ও-মা গো! এ আবার কেমন জানোয়ার?

তখন সৈন্যরা চারদিক থেকে বর্শা দিয়ে খোঁচাতে শুরু করল। খোঁচা খেয়ে সিংহাসনের তলা থেকে বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল কেনারাম।

সবাই অবাক হয়ে গেল। এমন চীৎকার তো বাঘের নয়। এ আবার কোন্ বিদ্‌কুটে জীব?

সৈন্যরা আরও জোরে খোঁচাতে লাগল।

এবার খোঁচা খেয়ে তলা থেকে বেরিয়ে এল কেনারাম। ধুলোবালি মাখা কিম্ভুত-কিমাকার চেহারা! বর্শার খোঁচায় গা দিয়ে রক্ত ঝরছে।

বেরিয়েই চ্যা-চ্যা করে কাঁদতে শুরু করল কেনারাম। সে কান্না ঠিক মানুষের কান্নার মত নয়। পশুর সঙ্গে থাকতে থাকতে কেনারাম মানুষের মত কাঁদতেও ভুলে গেছে।

রাজা আর মন্ত্রী তো কেনারামকে দেখে অবাক।

হবুরাম বললেন—একি কেনারাম, তুমি বেঁচে আছ?

গাবুরাম বললেন—তোমাকে তো বাঘে খেয়েছিল। তুমি বাঁচলে কেমন করে?

কিন্তু কেনারাম কথা বলতে পারে না। একেবারেই পশু বনে গেছে সে। শুধু চ্যা-চ্যা করে কাঁদতে লাগল।

রাজা আদেশ দিলেন কেনারামকে বন্দী করতে। কারণ সে জীবিত না মৃত তা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে লোকসমাজে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

মস্ত বড় একটা খাঁচা তৈরি করে তার ভেতর কেনারামকে ভরে রাখা হল।

রাজা আবার বসলেন সিংহাসনে। মন্ত্রীও এসে বসলেন। পাত্র-মিত্র সবাই বসল। কিন্তু মনে কারুরই শান্তি নেই। রাজার নেই রানী, মন্ত্রীর নেই মন্ত্রিনী। রাজ্যে স্ত্রীলোক নেই। ঘাটে পথে দেখা যায় শুধু পুরুষ, মেয়ে মানুষ নেই একটিও।

রাজা হবুরাম বললেন—মন্ত্রি, এবার কি করা যায়?

মন্ত্রী গবুরাম চুপ্-চাপ। কোন বুদ্ধি গজায় না তাঁর মাথায়।

একজন সৈনিক এগিয়ে এসে বলল—মহারাজ, রাজ্যের মেয়েদের খুঁজতে লোক পাঠান হোক।

হবুরাম খুশি হলেন। বললেন—তুমি ভাল বুদ্ধি দিয়েছ। দিলাম তোমাকে দশ মোহর পুরস্কার।

আর একজন সৈন্য এগিয়ে এসে বলল—মহারাজ, আগে কেনারামের বিচার করুন। সে এই রাজ্যেই ছিল, কাজেই সে হয়তো বলতে পারবে রানী আর অন্য মেয়েদের খবর।

হবুরাম আরো খুশি হলেন। বললেন—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমারও বুদ্ধি আছে। ভাল কথা মনে করে দিয়েছ তুমি। তোমাকেও দিলাম দশ মোহর পুরস্কার।

শেষে স্থির হল, আগে কেনারামের বিচার হবে। তা হলে তার কাছ থেকেই রাজ্যের সব মেয়েদের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

সবাই ধরাধরি করে খাঁচাসুদ্ধ কেনারামকে নিয়ে এল রাজসভায়।

খাঁচার ভেতর কেনারাম চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—মন্ত্রী, কেনারাম কথা বলে না কেন? ও যে কেনারাম তার কোন কিছু প্রমাণ আছে কি?

মন্ত্রী মহাবিপদে পড়লেন। সত্যি তো, প্রমাণ আর কি আছে?

সবাই মহাভাবনায় পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে তিন দিন তিন রাত্তির শুধু ভাবল তারা।



এদিকে হয়েছে আর এক ব্যাপার!

সেই যে নাম-না জানা রাজ্যের একটা লোককে হবুরাম বনের ভিতর বন্দী করেছিলেন, সেই লোকটার খোঁজ আর কেউ করেনি। কারণ সবাই ধূমধামে মেতে ছিল। কিন্তু তার কিছুদিন পর লোকটা একদিন রাত্তির বেলায় ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই দেখে বনের ভেতর লড়াই-এর যোগাড় চলছে। তাই না দেখে, সে গেল ঘাবড়ে।

শেষে ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে সে ছুটতে শুরু করল। দিক্-বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে ছুটতে সে এসে হাজির হল আর একটা বনে।

সেই বনে গিয়ে তার দেখা হল বেচারামের সঙ্গে। বেচারাম, সেই বেচারামের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? সেই যে নাক কাটা যাওয়ার পর মনের দুঃখে সে বনে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে দিনের পর দিন সেখানে বসে সে ফন্দি আঁটছিল, যেমন করে নিধিরামকে জব্দ করবে। তারপর রাজা আর মন্ত্রীকেও জব্দ করতে হবে বেশ করে।

সেই লোকটি বেচারামকে দেখেই সব কথা খুলে বলল। বেচারাম ভাবল এই তো সুযোগ। তা'হলে রাজা আর মন্ত্রী এখন কোথায় আছে সেটাই খুঁজে দেখা দরকার। তাদের খুঁজে পাওয়া গেলেই কাজ হাসিল করার ফন্দি করতে হবে।

সে যেখানে থাকত তার কাছেই আমড়াগাছের ডালে ছিল মস্ত বড় একটা মৌচাক। অনেকগুলো মৌমাছি একসঙ্গে জড়ো হয়ে সেখানে মৌচাক তৈরি করেছিল। একদিন হঠাৎ সে দেখল যে, মৌমাছিগুলি সব সেখান থেকে চলে গেছে। মৌচাকটাও নেই। শুধু গাছের ডালে লেগে আছে কিছুটা মোম।

বেচারাম সেই মোম পেড়ে নিয়ে এল। দেখল—বাঃ বেশ তো নরম! এ দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করা যাবে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় এসে গেল।

বেচারাম প্রথম নিজের নাকটাকেই মোম দিয়ে তৈরি করে নিল। নাকের যেটুকু কাটা গিয়েছিল, সেখানে এমনভাবে মোম জুড়ে দিল যে, একেবারেই ধরবার উপায় রইল না। তারপর নাকে ও কপালে মস্ত বড় তিলক কেটে সন্ন্যাসী সাজল। সাজ পোশাক এমনভাবে করল যে, তাকে চেনাই যায় না।

এরপর সে ঘুরতে লাগল এদিকে ওদিকে। অবশেষে একদিন গিয়ে হাজির হল রাজবাড়িতে। রাজপুরীতে তখন রাজা ফিরে এসেছেন।

সে ঢুকে পড়ল রাজদরবারে। গিয়ে দেখে খাঁচায় বসে আছে কেনারাম। সে চিনতে পারল সবাইকে, রাজবাড়ির কেউ তাকে কিন্তু চিনতে পারল না।

এদিকে রাজা আর মন্ত্রী শুধু ভাবছিলেন আর ভাবছিলেন। এমন সময় একজন সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁদের মনে আনন্দ হল। তাঁরা ভাবলেন, এই সন্ন্যাসী হয়তো একটা উপায় করে দিতে পারবে।

সন্ন্যাসী রাজার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁকল—

মহারাজ হবুরামের জয় হোক!
কেনারাম মানুষ হোক!

সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। লোকটা দেখি সব জানে! নিশ্চয়ই অশেষ গুণী।

হবুরাম তাকে সম্মান দেখিয়ে আসনে বসালেন। তারপর হাত জোড় করে বললেন—সন্ন্যাসী বাবা, কোন্ পাপে কেনারাম পশু হয়ে আছে বলুন তো?

বেচারাম বলল—সেটা পরখ করে দেখতে হবে। বলেই সে কেনারামের খাঁচার দিকে এগিয়ে গেল। বনে থাকতে থাকতে বেচারাম পশু পাখির ডাক শিখেছিল। বাঘ, শেয়াল ও অনেক রকম জন্তুর ডাক বেশ সুন্দর নকল করতে পারত।

খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে বেচারাম ডেকে উঠল—হুক্কা-হুয়া-হুয়া-হুয়া!

যেই ডাকা, অমনি কেনারাম উঠে দাঁড়াল। খুশিতে তার মন ভরে উঠল। সেও ডাকতে শুরু করল—হুক্কা-হুয়া-হুয়া-হুয়া! জানোয়ারদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কেনারামও অনেক রকম জানোয়ারের ডাক শিখেছিল। আজ হঠাৎ শেয়ালের ডাক শুনতে পেয়ে তার মনে পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল। অমনি সে একটানা ডাকতে লাগল—হুক্কা-হুয়া হুয়া-হুয়া!

বেচারামও ডাকতে লাগল—হুক্কা-হুয়া-হুয়া-হুয়া!

মনে হল রাজপুরীর ভেতর শেয়াল ঢুকেছে। বেচারাম যত না ডাকে

কেনারাম ডাকে তার চেয়েও বেশি—হুক্কা-হুয়া-হুয়া-হুয়া !

আশেপাশে যত কুকুর ছিল তারা ভাবল, রাজবাড়ির ভেতর শেয়াল ঢুকেছে। তারাও দলে দলে ঘেউ ঘেউ করতে করতে রাজবাড়ির ভেতর ঢুকতে লাগল।

ঘেউ ঘেউ ঘেউ ! জোর গলায় কুকুরেরা চেঁচাতে লাগল।

কেনারামের উৎসাহও গেল বেড়ে। সে প্রাণপণে ডাকতে লাগল—হুক্কা-হুয়া-হুয়া !

বাঘ দেখতে দেখতে কেনারামের এতকাল একঘেয়ে লাগছিল। আজ কুকুর দেখে তার ভারি আনন্দ হল। সে খাঁচার ভিতর নাচতে শুরু করল।

কুকুরে কুকুরে ভরে গেল রাজবাড়ি। রাজ্যের যত সব কুকুর এসে জড়ো হতে লাগল।

হবুরাম ও গবুরাম মহা ভাবনায় পড়লেন। এত কুকুর তাড়ানো যায় কি করে ?

মন্ত্রী হুকুম দিলেন—রাজপুরী থেকে কুকুর তাড়াও আগে।

সৈন্যরা সব লাঠিসোটা আর বর্শা নিয়ে ছুটল। কিন্তু কুকুরগুলিও বেপরোয়া, তারা নড়তে চায় না। লাঠি আর বর্শার ঘায়ে দলে দলে কুকুর মরতে লাগল। কয়েকটা ক্ষেপা কুকুর কামড়িয়ে দিল কয়েকজন সৈন্যকে। তারাও 'ওমা গো' বলে অস্ত্রশস্ত্র ফেলেই দিল চোঁ চাঁ দৌড়।

একটা মস্ত বড় পাগলা কুকুর রুখে এল মন্ত্রী গবুরামের দিকে। তাই দেখে গবুরাম তো সিংহাসন ছেড়ে দিলেন ছুট। ভুঁড়ির ভারে একেই তিনি চলতে পারেন না, তার উপর জোরে ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। পড়লেন বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে একটা কুকুরের ওপর। কুকুরের তো দফা রফা !

কিন্তু অন্য কুকুরগুলো ছাড়বে কেন ? দুটো কুকুর পড়ল তার উপর লাফিয়ে। দেখাদেখি আরো চার পাঁচটা কুকুর তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তাঁকে তো দেখাই যায় না। মনে হল কয়েকটা কুকুরই শুধু জড়াজড়ি করে আছে। তার ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে মন্ত্রীর চীৎকার —মারা গেলাম!

রাজা হুকুম দিলেন—মন্ত্রীকে বাঁচাও।

কিন্তু মন্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে সৈন্যরা তাঁর অবস্থা আরও কাহিল করে তুলল। কুকুরকে মারতে গিয়ে যতগুলো লাঠির ঘা মারা হল তার অনেকগুলোই লাগল মন্ত্রীর মাথায় আর পিঠে।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে মন্ত্রীকে তো উদ্ধার করা হল। কিন্তু কুকুরের নখের আঁচড়ে আর লাঠির ঘায়ে মন্ত্রীর অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। তবু তাঁর মাথার পাগড়ি আর পায়ের জুতো উদ্ধার করা গেল না। দেখা গেল দু'টি কুকুর জুতো জোড়া পরমানন্দে ভোজন করছে।

সব কুকুরগুলো তখনও চলে যায় নি। তারা এদিক ওদিক ঘুরে ভয়ানক হামলা শুরু করেছে। আর কেনারামও অবিরাম ডাকতে শুরু করেছে—হুক্কা-হুক্কা-হুয়া!

অমনি একদল কুকুর তার দিকেই তাড়া করে গেল। কিন্তু সে রয়েছে খাঁচার ভিতরে। তাকে ধরতে না পেরে কুকুরগুলো রাগে গজগজ করতে লাগল।

আর একদল কুকুর এগিয়ে গেল এবার রাজার সিংহাসনের দিকে। তাই দেখে হবুরাম সিংহাসনের উপরেই উঠলেন লাফিয়ে।

এমন সময় বেচারাম করলে কি, বাঘের মত সুর করে ডেকে উঠল—হা—লু—ম!

কেনারামও ডাকল—হা—লু—ম!

যেই ডাকা অমনি সব কুকুরের দল গেল ঘাবড়ে। তারা ভাবল বুঝি বাঘ আসছে। জঙ্গলের ধারে তারা বাস করে কিনা, তাই বাঘের ডাক তাদের খুব চেনা। কাজেই বাঘের মুখে পড়বার ভয়ে তারা লেজ গুটিয়ে সবাই পালাল। এক নিমেষে রাজপুরী একেবারে কুকুরশূন্য হয়ে গেল।

সব কুকুর চলে গেলে হবুরাম একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বেচারামকে বললেন—আপনার তো অনেক গুণ। এই খাঁচার লোকটা যে আগে মানুষ ছিল তা আপনি জানলেন কি করে ?

আমি বনের ভেতর একশো বছর সাধনা করেছি।—সাধুবেশধারী বেচারাম জবাব দিল।

রাজা অবাক হয়ে বললেন—একশো বছর ? তা'হলে এখন আপনার বয়স কত ?

—আমার বয়সের গাছপাথর নেই। আপনি জন্মাবার আগে আমার যা বয়েস ছিল, আপনার মৃত্যুর পরেও আমার সেই বয়েস থাকবে। এবার হিসাব করে দেখুন।

রাজা মাথা চুলকিয়ে হিসাব করতে লাগলেন। পাশে মন্ত্রী নেই, কা'কে হিসেব জিজ্ঞেস করবেন! শেষে অবাক হবার ভান দেখিয়ে বললেন—বাবাঃ, আপনার এত বয়েস! তা'হলে তো আপনার খুব বুদ্ধি আছে। এখন বলুন তো, এই লোকটা এমন হল কেন ?

—পশুদের ছোঁয়াচ লেগেছে।

—পশুর ছোঁয়াচ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু এই কেনারাম কেন, আপনাদের ভেতর অনেকেই যে পশু হয়ে আছে।

—এ্যাঁ, বলছেন কি ?

হবুরাম সিংহাসন থেকে আবার লাফিয়ে উঠলেন। উঠে এসে সেনাপতির দিকে তাকালেন, কোটালের দিকে তাকালেন। দেখলেন, কাউকে পশুর মত দেখা যায় কিনা!

বেচারাম বলল—অমনি করে দেখলে কিছু বুঝবেন না মহারাজ, কোন পশু এনে তাদের দিয়ে পরখ করাতে হবে। তারা দেখলেই বুঝতে পারবে কার ভেতর পশুর লক্ষণ আছে।

হবুরাম মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন—তা'হলে কি হবে ?

বেচারাম বলল—চিন্তিত হবেন না মহারাজ! আমি সব বের করে

দেব ! দেখলেন তো, প্রথম দিনেই কেমন একটা পরখ হয়ে গেল ?

—কিসের পরখ ?

—ঐ যে মন্ত্রী মশাইকে কুকুররা চিনতে পেরেছে। সে জন্যই তো তাঁকে ওরা তেড়ে ধরতে গেল !

—তাই নাকি ? তা'হলে উপায় ?

—কিছুদিনের জন্য মন্ত্রীমশাইকে বরখাস্ত করুন। তিনি পুরোপুরি মানুষ হলে তবে আবার তাঁকে মন্ত্রীর গদিতে বসাবেন।

হবুরাম গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন—মানুষ হ'তে ক'দিন লাগবে ?

—আজ্ঞে একুশ দিন।

—কি করতে হবে ?

—একুশ দিন বিছানায় শুয়ে থেকে মন্ত্রীকে ওষুধ খেতে হবে।

—কি ওষুধ ?

—একুশটি নদীর জল আর একুশ রকম ফলের রস দিয়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে। জিনিসপত্তর যোগাড় হলে আমিই ওষুধ তৈরি করে দেব।

রাজার মন একটু খুশি হল। বললেন—বেশ, তাই হবে। আপনাকে আজ থেকেই এই কাজে বহাল করলাম। যা খরচ লাগে সব আমি দেব। এই চিকিৎসার ক'দিন আপনি রাজবাড়িতেই থাকবেন।

রাজার হুকুম মত সব কাজ হল। বেচারাম মহা সুখে রাজভোগ খেতে লাগল। একুশটি নদীর জল আনতে ঘোড়া নিয়ে ছুটল একুশজন ঘোড় সওয়ার। আর একুশ রকম গাছের ফল আনতে একুশটি হাতীর পিঠে চলল একুশজন মাহুত।



বেচারাম আরামে খায় দায় আর ঘুমায়। রোজই সকালে ঘুম থেকে উঠে নাকটাকে হাতিয়ে দেখে ঠিক আছে কিনা। মাঝে মাঝে

মোম দিয়ে একটু ঠিক-ঠাক করে দেয়। বুদ্ধি করে খানিকটা মোমও সে সঙ্গে এনেছিল।

একুশটি নদীর জল আর একুশ রকম গাছের ফল এলে মন্ত্রীর চিকিৎসা শুরু হবে। মন্ত্রী এখন শুধু শুয়েই থাকেন। রাজ দরবারে যাওয়া তাঁর নিষেধ।

রাজা বললেন—সন্ন্যাসী, ততদিন না হয় আপনি কেনারামের চিকিৎসা করতে থাকুন। ওকেও তো মানুষ করতে হবে।

বেচারাম বলল—মহারাজ, একটি নিবেদন আছে।

—কি নিবেদন ?

—আপনাদের নিধিরাম সর্দারকেও ঐ খাঁচার ভেতর পুরে রাখতে হবে।

—কেন ?

—তাতেই কেনারাম তাড়াতাড়ি মানুষ হতে পারবে।

—তাই নাকি। বেশ। হবুরাম তখনই হুকুম দিলেন—নিধিরামকে খাঁচায় আটক কর।

সৈন্যরা ধরাধরি করে নিধিরামকে খাঁচার ভেতর ভরে ফেলল। নিধিরামের এই অবস্থা দেখে বেচারাম মনে মনে খুব খুশি !

এবার হয়তো তার মনের আশা পূরণ হবে।

কয়েকদিন পর রাজা এলেন কেনারামের অবস্থা দেখতে। সন্ন্যাসী বেচারামকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

বেচারাম বলল—মহারাজ, দেখুন কি আশ্চর্য ফল হয়েছে।

—কি রকম ?

—ঐ দেখুন, কেনারাম কিছু কিছু কথা বলতে শিখেছে !

—তাই নাকি ? ভারি খুশি হলেন রাজা।

বেচারাম খাঁচার খুব কাছে গিয়ে বলল—কেনারাম, বলতো হিং-টিং-ছট্ !

কেনারাম খাঁচার ভিতর নিধিরামের সঙ্গে থাকতে থাকতে সত্যি কিছু কিছু কথা বলতে শিখেছিল। পুরনো স্মৃতি একটু একটু করে আবার ফিরে আসছিল তার। তাই বেচারামের কথায় সাড়া দিয়ে বলল—হিং-হিং-হিং……

বেচারাম বলল—হিং-হিং-হিং নয়, হিং-টিং-ছট্!

এবার কেনারাম বলল—হিং-টিং-ছট্।

বেচারাম খুশিতে গদগদ হয়ে বলল—দেখলেন মহারাজ! দেখলেন! কেনারাম কেমন মানুষের মত কথা বলছে।

হবুরাম আহ্লাদে আটখানা। বললেন—বেশ, বেশ! সাবাস্ সাধুবাবা। আপনাকে অনেক পুরস্কার দেব।

তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন বেচারামকে—আমার ভেতরে কোন পশুর ছোঁয়াচ লাগে নি তো?

বেচারাম গম্ভীর হয়ে জবাব দিল—এখনও বলা যায় না মহারাজ। আপনাকেও পরখ করাতে হবে।

হবুচন্দ্র বললেন—দেখো, পরখ-টরখ করে আর কাজ নেই। মন্ত্রীকে যে ওষুধ খাওয়াবে, আমাকেও চুপি চুপি সেই ওষুধ একটু খাইয়ে দিও। তোমাকে দেবো আরও পঞ্চাশ মোহর পুরস্কার।

—পঞ্চাশ মোহরে চলবে না মহারাজ, একশো মোহর দিতে হবে।

—আচ্ছা, একশো মোহরই দেব।

দিন যায়, রাত যায়, মাস যায়। তবু একুশ নদীর জল নিয়ে ফিরে আসে না ঘোড়সওয়ার! একুশ রকম গাছের ফল নিয়ে হাতিও আসে না।

মন্ত্রী শুয়ে শুয়ে দিন কাটান। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাঁর পিঠে ব্যথা ধরে যায়। রাজা রোজ তাঁকে দেখতে যান। গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন, মন্ত্রীর মুখটা কোন জন্তুর মত হয়ে যাচ্ছে কিনা।

দিন কাটে, রাত কাটে, মাস কাটে, মাসে মাসে বছর কাটে। এমনি করে কাটে আরও অনেক দিন।

তারপর একদিন ফিরে এল একুশটি ঘোড়সওয়ার। তাদের দেখে রাজা খুশি মনে এগিয়ে এলেন তাদের সামনে। এসেই প্রথম ঘোড়-সওয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন—নদীর জল এনেছ তুমি?

অমনি সে হাত বাড়িয়ে দিল একটা মস্ত বড় ছবি। বলল—মহারাজ, জল পাইনি। তার বদলে নিয়ে এসেছি এই ছবি।

—কেন?

—নদীর জল তুলতে নামলেই সে-দেশের রাজার লোকেরা বাধা দিল।

—কেন?

—তারা বলল, আমরা ক্ষীরনদীর জল কাউকে তুলে নিতে দিই না। এখানে এসে সবাই খেয়ে যায়।

—তবে তারা ছবি আনতে দিলে কেন?

—এটা তাদের দেশের ছবি। কি সুন্দর সে দেশ। কোন রোগ নেই, শোক নেই, দুঃখও নেই সেখানে। ওষুধের কোন দরকার হয় না তাদের। এই ছবির ভেতর দিয়েই সেই খবর তারা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এবার রাজা ডাকলেন দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ারকে। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি জল এনেছ?

ঘোড়সওয়ার জবাব দিল—আজ্ঞে না, মহারাজ।

—কেন?

—সে দেশের লোকেরা বলল, একুশ নদীর জল আর একুশ রকম

পান্না—৫

গাছের ফল দিয়ে কোন ওষুধই হয় না। ওতে কোন অসুখও সারে না। শেষে তারা দিয়ে দিলে এই ফুল, যা কখনও শুকাবে না।

একে একে সব ঘোড়সওয়ারই এমনি করে রাজার কাছে এসে মাথা নিচু করল। কেউ জল আনতে পারেনি। সবাই নিয়ে এসেছে এক এক দেশের এক একটি চিহ্ন।

রাজা অবাক হলেও রেগে গিয়ে বললেন—তোমরা সবাই অপদার্থ!

তখন সবাই একবাক্যে বলল—মহারাজ, একুশ নদীর জল আর একুশ রকম ফল দিয়ে কিছুই হয় না, জোগাড় করাও ভারি কঠিন। এটা শুধু সন্ন্যাসীর চালাকি।

তাই নাকি?

কথা শুনে মন্ত্রী লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। কেনারাম আর নিধিরাম কেমন করে যেন খাঁচা খুলে বাইরে চলে এল।

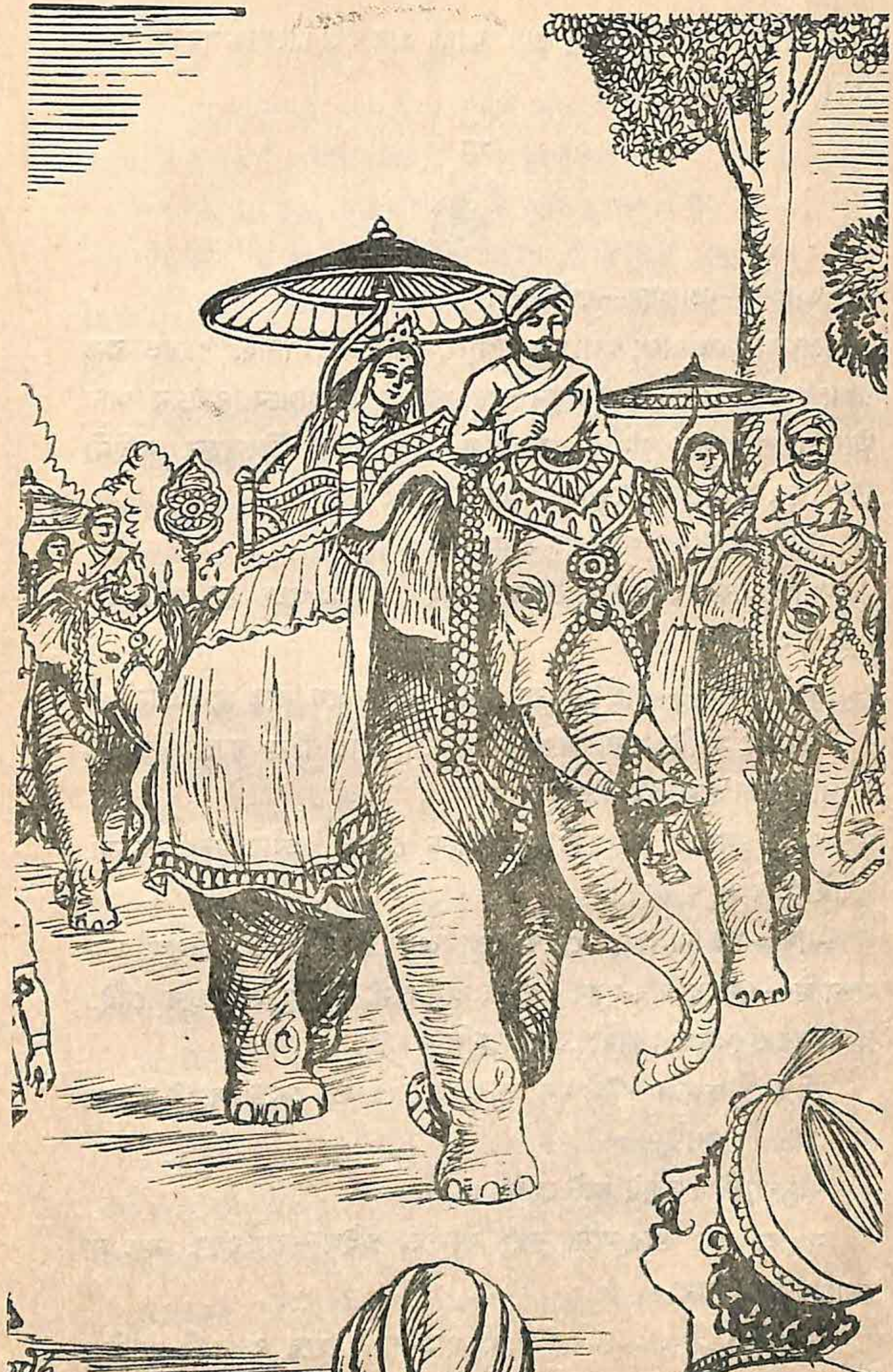
হৈ হট্টগোল পড়ে গেল চারদিকে।

সেইদিন একুশটি হাতিও ফিরে এল। সৈন্যরা বনবাদাড় খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গিয়েছিল তাদের দেশের হারানো সব স্ত্রীলোকদের। তাই ফলের বদলে হাতির পিঠে চাপিয়ে মেয়েদের সবাইকে তারা নিয়ে এল। ফিরে এলেন রানী, মন্ত্রিণী আর কোটালনীরা সব। তাঁদের দেখে রাজা মন্ত্রী আর কোটালের কি আনন্দ!

সারা রাজ্যে আনন্দের ফোয়ারা ছুটল।

এদিকে বেচারামের অবস্থা হল কাহিল। এ সব দেখে শুনে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু পালাতে আর পারল না। যে খাঁচায় কেনারাম আর নিধিরামকে রাখা হয়েছিল, সেই খাঁচায় তাকে বন্দী করা হল।

রাজার হুকুমে তাকে বন্দী থাকতে হল। তবে জানিয়ে দেওয়া হল,



রানী, মন্ত্রিনী আর রাজবাড়ির মেয়েদের নিয়ে একুশটি হাতি ফিরে এল।

অভিষেকের দিন সে পাবে মুক্তি। কারণ তার জন্য রাজ্যের সব মেয়েদের ফিরে পাওয়া গেল কিনা!



তাকডুম—তাকডুম—পোঁ—পোঁ!

রাজবাড়িতে বাজতে লাগল নাগারা, টিকারা, সানাই, আরও কত রকম বাদ্য। এবার রাজা নতুন করে আবার সিংহাসনে বসবেন আর তাঁর পাশে বসবেন রানী। কতকাল পরে রানী ফিরেছেন, মন্ত্রিনী ফিরেছেন, ফিরেছেন রাজ্যের সব মেয়েরা, বউয়েরা!

প্রজাদের মনেও আনন্দের সীমা নেই।

অভিষেকের ঘটা শুরু হতে না হতেই আবার শুরু হল আর এক নতুন উৎসব।

রানী বললেন—রাজকন্যা বড় হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে এখনই।

একথায় সবাই সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। বিয়ের ব্যাপারটা তা'হলে এই সঙ্গে চুকে যাক।

অমনি আবার সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এবার আর যুদ্ধ নয়, সবাই ছুটল বর খুঁজতে।

নাম না-জানা রাজ্য থেকে এল এক ছেলে। তার বিপুল ধন-সম্পত্তি···অফুরন্ত মণি-মুক্তো···প্রচুর দাস-দাসী···কিছুরই অভাব নেই। ভাবী বর দেখে রাজা রানী তো মহাখুশি!

কিন্তু রাজকন্যা রইল মন ভার করে। তা দেখে সবাই ভাবল, এ আবার কি ব্যাপার?

দাস-দাসীরা সবাই ছুটে গেল।

সখীরা এসে তার মনের কথা জানতে চাইল—রাজকন্যা, কও না তোমার মনের কথা।

রাজকন্যা বলল—ধনরত্ন আর দাস-দাসী দিয়ে করব কি আমি?

সে তো আমাদেরও অনেক আছে।

—তবে কি তোমার মনের দুঃখ? কি তুমি চাও?

—সে কি পারবে আমায় গান শোনাতে? পারবে কি সে সাত-সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সোনার কমল তুলে আনতে?

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল রাজকন্যার মুখের দিকে।

রাজকন্যা এসব বলে কি? এমন কথা তো কোনদিন কেউ শোনেনি তার মুখে। রাজকন্যার কথা শুনে ছেলেটিও মুখ নিচু করে চলে গেল।

এবার এল আর এক ছেলে। দেখতে যেন সোনার কার্তিক। রূপের আলোয় ঝিকমিক করে তার দেহ। রাজা রানী এবারও মহাখুশি। কিন্তু তা'হলে হবে কি? রাজকন্যা তেমনি রইল মন ভার করে।

দাস-দাসীরা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

সখীরা আবার ঘিরে ধরল তাকে—রাজকন্যা, কও না তোমার মনের কথা।

রাজকন্যা বলল—ওই রূপ নিয়ে আমি কি করব? মাছরাঙা পাখিরও তো রূপ আছে।

—তবে কি চাও তুমি?

—ও কি পারবে আমায় গল্প শোনাতে? ও কি পারবে আমায় বাঁচাতে দৈত্য দানবের হাত থেকে?

কথা শুনে সবাই অবাক। রাজকন্যা এসব কথা শিখল কোত্থেকে? কেমন করে হল তার এত জ্ঞান?

যে ছেলেটি বর সেজে বিয়ে করতে এসেছিল, রাজকন্যার কথা শুনে সেও মাথা হেট করে ফিরে গেল।

এবার এল আর এক তরুণ যুবক। দেখতে শুনতে অতি সাধারণ। কিন্তু গায়ে খুব জোর। অনেক শাস্ত্রও সে পড়েছে। শুধু তাই নয়, অস্ত্র চালনাতেও সে নিপুণ!

অনেকেই বলল—রাজকন্যার বর হবে ঘর উজল করা,—দিক উজল

করা ! তা নয়, এ আবার কেমন ?

রাজা রানীর মন গেল দমে। বর দেখে তাঁরা খুশি হলেন না মোটেই।

কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার। এই বর দেখে রাজকন্যার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল—হ্যাঁ, আমি এরই গলায় দেব মালা।

এতে সবাই অবাক হলেও অবাক হল না নাম-না-জানা দেশের লোকেরা। কারণ তারা জানে, ধীরে ধীরে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে নতুন গতিতে, তাই এগিয়ে চলেছে এখানকার মানুষও।

এসব কথা জানবার পর রাজা রানী কিন্তু খুব খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁরা রাজী হলেন রাজকন্যার বিয়ে দিতে।

একদিন খুব ঘটা করে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়েতে খাওয়া দাওয়ার কি আয়োজন !

দেশ বিদেশ থেকে ময়রা এল ! পথের পাশে পাশে উনুন তৈরি করে তাতে লুচি ভাজা হতে লাগল। হাতির পিঠে ক'রে ঘি এল ভাঁড়ে ভাঁড়ে। এত লুচি তৈরি হল যে, সেগুলো রাখতে গিয়ে পথ ঘাট একেবারে গেল বন্ধ হয়ে। লোক চলবার আর উপায় রইল না। বড় বড় ইঁদারা আর পুকুর কেটে তাতে রাখা হল দই। তৈরি হল গামলা গামলা রসগোল্লা আর পানতোয়া, কিন্তু সেগুলো রাখবার জায়গাই হল না। শেষ পর্যন্ত পুকুরের জলে চিনির রস ঢেলে সেখানে রাখা হল রসগোল্লা আর পানতোয়া।



হৈ-হল্লা করে নানা রাজ্যের লোকেরা নেমন্তন্ন খেতে এল। সে কি খাওয়া ! এমন খাওয়া বোধ হয় কেউ কোনদিন খায় নি।

দূর থেকে যারা এসেছিল তারা এত খাওয়া খেল যে, হেঁটে আর

সেদিন কেউ বাড়ি ফিরতে পারল না। তিন দিন তিন রাত্রির তারা পথের মাঝেই ঘুমিয়ে কাটাল।

কেনারাম খেয়েছিল বোধ হয় সব চেয়ে বেশি। খেয়ে ঢেঁকুর দিতে গিয়ে বমিই করে ফেলল। বমিতে বমিতে হয়ে গেল তার মাথার সমান এক উঁচু পাহাড়।

আর আমাদের নিধিরাম সর্দার যে কি পরিমাণ খেল, তা সে নিজেই জানে না। খাওয়া শেষ করে এসে দেখল, অনেক লুচি আর দই তার গোঁফে আটকে আছে।

লজ্জা পেয়ে নিধিরাম এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। একটু দূরে এক কোণে তাকিয়েই সে লাফিয়ে উঠল। ঐ তো—ঐ যে সেই সন্ন্যাসীটা খেতে বসেছে!

রাজার আদেশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। কিন্তু এত খাওয়া-দাওয়ার লোভ সে সামলাতে পারেনি। তাই সে চলে যায়নি, নেমন্তন্ন খেতে বসেছে। এদিকে রোদ লেগে তার মোমের তৈরি নাকটা যে গলে গিয়েছে, তা সে টের পায় নি।

আর যায় কোথায়? নিধিরাম একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। সে এবার ঠিক চিনতে পেরেছে। ঐ সন্ন্যাসীটা আর কেউ নয়, বেচারাম। সেই নাক-কাটা বেচারাম।

বেচারাম নিধিরাম সর্দারকে দেখেই খাওয়া ফেলে দে ছুট্। এত সাধের খাওয়াটা তার মাটি হয়ে গেল।

কিন্তু নিধিরামও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও পেছনে পেছনে ছুটতে শুরু করল।

বেচারামের আর দিক্‌বিদিক জ্ঞান নেই। সে ছুটছে তো ছুটছেই। ছুটতে ছুটতে সে হঠাৎ একটা পুকুরে পড়ে গেল। সে পুকুরে ছিল পানতোয়া আর রসগোল্লা। কাজেই পড়ে গিয়ে ভালই হল, সাঁতরে সাঁতরে সেগুলো খেতে লাগল।

ওদিকে নিধিরাম সর্দারের অবস্থাও হল কাহিল। সে পড়ে গেল

একটা দইয়ের কুয়োর ভিতর। তার নাক মুখ দিয়ে সব দই ঢুকতে লাগল।

তারপর লোকজনেরা যখন তাদের টেনে ওঠাল, তখন তু'জনেরই রাগ গেছে জল হয়ে।

বেচারাম বলল—এত পানতোয়া আর রসগোল্লা খেয়েছি যে, পরের জন্মেও না খেলে চলবে।

নিধিরাম বলল—ভাই, এত দই দেখেছি যে সাত জন্মে আর দই খেতে হবে না।

তু'জনেই তখন আনন্দে কোলাকুলি করল।

এবার—

আমার কথাটি ফুরাল,
নটে গাছটি মুড়াল।

তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি। তোমরা যে হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কাহিনী পড়ে থাকো, তাঁরা কিন্তু এই হবুরাম আর গবুরাম মন্ত্রীরই ছেলে। অর্থাৎ হবুরাম আর গবুরাম হলেন হবুচন্দ্র আর গবুচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

কাজেই এই কাহিনী যদি আমি আজ না বলতাম, তবে তোমাদের কাছে এটা চিরকালই অজানা রয়ে যেত।





রবিদাস সাহারায়



এক

গভীর জঙ্গল।

দিনের বেলাতেও তার পাশ দিয়ে হাঁটলে গা ছমছম করে।

লোকে বলে—লাখীর জঙ্গল।

কিভাবে এই নামের উৎপত্তি হল তা কেউ বলতে পারে না। অনুমান ক'রে অনেকেই অনেক কথা বলে। আগে নাকি এখানে ছিল লাক্ষা বন। প্রচুর লাক্ষা উৎপন্ন হত এখানে। বর্তমানে একটি লাক্ষা গাছও এ অঞ্চলে পাওয়া যাবে না। এখন আছে বিরাট শাল তমাল আর হিজল গাছ। লাক্ষা নিঃশেষ হয়ে গেলেও লাক্ষা নামটি 'লাখী' হয়ে জঙ্গলের সঙ্গে মিশে আছে।

কেউ কেউ বলে 'বিশালাক্ষী' নাম থেকেই এই জঙ্গলের নাম হয়েছে লাখীর জঙ্গল।

জঙ্গলের ভেতর এখনও আছে এক পুরনো বিশালাক্ষী মন্দির। মন্দিরের অবস্থা জীর্ণশীর্ণ। কিন্তু দেবী জাগ্রত। বিরাট আট হাত কালী মূর্তি আছে সেই মন্দিরে।

মন্দির কবে তৈরি হয়েছে, বা মূর্তি কবে প্রতিষ্ঠা করেছে তা কেউ বলতে পারে না সঠিক ভাবে, কিন্তু অনেক প্রাচীন কাহিনী এ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। মূর্তিটি পুরনো হলেও ভয়ঙ্কর-দর্শন, মুখের দিকে তাকালেও ভয় করে।

মন্দির নামেই আছে, বড় একটা কেউ যায় না সেখানে পূজা দিতে। জাগ্রত দেবী আছে জেনেও যায় না। জঙ্গলের গাছে মরা মানুষের দেহ ঝুলতে দেখে কত লোক যে কতবার ভয় পেয়েছে তার অন্ত নেই। রাত বে-রাতে জঙ্গলের ধারের পথ দিয়ে যেতে যারা ডাকাতের খপ্পরে পড়েছে

তাদের ভাগ্যেই ঘটেছে ঐ দশা !

তাই ভয় পায়—ভয়ানক ভয় পায় সবাই ঐ লাখীর জঙ্গলের নাম শুনলে। কারণ ওখানে কালু ডাকাতের আড্ডা। ওটা ডাকাতের জঙ্গল নামেই এখন পরিচিত।

কালু ডাকাত।

যেমন তার চেহারা তেমনি তার গায়ের জোর।

কালু ডাকাতকে কে না চেনে এই অঞ্চলে! শুধু এ অঞ্চলে কেন, কাছে দূরের সব অঞ্চলের লোকের কাছেই তার নাম ভয়ানক পরিচিত।

লোকে তার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে।

ডাকাতের সর্দার কালু। বিরাট তার দলবল। কেউ কেউ বলে প্রায় পঞ্চাশজন ডাকাত আছে সেই দলে। বেশির ভাগই বাগদী আর আগুরী। লাঠি খেলায় তারা ওস্তাদ। তাদের হাতে লাঠি থাকলে বন্দুক দিয়েও কেউ সহজে তাদের ঘায়েল করতে পারে না। এমনি তাদের হাতের কৌশল ও গায়ের জোর।

লোকের ধারণা বিশালাক্ষীর মূর্তির সামনে নরবলি হয়। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে তারা বিশালাক্ষীর পূজা দেয়—দেয় নরবলি। কালু সর্দারের দলের লোকেরা ধরে নিয়ে আসে বলির জন্য মানুষ। তাকে স্নান করিয়ে তেল সিন্দুর মাখিয়ে মা কালীর মূর্তির সামনে বলি দেওয়া হয়।

কি নিষ্ঠুর—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

কিন্তু কেন এমন নিষ্ঠুর কাজ করে কালু ডাকাত!

কেউ কেউ বলে এই নরবলি দেয় বলেই তারা মা কালীর আশীর্বাদ পায়। ডাকাতির কাজ তাদের নিরাপদ ভাবে চলে। মা কালী তাদের রক্ষা করেন বিপদ আপদ থেকে!

কিন্তু বলির কাজ করতে হয় খুব নিষ্ঠা সহকারে।

কোন ত্রুটি হলে আর রক্ষা নেই। ভয়ানক অমঙ্গল হয় ডাকাত দলের।

একবার তাই হয়েছিল।

বলির মানুষটিকে আনা হয়েছিল অনেক কষ্টে জোগাড় করে। কিন্তু লোকটা বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয়েই সে ছিল আধমরা। ধরবার সময় তার ওপর মারধোর করতে হয়েছিল অনেক। কিছুতেই তাকে আনা যাচ্ছিল না। টেনে হিঁচড়ে মেরে ধরে তবে আনতে হয়েছিল। সেই আধমরা লোকটিকে যখন স্নান করিয়ে তেল সিঁদুর কপালে মাখানো হচ্ছিল তখন দেখা গেল তার দেহে প্রাণ নেই।

মরা মানুষ বলি হয় না। তাই সেদিন আর বলি হল না। খুশি করা গেল না মা বিশালাক্ষীকে।

তার ফল হল মারাত্মক।

পরদিন ডাকাতি করতে বের হল ডাকাত দল। আগেই সব আয়োজন করা ছিল, কাজেই বের হতেই হল। বদরগঞ্জে এক ধনী জোতদারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল তারা। ভেবেছিল অতি সহজেই কাজ হাসিল হবে। কিন্তু কাজ তো কিছুই হল না, উল্টে আরও ফ্যাসাদ হয়ে গেল।

সেদিন ডাকাতি করতে গিয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে গেল দলের একজন লোক।

সেই লোকটি আর কেউ নয়—সর্দারের জোয়ান ছেলে রতনলাল। বাবার মতই সে হয়ে উঠেছিল ওস্তাদ। বিপাকে পড়ে সে ধরা পড়ল।

কিন্তু একটি লোক ধরা পড়লেও গোটা ডাকাত দলের বিপদ। তাই সর্দারের আদেশ ছিল দলের কাউকে ছেড়ে চলে আসতে পারবে না। যেভাবেই হোক তাকে কেড়ে নিয়ে আসতে হবে। তা যদি না পারে তবে আসবার আগে তার মাথাটা কেটে নিয়ে আসতে হবে। তা

হলেই ভয় বিশেষ থাকবে না। সেই লোকটিকে সনাক্ত করতে পারবে না কেউ।

হোক্ সর্দারের ছেলে, তবু হুকুম মত রতনলালের গলা কেটে আনা হল।

লাখীর জঙ্গলে ফিরে এসে বিশালাক্ষীর পায়ে দেওয়া হল সেই কাটা মুণ্ড উপহার।

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা হল।

একমাত্র ছেলেকে হারিয়েও কালু কোন রকমে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল। কারণ ডাকাতের দলকে রক্ষা করতে হলে নিয়ম মেনে চলতেই হবে। কিন্তু বেচারী রতনলালের মা? তার কানে যখন একবার এ খবর গিয়ে পৌঁছল তখন সে পাগলের মত হয়ে ছুটে এল লাখীর জঙ্গলে। ছেলের কাটা মুণ্ডটি বুকে জড়িয়ে বিশালাক্ষীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

—আমার ছেলে দে—আমার ছেলে দে মা—বলে কাঁদতে লাগল সর্দারের বউ কমলমণি।

সে কি করুণ কান্না!

সে কান্নায় বিশালাক্ষীর বুঝি মন গলল। দয়া হল তাঁর।

কি আদেশ পেল কমলমণি কে জানে! সহসা তার কান্না স্তব্ধ হয়ে গেল।

ফিরে পেল একদিন সর্দারের বউ তার ছেলেকে।

সে এক বিচিত্র কাহিনী।



ঠিক তার এক বছর পরের ঘটনা।

কালু ডাকাতের দল খবর পেল তিন ক্রোশ দূরে পাটুলি গ্রামে বিশ্বরূপ দাসের বাড়িতে অনেক টাকাকড়ি ও সোনা রূপোর জিনিসপত্র

পাওয়া যেতে পারে। কয়েকদিন আগে বিশ্বরূপ দাসের মৃত্যু হয়েছে, তার সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য তার ছেলেরা শহর থেকে এসেছে।

অনেক সম্পত্তি ছিল বিশ্বরূপ দাসের। সোনাদানা এবং নগদ টাকাকড়িও ছিল অনেক। সেগুলি কোথায় ছিল কেউ জানে না, মাধবদাসের মৃত্যুর পর সব বেরিয়েছে। তাই নিয়ে পাটুলি গ্রামেও সাড়া পড়ে গেছে।

ডাকাত দলেরই একজন খবর নিয়ে এল। বেশি দেরি করলে সেই সম্পত্তি পাওয়া যাবে না। ছেলেরা শহরে চলে যাবে।

কালু সর্দার বলল—আজ রাতেই তা'হলে সেখানে যেতে হবে।

সন্ধ্যার আগেই ডাকাতের দল পাটুলি গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল।

তিন ক্রোশ পথ, সময় লাগবে অনেক। ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা সড়ক পেছনে ফেলে কাঁচা মাটির পথ দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। ফাঁকা জায়গা—চারদিকে ধান ও পাটের ক্ষেত।

ডাকাতের দল যখন পাটুলি গ্রামে গিয়ে পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়েছে। গ্রাম একেবারে নির্জন। গাছপালার ছায়ায় অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল তারা। বাড়িটা এত নির্জন কেন? কোন লোকজন আছে বলে তো মনে হয় না। কোন ঘরেই আলো নেই। মনে হয় ঘরগুলি বন্ধ।

বাড়ি ভুল হয়নি তো? কিন্তু না, বাড়ির যে নিশানা তারা নিয়ে এসেছে তাতে ভুল হবার কথা নয়। বিবরণের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল একটি লণ্ঠন নিয়ে বাইরের দিক থেকে একজন লোক আসছে। লোকটি বৃদ্ধ। বাড়ির উঠোনে এতগুলি লোক দেখে সে ভয় পেয়ে গেল।

কালু সর্দার তাকে জিজ্ঞেস করল—এটা কি বিশ্বরূপ দাসের বাড়ি?

বৃদ্ধ ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাড়িতে লোকজন নেই কেন ? তারা কোথায় ?

—বিশ্বরূপের ছেলেদের কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—তারা তো সন্ধ্যার আগেই সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। শহরে যাবে তো। রাত দশটায় গাড়ি। সেই গাড়ি ফেল করলে সারারাত ইস্টিশনে থাকতে হবে। রাস্তাঘাট তো ভাল নয়, তাই আগে থাকতেই রওনা হয়ে গেছে। সঙ্গে বিধবা মা আছে, জিনিসপত্র আছে, আগে না গেলে চলবে কি করে ?

কথা শুনে ডাকাতরা ভাবতে লাগল, হায় রে, এতদূর হেঁটে আসার সব পরিশ্রমই বৃথা হল।

কালু সর্দার জিজ্ঞেস করল—তুমি কে ?

বৃদ্ধ জবাব দিল—আমি এই গাঁয়েই থাকি। বাড়িটা দেখাশোনা করার জন্য আমাকে বলে গেছে।

কালু সর্দার বলল—ঘরগুলি খোল, দেখবো কোন জিনিসপত্র আছে কিনা।

ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধ ঘরগুলি খুলে দিল। কিন্তু কোন ঘরেই লুট করার মত কোন জিনিস পাওয়া গেল না। বড় বড় কাঠের সিন্ধুক ও মাটির জালায় ঘর ভরতি। সিন্দুকগুলি খুলে দেখা গেল তার মধ্যে নানারকম কাঠের সরঞ্জাম ও লোহার হাতা খুন্তি। সিন্দুকের পেছনেই রয়েছে বড় বড় লোহার কড়া।

কালু সর্দার জিজ্ঞেস করল—এগুলি কি ?

বৃদ্ধ জবাব দিল—অনেককাল আগে বিশ্বরূপের গুড় তৈরির আড়ৎ ছিল, এ সব তারই সাজ-সরঞ্জাম।

কেউ কেউ বলল—ঐ কড়া-ই কয়েকটা নিয়ে যাই সর্দার, কি বলো ?

সর্দার ধমক দিয়ে বলল—ধ্যাৎ, ওসব নিয়ে কি শেষে ফ্যাসাদে পড়বি ?

বড় বড় মাটির জালার মুখ খুলে দেখা হল। ওর ভেতরে রয়েছে ধান। ডাকাতি করে নিয়ে যাবার মত জিনিস ওসব নয়। অন্য কোন ঘরেও দামী কোন জিনিস পাওয়া গেল না। ডাকাতরা রাগে মাটির জালাগুলো ভেঙ্গে, ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে দিতে লাগল।

ডাকাতরা আক্ষেপ করে বলতে লাগল—একদিন আগে এলেও ধরতে পারতাম। ইস্, কি দাঁওটাই ফস্কে গেল!

বৃদ্ধ বুঝতে পারল বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। এদের হাত থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই বলল—আপনারা এখানে যত সময় নষ্ট করছেন ততক্ষণে নলহাটা ইস্টিশনে চলে গিয়ে ওদের ধরতে পারতেন।

নলহাটা ইস্টিশন!

কথাটা কালু সর্দারের মনে ধরল। সত্যি তো, রাত দশটা বাজতে এখনো অনেক বাকি। এতক্ষণে স্টেশনে গিয়ে ওদের ধরা যেতো। ছোট্ট স্টেশন, লোকজনও কম, ওখান থেকে জিনিসপত্র ডাকাতি করে নিয়ে আসতে খুব অসুবিধা হতো না।

কালু সর্দার বলল—ঠিক বলেছ, তাই করব।

সেখানে দেরি করা আর তারা সঙ্গত মনে করল না। সঙ্গে সঙ্গে সকলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এত যে কাণ্ড হয়ে গেল গ্রামের কেউ জানতেও পারল না। ডাকাতের দল চলল নলহাটা রেল স্টেশনের দিকে। ছুটতে ছুটতেই তারা চলল, যাতে রাত দশটার আগে ওখানে গিয়ে পৌঁছান যায়। যদি বিশ্বরূপ দাসের ছেলেদের ধরতে পারে তবে অনেক কিছু লাভ তাদের হবে। হয়ত এটা হবে তাদের ডাকাতিতে সব চেয়ে সেরা পাওনা।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সময় মত তারা স্টেশনে পৌঁছতে পারল না। হন্তদন্ত হয়ে তারা যখন নলহাটাতে গিয়ে পৌঁছল তখন শুনতে পেল মাত্র তিন মিনিট আগে ট্রেনটা ছেড়ে গেছে।

তখনও দূরে দেখা যাচ্ছে গাড়ীর পেছনে দিকের লাল বাতি।

ওদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ইস্, এত কষ্ট, এত পরিশ্রম সব বৃথা হল! এখন আরও অনেক কষ্ট করে নিজেদের আস্তানায় ফিরতে হবে। রাতও হয়ে গিয়েছে অনেক। প্রায় চার ক্রোশ পথ হাঁটতে হবে তাদের। না হেঁটেই বা আর এখন কি উপায় আছে?

ছুটে ছুটে সবাই ক্লান্ত!

কেউ কেউ বলল—এখানে একটু জিরিয়ে নিই সর্দার। বড্ড খাটুনি হয়েছে।

কালু সর্দার বলল—বিশ্রাম করে লাভটা হবে কি? ওদিকে ফিরতে যে রাত হয়ে যাবে অনেক। এখনই চল্। চাঁদ ওঠার আগেই এই এলাকাটা পেরিয়ে যাই। নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

দলের একজন বলল—ঠিক এক বছর আগে এই দিনেই আমাদের রতন খুন হয়েছিল সর্দার। আজকের দিনটা আমাদের খুব খারাপ। বের হওয়া ঠিক হয়নি।

সর্দারের মনে পড়ল, হ্যাঁ ঠিক এমন একটি রাতেই এক বছর আগে বদরগঞ্জে ডাকাতি করতে গিয়ে তার ছেলে রতন ধরা পড়েছিল। আজ ঠিক সেই দিন। আজ কি কপালে আছে কে জানে? কাজেই আর দেরি করা সঙ্গত নয়।

বিশ্রামের চিন্তা মন থেকে উঠে গেল। তাড়াতাড়ি ছুটতে শুরু করল ডাকাতের দল।

কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হল। শুরু হল প্রবল ধারায় ঝড়-বৃষ্টি।

তখন তারা একটি নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একদিকে নদী অন্যদিকে ফাঁকা জমি। আশ্রয় নেবার মত কোন জায়গা নেই। হতবুদ্ধি হয়ে তারা ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক ওদিক।

হঠাৎ শুনতে পেল নদীর বুক থেকে ভেসে আসছে করুণ

আর্তনাদ। নদীর বুকে উত্তাল ঢেউ; তার মাঝেই তাকিয়ে দেখল একটি নৌকা জলে ডুবে যাচ্ছে। মাঝি প্রাণপণ চেষ্টা করছে নৌকাটিকে পাড়ের দিকে আনবার জন্য। কিন্তু পারছে না। প্রবল স্রোত তখন নদীতে।

আর একটু এগিয়ে এলেই নৌকাটি পাড়ে এসে ভিড়তে পারত। কিন্তু তা পারল না। উল্‌টে গেল নৌকাটি। নৌকায় যারা ছিল তারা ছিটকে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

কালু সর্দার ছিল সবার আগে। সে দেখতে পেল একটি ফুটফুটে ছেলে জলে ভেসে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ছুটে লাফ দিয়ে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর একটু হলেই ছেলেটি ডুবে যেত। কালু খপ করে তাকে ধরে ফেলল। বুকে জাপটে ধরে এগিয়ে আসতে লাগল পাড়ের দিকে। তবু অত সহজেই কি আনা যায়? স্রোতের টান তাকে টেনে নিয়ে চলল দূরের দিকে।

—সর্দার ভেসে গেল রে—সর্দার ভেসে গেল—বলে চীৎকার করে উঠল ডাকাত দলের লোকেরা।

কয়েকজন ডাকাত লাফিয়ে পড়ল জলে। তাদের চোখের সুমুখ দিয়ে নৌকার কয়েকজন আরোহীও ভেসে যাচ্ছিল—সেদিকে লক্ষ্য করল না তারা।

অনেক কষ্টে তারা সর্দারকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। সেই সঙ্গে উদ্ধার করল ছেলেটিকেও।

ফুটফুটে ছোট্ট ছেলে।

মরে গেছে কি? না, জলে ডুবে নির্জীব হয়ে পড়েছে?

সর্দার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখল নিশ্বাস বইছে—বেঁচে আছে ছেলেটি।

ঝড়-বৃষ্টির ঝাপটা বাঁচিয়ে অনেক যত্ন করে ছেলেটিকে নিয়ে আসা হল আড্ডায়। লাখীর জঙ্গলে।

ডাকাতি করে এসে ওরা লাখীর জঙ্গলেই রাত কাটায়। শেষ রাতে সকলে বাড়ি ফেরে। এই হল ওদের নিয়ম। কাজেই আজ রাতটাও লাখীর জঙ্গলেই কাটাতে হবে।

তখনও ছেলেটির আচ্ছন্নভাব কাটেনি। ঝিমিয়ে পড়েছে যেন।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে তখন।

সর্দার বলল—যা, গাঁয়ে গিয়ে কারুর বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে আয়। দুধ না হলে আজ রাতটা ওর কাটবে কেমন করে?

কেউ কেউ বলল—এত রাতে দুধ কোথায় পাওয়া যাবে সর্দার?

সত্যই তো! রাত যে এখন অনেক।

আগুন জ্বালিয়ে সেঁক দিয়ে ছেলেটির হাত পা গরম করা হতে লাগল। তখন মনে হল ছেলেটি যেন একটু চাঙা হয়ে উঠছে। তাই দেখে নানা কথা বলাবলি করতে লাগল ডাকাতরা।

কেউ বলল—আজ ডাকাতি করে টাকা পয়সা কিছু না পাওয়া গেলেও একটা ভাল জিনিস লাভ হয়েছে, কি বলিস?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। খাসা বলির জিনিস পাওয়া গেছে।

—কি খাসা ছেলেটি। নিখুঁত। এমন নিখুঁত বলি পেলে মা বিশালাক্ষী খুব খুসি হবে।

—এবার তা'হলে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ডাকাতি করতে বের হওয়া যাবে, কি বলিস?

—হ্যাঁ, এবার দাঁও মিলবে ভালো।

কালু সর্দারের কানে এসব কথা গিয়ে পৌঁছল—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না তাতে। কিভাবে ছেলেটিকে সুস্থ করে তুলবে সে কথাই ভাবতে লাগল শুধু।

আবার হুকুম দিল সর্দার—যেখান থেকে পারিস দুধ নিয়ে আয় একটু।

তখন কয়েকজন ছুটল গাঁয়ের দিকে সেই নিশুত অন্ধকার রাতে। এত রাতে কাকেই বা ডাকবে? নিজেরাই একটি গোয়াল ঘরের

ভিতর গিয়ে ঢুকল। একটি হৃষ্টপুষ্ট গরু দেখে তার দুধ দুইয়ে নিয়ে এল।

গরুর দুধ খেয়ে সত্যি আরও চাঙা হয়ে উঠল ছেলেটি। সুস্থ হতেই বাবা মাকে সে খুঁজতে লাগল।

—বাবা কোতায়—বাবা ? মা কোতায়—মা ? আধ-আধ ভাষায় কাঁদতে লাগল ছেলেটি।

কালু সর্দারের কেমন যেন মায়া পড়ে গেল ছেলেটির ওপর। সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—কেঁদো না, তোমার মা আছে—বাবা আছে—সবাই আছে।

—কোতায় ?

—আসবে, কাল সকালেই এসে পড়বে। বেড়াতে গেছে তারা।

—ওঃ! আমাল মাছিল বালিতে বেলাতে গেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ। তোমার মাসীর বাড়িতে বেড়াতে গেছে।

—আমাকে নিয়ে গেল না কেন ?

—তুমি নৌকায় চড়তে ভয় পাও, তাই তোমাকে রেখে গেছে।

—না, না, আমি বয় পাই না তো। আমি তো ঘুমিয়ে পলেছিলাম।

—বেশ, আবার নৌকায় চড়বে তুমি।

ধীরে ধীরে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল খোকার। কিছুক্ষণ পরেই আবার চমকে জেগে উঠল। খুঁজতে লাগল তার মা বাবাকে। সর্দার জিজ্ঞেস করল—তোমার নাম কি খোকা ?

—বাবলু।

—বাবলু ? বাঃ বেশ নাম তো!



পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু বাবলু অন্য মানুষ। বনের গাছপালা, পাখি আর ঠাকুর মন্দির দেখে সে নিজের বাড়ির কথা

ভুলেই গেল বুঝি। ঘুর ঘুর করে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এ যেন তার কাছে এক নূতন জগৎ।

ছেলেটাকে আর কোথায় রেখে যাবে এই জঙ্গলে? এতটুকু ছেলে থাকবেই বা কার কাছে? কোলে তুলে নিয়ে কালু সর্দার বাবলুকে নিয়ে চলল নিজের বাড়িতে।

সর্দারের বউ কমলমণি ছেলেটিকে দেখেই লুফে নিয়ে নিজের কোলে তুলল।

—বাঃ বাঃ, কি ফুটফুটে ছেলে গো। কোথায় পেলে এই ছেলেকে? জিজ্ঞেস করল সর্দারের বউ।

—ডাকাতি করে এনেছি। হেসে জবাব দিল সর্দার।

—ছিঃ ছিঃ! এমন ডাকাতি করতে আছে? কার কোল খালি করে এমন রতন নিয়ে এলে গা?

রতন! বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল সর্দারের। তার ছেলের নাম তো রতনই ছিল।

কেঁপে উঠল কমলমণির বুকও। বাবলুকে সে সজোরে বুকে চেপে ধরল।

বাবলুও হতভম্ব।

এত আদরের বহর দেখে সে জিজ্ঞেস করল—তুমি আমাল কে হও গো?

কমলমণি বলল—আমি তোমার মাসী হই—মাসী—

বাবলু বলল—আমাল মাছি তো তোমার চেয়ে অনেক ফলচা। তোমাকে তো দেখিনি কোনদিন।

—আমি যে তোমার ছোট মাসী হই। আমাকে তুমি কি করে দেখবে?

—ওঃ, বুঝতে পেলেছি। তুমি ছোট মাছি বুঝি? তোমাদের বালি আমি যাইনি তো।

—যাক্, এবার তো এলে। কেমন লাগছে তোমার কাছে এ বাড়িটা ?

—খুব ভালো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে বাবলু জিজ্ঞেস করল—তোমাদের ক'তা আমগাছ আছে ?

কমলমণি জবাব দিল—দশটা।

খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাবলুর চোখ। বলল—বাব্বা ! এতো ? আমাল বলো মাছির বালিতে আছে তিনতে।

কমলমণি জিজ্ঞেস করল—আর তোমাদের বাড়িতে ক'টা আম গাছ আছে ?

—আমাদের বালিতে একতাও নেই।

—তোমরা কি শহরে থাকো ?

সে কথার জবাব দিতে পারল না বাবলু। শহর আর গ্রামের তফাৎ সে তো বোঝে না।

কমলমণি জিজ্ঞেস করল—তোমাদের বাড়িতে তা'হলে কি আছে ?

বাবলু বলল—আমাদের বালিতে বলো বলো ইটেল ঘর আছে। গেট আছে। পাহালাদাল আছে।

কমলমণি বুঝতে পারল বাবলু নিশ্চয় বড় লোকের ছেলে। আর চেহারা দেখলেও তো তা বেশ বোঝা যায়।

বাবলু জিজ্ঞেস করল—কাঁথাল গাছ ক'তা আছে তোমাদেল ?

—কাঁঠাল গাছ ! সাতটা।

—বাব্বা ! তোমাদেল খুব মজা ! পেয়ালা গাছ আছে ?

—পেয়ারা গাছ ? হ্যাঁ আছে।

—ক'তা ?

—তিনটে।

—তা হলে তো আলো মজা। তোমলা খুব পেয়ালা খেতে পালো।

—তুমি বুঝি খুব পেয়ারা ভালোবাসো ?

—হ্যাঁ। পেয়ালা ভালবাসি, আম ভালবাসি, জামলুল আলো বেশী ভালবাসি।

—একটা জামরুল গাছও আছে আমাদের। খাবে জামরুল? ঘরে তোলা আছে!

কমলমণি ঘর থেকে হাতের আঁজলা ভরে কতগুলো জামরুল নিয়ে এল। বাবলু তা দেখে কি খুশি!

জামরুল খেতে খেতে বাবলু বলল—তুমি খুব ভালো, আমাল মাছিল মতন।

কমলমণি বলল—আমি তোমার মাসিই তো। তুমি থাকবে আমার কাছে?

বাবলু বলল—হ্যাঁ, থাকবো।

—তোমার বাবা মার কাছে যেতে পারবে না কিন্তু।

—পলে যাবো।

—না পরেও না। কখনো যেতে পারবে না।

—মা যে কাঁদবে আমার জন্য। মা আমাকে খুব ভালবাসে।

—আমিও তোমাকে খুব ভালবাসবো।

বাবলু একমনে জামরুল খেতে লাগল। আর চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নতুন জায়গাটা দেখতে লাগল। কোন কথা বলল না।

লাথীর জঙ্গলে সেদিন রাতের বেলা আড্ডা জমে উঠল।

অনেক কথা হল বাবলুকে নিয়ে।

কেউ বলল—শীগগিরই একদিন মা কালীর পুজো দিয়ে তার সামনে বলি দেওয়া হোক ছেলেটিকে। মা খুব খুশি হবে। ডাকাতি করে ভাল দাঁও মিলবে।

কেউ বলল—আহা, এই দুধের বাচ্চাকে বলি দেওয়া হবে!

কেউ বলল—কেন, তাতে কি হয়েছে? এমন নিখুঁত বলির জিনিস কি পাওয়া যাবে আর?

কালু সর্দার শুধু শুনেই গেল। কোন কথা বলল না। মনে মনে ভাবতে লাগল অনেক কিছু!

পরদিন কথায় কথায় বউয়ের কাছে বলে ফেলল কালু সর্দার— শুনেছ বউ, বাবলুকে বলি দেওয়া হবে মা বিশালাক্ষীর কাছে।

সর্দারের বউ শিউরে উঠল। ছিঃ ছিঃ, কি অলক্ষুণে কথা! এসব কথা কি বলতে আছে? ষাট্, বালাই ষাট্! বাবলুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল কমলমণি।

সর্দার হতভম্ব!

কমলমণি বলল— তোমরা কি পাষাণ গো। এই দুধের ছেলেটাকে বলি দেবে?

—কি করবো বউ, দলের সবার যে তাই ইচ্ছে। কালু সর্দার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল!

—রেখে দাও তোমাদের ইচ্ছে। তোমাদের মনে কি মায়া দয়া বলে কিচ্ছু নেই? ওকে আমি দেব না।

—কি করবে?

—ও আমার কাছে থাকবে। আমি ওকে ছেলের মত মানুষ করবো।

—ডাকাতের আবার ছেলে মানুষ করা? বড় হয়ে তো ডাকাতই হবে। আবার কাটা পড়বে ডাকাতি করতে গিয়ে।

বলতে বলতে নীরব কান্নায় কালুর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

সন্তানহারা জননীর বুকে সন্তান তুলে দিয়েছে সে। কেমন করে আবার তাকে ছিনিয়ে নেবে?

রতন যে ফিরে এসেছে তার মায়ের বুকে। মা ফিরে পেয়েছে তার হারানো ছেলেকে।

নিজেকে কোন রকমে সংযত করল কালু সর্দার। ডাকাতের সর্দার সে। তাকে হতে হবে নিষ্ঠুর—কঠিন।

কিন্তু বাবলুকে দেখে এত দয়ামায়া কেন তার মনে উথলে উঠল ?

কেন ?

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল।

দুর্দান্ত খরা। ফসল ভাল হয়নি। অভাবের আর্তনাদ শুরু হল চারদিকে।

অস্থির হয়ে উঠল দলের লোকেরা।

এবার ডাকাতি করবার জন্য বের হতে হবে তো! তা না হলে তাদের দিন চলবে কেমন করে।

কিন্তু তার আগে বিশালাক্ষীর পূজা দিতে হবে—দিতে হবে নরবলি। সেই পূজার বলি কই ?

কয়েকদিন ঘুরেও কেউ বলির জন্য একটা মানুষ জোগাড় করতে পারল না।

তখন তারা পরামর্শ করতে বসল নিজেদের মধ্যে। একজন বলল—কেন আমরা ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছি ? সর্দারের বাড়িতেই তো বলির মানুষ রয়েছে।

কয়েকজন তখন চীৎকার করে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। ভাল কথা মনে করে দিয়েছিস।

কেউ কেউ বলল—সর্দারের কাছে বলা হোক্। চেয়ে নেওয়া হোক সেই কচি ছেলেটাকে।

—তাই হোক্। তাই হোক্। সায় দিল সবাই।

একটু পরে সর্দার এসে হাজির হল সেই আড্ডায়। তাকে সবাই তখন ঘিরে ধরল।

—সর্দার, তোমার ওই ছেলেটাকে দাও। বলি দেব মা কালীর সামনে।

—বলি !

—হ্যাঁ।

সে কথা শুনে কেঁপে উঠল সর্দারের বুক। কোন জবাব না দিয়ে সবার মুখের দিকে তাকাল।

—দাও সর্দার, দাও। নইলে আমাদের চলবে কেমন করে? সবাই কি না খেয়ে শুকিয়ে মরবো?

সর্দার নিরুত্তর।

চারদিকে তার অশান্ত আবহাওয়া—বিক্ষুব্ধ তার দলের লোকেরা। সবাই যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে তার ওপর।

সর্দারির পদ টলমল!

কালু সর্দার কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—বেশ, করো পূজার আয়োজন।

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল সবাই—তাহলে এনে দেবে সেই ছেলেকে?

—হ্যাঁ দেবো।

আনন্দে কলরব করে উঠল দলের লোকেরা—বাঃ বাঃ, এই তো চাই। এবার ধূমধাম করে মা কালীর পূজা করব। এমন খাসা বলি দেওয়া হবে এবার। মা খুসি হবে নিশ্চয়ই।



চঞ্চল মুখর হয়ে উঠল লাখীর জঙ্গল।

ধূমধাম করে পূজার আয়োজন করা হল। বেজে উঠল ঢাক ঢোল নাকাড়া।

তান্ত্রিক পুরোহিত বসলেন পূজায়। আদেশ দিলেন—বলির জোগাড় করো।

কালু তখনও স্থির হয়ে বসে আছে।

চঞ্চল হয়ে উঠল দলের লোকেরা। সর্দারকে বলল—কোথায় সর্দার, বলির শিশু কোথায়? নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।

সর্দার বিশালাক্ষীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অধৈর্য হয়ে উঠল সবাই।—একি সর্দার? বসে আছো কেন? তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে নিয়ে এসো। লগ্ন যে বয়ে যায়।

চমকে উঠল সর্দার। সত্যই যে লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

মাথা নিচু করে সর্দার উঠে দাঁড়াল। কি করবে সে এখন? বলি না হলেও অমঙ্গল। কি বিপদ আবার ঘটবে কে জানে!

হঠাৎ সর্দারের মাথায় একটা বুদ্ধি জেগে উঠল। আশপাশের পথঘাট বা গাঁ থেকে কি একটা যেমন তেমন মানুষও জোগাড় করে নিয়ে আসা যাবে না?

সর্দার নিজেই বেরিয়ে পড়ল। যেখান থেকে হোক, যে ভাবেই হোক—বলির জন্য মানুষ জোগাড় করে আনবে। জোগাড় করে আনবে পূজা শেষ হবার আগেই।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

বলির মানুষ পাওয়া গেল না। পাগলের মত ঘুরতে লাগল সর্দার।

ওদিকে পূজাও প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

পুরোহিত চীৎকার করে বলছে—কোথায় বলির মানুষ? তাকে চান করাও—সিঁদুর মাখাও।

ডাকাত দলের সবাই চঞ্চল হয়ে উঠছে। তাকিয়ে আছে সর্দারের পথের দিকে।

কৈ, সর্দার তো এখনো ফিরছে না।

কোথায় সর্দার?

পুরোহিতের চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল। রেগে গিয়ে বলল—বলি ছাড়াই পুজো শেষ করছি এবার।

শিউরে উঠল ডাকাত দলের লোকেরা।

সর্বনাশ !

এমন সময় দেখা গেল কালু সর্দার ফিরে আসছে। কোলে তার বলির শিশু।

ঘুমন্ত বাবলুকে তুলে নিয়ে এসেছে সর্দার।

আনন্দে সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল।

স্নান করিয়ে গায়ে তেল মাখানো হল বাবলুকে। কপালে দেওয়া হল সিঁদুরের ফোঁটা।

বাবলু হতভম্ব ! ভয়ে সে কান্নাও ভুলে গেছে।

হাড়িকাঠের সামনে তাকে নিয়ে আসা হল।

পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন। বিরাট খড়গখানিতে সিঁদুর ও রক্তচন্দন লেপে দেওয়া হল। মন্ত্রপূত করে বাবলুকে হাত বেঁধে শুইয়ে দেওয়া হল হাড়িকাঠের ওপর।

ঢাক ঢোল নাকাড়া দ্বিগুণ শব্দে বেজে উঠল। ধূপের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল চারদিক। পুরোহিত দু'হাতে খড়গখানি তুলে ধরলেন। ডাকাত দলের লোকেরা চীৎকার করে উঠল—জয় মা বিশালাক্ষীর জয় !

এমন সময় দেখা গেল পাগলিনীর মত একটি স্ত্রীলোক ছুটে আসছে। মুখে তার করুণ কান্নার শব্দ—আমার বাবলু কোথায় গেলি রে ! বাবলু—

মুহূর্তের মধ্যে হাড়িকাঠের ওপর শোয়ানো ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে বলে উঠল—মা বিশালাক্ষী, আমার ছেলেকে ভিক্ষা দে। তার বদলে আমার রক্ত নে।

পুরোহিত চেঁচিয়ে বললেন—সরে যাও, সরে যাও এখান থেকে।

স্ত্রীলোকটি নড়ল না। কেঁদে কেঁদে বলল—আমার রক্ত নাও—আমাকে বলি দাও—

পুরোহিতের খড়গ মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল দলের লোকেরা।

চমকে উঠল কালু সর্দার!

হাড়িকাঠের ওপর শোয়ানো বাবলুকে জড়িয়ে ধরে আছে তারই স্ত্রী কমলমণি।

কাঁদতে কাঁদতে কমলমণি বলল—ওগো, আমার বুক থেকে কেন বাছাকে নিয়ে এলে গো? ওকে ছেড়ে দাও। আমার রক্ত নাও তোমরা।

মুহূর্তের মধ্যে যেন কালু সর্দার অন্য মানুষ হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে হেঁকে বলল—বলি বন্ধ করো না—চালাও খড়্গ।

কিন্তু পুরোহিতের হাত আর চলল না। ধীরে ধীরে খড়্গটি নামিয়ে সেখান থেকে সে চলে গেল।

কমলমণিও বাবলুকে কোলে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। মাঠের অন্ধকারে মুহূর্তেই মিশে গেল সে।

সর্দার দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত। ডাকাত দলের লোকেরাও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

একি অঘটন!

পূজায় এবার অনিয়ম ঘটল। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ডাকাতদের বুক। যারা মৃত্যুকে ভয় পায় না তারাও নানা অশুভ কল্পনায় কাতর হয়ে পড়ল।

জাগ্রত বিশালাক্ষী। রক্ত লোলুপা ভয়ঙ্করী। তাকে খুশি করা হয়নি। এবার কি হবে কে জানে?



দুই

কেটে গেল এক দুই তিন—এমনি করে পাঁচটি দিন।

কিন্তু আর বসে থাকলে চলে না। ডাকাতি করতে বের হতেই হবে। নইলে তাদের চলবে কেমন করে?

পূজা হয়ে গেলে বসে থাকতেও চায় না দলের লোকেরা। তাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সর্দারকে তারা উত্যক্ত করে তোলে।

—চলো সর্দার—কপালে যা আছে তাই ঘটবে। মা বিশালাক্ষীর সন্তান আমরা। মা কি আমাদের দুঃখ বুঝবে না?

কালু সর্দার বেরিয়ে পড়ল দলবল নিয়ে।

—মা বিশালাক্ষী, তুমি জানো। অপরাধ নিও না মা।

দেবীর পায়ে প্রণাম জানিয়ে একটু সকাল সকালই সেদিন সকলে বেরিয়ে পড়ল। আজ যাবে তারা অনেক দূরে—কমলপুরে।

খেয়া নৌকো পার হয়ে যেতে হবে। পার হয়ে ফিরে আসতে হবে আবার। ঝামেলা অনেক।

চরণ বাগ্‌দি আগেই নৌকা ঠিক করে এসেছে। অনেক কিছু লোভ দেখিয়ে নৌকা ভিড়িয়ে রেখে এসেছে মোহনপুরের ঘাটে। মাঝি অন্য কোন সওয়ারী নেবে না। দু'টাকা আগামও দিয়ে এসেছে।

মাঝি চেনে ডাকাত দলের লোকদের। ভয়েই রাজী হয়েছে সে। রাজী না হলেও যে বিপদ আছে।

নদী পেরিয়ে ধূ-ধূ মাঠ ও বুনো পথ। তারপর কমলপুর। নিরাপদেই ডাকাত দল সেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছল।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে দাঁড়াল এক বাড়ির সামনে।

গাঁয়ের জোতদারের বাড়ি। বিরাট বড়লোক। গ্রামখানার আর্ধেকটা জুড়েই যেন বাড়িটা।

সারা গ্রাম ঘুমিয়ে আছে রাতের নিঝুম অন্ধকারে।

হা রে—রে-রে···হা রে—রে-রে···

মশাল জ্বালিয়ে কালু সর্দারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল বাড়িটার ওপর।

সেই মশালের আলোয় জায়গাটা যেন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। ভয়, বিভীষিকা···কান্না, ছুটোছুটি ও আর্ত চীৎকারে ভরে গেল গোটা বাড়িটা।

বাড়ির মালিক জগদীশ রায় তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। লোক-জনের চীৎকারে হঠাৎ জেগে উঠলেন। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি, তারপর যখন বুঝতে পারলেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে তখন বন্দুকটা বের করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

বন্দুক রয়েছে কাঠের তৈরী লম্বা কুলুঙ্গিতে। চাবি দিয়ে তার মুখ আটকানো। সেটা খুলে তবে বের করতে হবে বন্দুক।

কিন্তু কি মুস্কিল!

লোহার সিন্দুকের চাবি আছে, কিন্তু কাঠের কুলুঙ্গির চাবিটা নেই।

বন্দুকের চাবি গেল কোথায়? কে সরিয়েছে আমার চাবি? পাগলের মত জোরে চীৎকার করে বলতে লাগলেন জগদীশবাবু। আমার বন্দুকের—

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ডাকাতরা সেই ঘরে ঢুকে পড়ল।

বাধা দিতে গেলেন জগদীশবাবু—কিন্তু পারলেন না। ডাকাতরা তাঁকে ধরে ফেলল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হল দু'পক্ষে। দুর্দান্ত

ডাকাতদের সঙ্গে কি পারা যায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন ডাকাত মিলে জগদীশবাবুকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

—সিন্দুকের চাবি কোথায়? জিজ্ঞেস করল ডাকাতরা।

—জানি না। জবাব দিলেন জগদীশবাবু।

—শীগ্‌গির বল। নইলে এখনই খুন করে ফেলব। একজন ডাকাত ঝকঝকে একটি রামদা তুলে ধরল।

মৃত্যুদূত যেন মাথার ওপর।

জগদীশবাবু ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন—চাবি—ঐ যে—

চাবি পেয়ে সিন্দুক খুলে ফেলল ডাকাতরা।

সিন্দুকের ভেতর শুধু টাকা পয়সাই নয়; রয়েছে অনেক সোনা ও রূপার অলঙ্কার।

ঝকঝকে! চকচকে!

মশালের আলোকে সেগুলো আরও ঝকঝক করে উঠল—চকচক করে উঠল। আনন্দে কোলাহল করে উঠল ডাকাতের দল।

হা রে-রে-রে-রে···!

পরমানন্দে লুঠ করতে লাগল তারা সোনা ও রূপার গয়না। তারপর হাত দিল টাকা পয়সায়।

থাকে থাকে রূপোর টাকা সাজানো। সেগুলো তুলতে গিয়েও ডাকাতদের মনে কি উল্লাস। মুঠো করে তুলতে গিয়ে কিছু হাতে ওঠে আর কিছু মাটিতে পড়ে যায়। শব্দ হয় ঝন-ঝনাৎ—ঝন-ঝনাৎ—

জগদীশবাবুর বুকের পাঁজরে যেন সেই শব্দ গিয়ে আঘাত করে—ঠন্-ঠনাৎ—ঠন্-ঠনাৎ—

হাত পা তাঁর বাঁধা। এর মধ্যে দু'জন ডাকাত একটা কাপড় দিয়ে তাঁর মুখটাও বেঁধে দিয়েছে। এখন তিনি নিরুপায়—কোন কিছু করবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। অসহায় ভাবে তিনি কাঠের কুলুঙ্গিটার দিকে তাকাতে লাগলেন। ডাকাতরা ঘরে ঢুকবার আগে

যদি তিনি কোনরকমে বন্দুকটা বের করতে পারতেন তা হলে তাঁর এমন অবস্থা হত না। ধনসম্পত্তিও লুঠ হত না এমনভাবে।

হঠাৎ জগদীশবাবুর মনে পড়ল তাঁর বড় ছেলে মহীতোষের কথা। মহীতোষ এখন কোথায়? তার ঘরে কি ডাকাতরা ঢুকেছে? কোন বিপদ হয় নি তো তার?

ধনসম্পত্তির চেয়ে ছেলের চিন্তাতেই তিনি কাতর হয়ে পড়লেন বেশি।

এদিকে ডাকাতরা সোনা রূপার গয়না ও টাকা পয়সা পোঁটলা বেঁধে ফেলেছে। কয়েকজন ডাকাতের নজর পড়ল হঠাৎ কাঠের কুলুঙ্গিটার দিকে। চেঁচিয়ে বলে উঠল—ওরে, এটা তো খোলা হল না। খোল্—ভাখ্ এটাতে কি আছে।

শিউরে উঠলেন জগদীশবাবু।

এমন সময় হঠাৎ বাইরে বাঁশির শব্দ হল। ডাকাতরা ব্যস্ত হয়ে উঠল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য।

বাঁশির শব্দ শুনলে তারা আর দেরি করে না। সময় বুঝেই দলপতি বাঁশির শব্দ করে। ওটাই হল তাদের পালিয়ে যাবার সংকেত। দেরি করলেই বিপদ।

কাঠের কুলুঙ্গিটা ভেঙ্গে দেখবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল কয়েকজন ডাকাত! এমন সময় সাড়া পড়ে গেল—ওরে চল্ চল্, বাঁশি পড়েছে।

তাড়াহুড়া করে ঘর ছেড়ে চলে গেল সবাই।

জগদীশবাবু অসহায়ের মত ঘরের মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে লাগলেন।



ডাকাতদল বেরিয়ে এসে জড়ো হল বাড়ির সামনে। অনেক জিনিসপত্র আজ তাদের লাভ হয়েছে—এখন এগুলি নিয়ে তাড়াতাড়ি

পালাতে পারলেই বাঁচোয়া।

পালাবার জন্যই তৈরি হল তারা। কিন্তু একি! কোলাহল কিসের! শব্দটা যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। গাঁয়ের লোকেরা কি তা'হলে এগিয়ে আসছে ডাকাতদের বাধা দিতে? সেই আশঙ্কা করেই কি সর্দার বাঁশি বাজিয়েছে?

—পালাও—শীগগির পালাও—সর্দার হুকুম দিল।

পালাবার জন্য ছুটাছুটি করতে লাগল দলের লোকেরা।

কিন্তু পালাবার মুখেই ঘটল বিপদ।

মশাল হাতে এগিয়ে এসেছে গাঁয়ের লোকেরা। তাদের প্রায় মুখোমুখি এসে পড়েছে।

তাই দেখে ডাকাতরা তাদের নিজেদের হাতের মশালগুলো নিভিয়ে ফেলল। পালিয়ে যেতে হবে অন্ধকারে। অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।

কিন্তু যারা এগিয়ে আসছে তাদের হাতেও রয়েছে মশাল। সেই মশালের আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ডাকাতের দলকে।

মহা মুস্কিল!

—ফেরো ডান দিকে—হুকুম দিল সর্দার।

ডাকাতের দল ডান দিকে ফিরল। পালাতে গেল সেদিক দিয়ে। কিন্তু পারল না। আর এক দল গাঁয়ের লোক সেদিক দিয়েও এগিয়ে আসছে। তাদের হাতেও মশাল।

ডাকাত দলের বুক কেঁপে উঠল।

জোট বেঁধে এগিয়ে এসেছে গ্রামবাসীরা। তাদের হাতে লাঠি আর বল্লম।

কোন্ দিক দিয়ে পালাবে? পালাতে গেলেই তাদের সামনে পড়তে হবে। সব দিকেই বাধা। লড়াই ছাড়া উপায় নেই। লড়াই করে এগিয়ে যেতে হবে ডাকাতদের।

কিন্তু ভয় আরও আছে। অপর পক্ষের হাতে রয়েছে মশাল।

মশালের আলোকে কেউ যদি ডাকাতদলের কাউকে চিনতে পারে তা'হলেই বিপদ। যদিও ডাকাতরা মাথায় কাপড় বেঁধে নেয়, কেউ মুখে মাখে রং আর কালি, তবু বিশ্বাস নেই।

পালাতে গিয়ে ডাকাতরা গ্রামবাসীদের সামনে পড়ে গেল। দু'দলে শুরু হল লড়াই—ভীষণ লড়াই। ডাকাতদের প্রধান লক্ষ্য অপর পক্ষের মশালগুলো নেভানো। মশাল নেভালেই তাদের পালিয়ে যেতে সুবিধা হবে।

ডান দিকে তিনজন গ্রামবাসীর হাতে রয়েছে তিনটি মশাল। ডাকাত দলের তিনজন—মাধব, গদাই আর চরণ এগিয়ে গেল সেগুলো নেভাতে।

প্রথম দু'জন অতি সহজেই দুটো মশাল নিভিয়ে ফেলল। আচমকা লাঠির ঘায়ে মশাল দুটো ফেলে দিল মাটিতে। তারপর লাঠি পিটিয়ে আর পা দিয়ে মাড়িয়ে সেগুলো নেভাতে খুব দেরি হল না। কিন্তু অন্য মশালটা নেভাতে গিয়েই চরণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

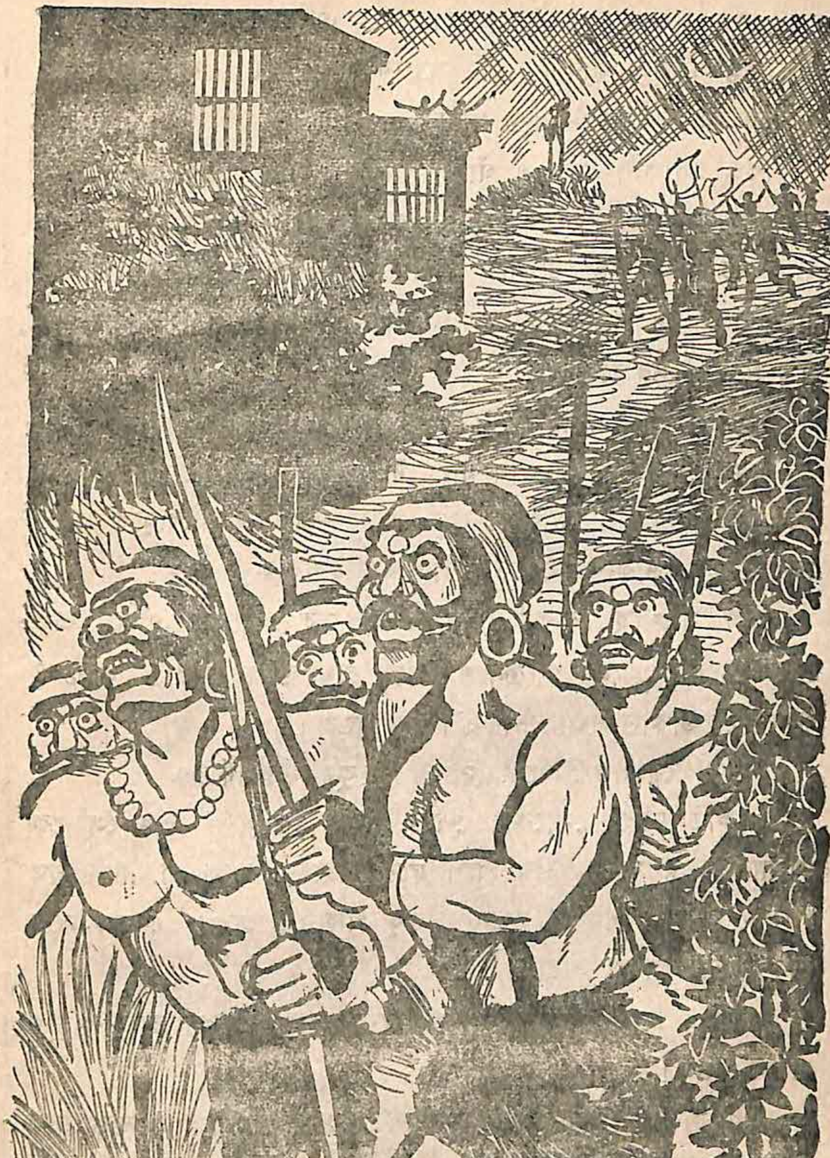
বিপক্ষের মশালধারীও চমকে উঠল। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—একি চরণ! তুমি?

চরণের তখন বুক কাঁপছে রীতিমত। মশালধারী তাকে চিনল কেমন করে? তা'হলে কি তাড়াহুড়া করে বাড়িতে ঢুকবার আগে মুখে রং মাখতে সে ভুলে গেছে?

—আমি তোমাকে চিনেছি চরণ। লোকটি বলে উঠল।

একথা শুনে চরণের অন্তরাত্মা উঠল কেঁপে। ডাকাতদের পক্ষে এটি বড় মারাত্মক সংবাদ। এ কথা যে বলে ডাকাত দলের লোকেরা তাকে জ্যান্ত রাখে না। কারণ, পরিচয়ের সূত্রকে জীইয়ে রাখলে তাদের বিপদ অনেক।

চরণের পাশে ডাকাতদলের যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল তার হাতে ছিল একটা বড় রামদা। নিজের লাঠিটা তাকে দিয়ে তার রামদাটা



ডাকাত দল পালিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে গাঁয়ের লোক।

হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেই লোকটার দিকে এগিয়ে গেল চরণ।

কিন্তু এমন একটা পরিচিত লোককে কেটে ফেলবে? শুধু পরিচিত নয়—আত্মীয়—পরম আত্মীয়।

কিন্তু লোকটা তো এ গাঁয়ের বাসিন্দা নয়। তবে কেমন করে এল এখানে? তা'হলে কি বেড়াতে এসেছে কোন বাড়িতে?

অথচ এত কিছু ভাববার সময় নেই চরণের। হাতের ধারাল রামদাটাকে সে শক্ত করে ধরল। দলকে বাঁচাতে হলে তাকেও শক্ত হতে হবে—নিষ্ঠুর হতে হবে।

মুহূর্তেই মশালধারীর মুণ্ডটা কেটে সে মাটিতে ফেলে দিল।

একটু দূরে গাঁয়ের লোক যারা দাঁড়িয়েছিল এই দৃশ্য দেখে তারা ভয়ে কেঁপে উঠল। চীৎকার করে বলল—ওরে, জামাইবাবুকে মেরে ফেলল রে!—ডাকাতরা কেটে ফেলল জামাইবাবুকে।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করতে করতে অন্য সব লোকেরা এগিয়ে এল পেছন থেকে। মনের আক্রোশে মরিয়া হয়ে উঠল তারা। লাঠি ও বল্লম নিয়ে ডাকাত দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—পালিয়ে যাও পেছনের দিকে। হুকুম দিল সর্দার!

ডাকাত দলের লোকেরা পেছন দিকে ফিরল। কিন্তু সেদিকে যে সারি সারি ঘর! তার পাশ দিয়ে পেছনের দিকে পালাবার পথ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। তবু পালাতে হবে! পেছন দিকে ফিরে ছুটতে লাগল তারা।

হঠাৎ রাতের অন্ধকার কাঁপিয়ে বিকট শব্দ হল—গুড়ুম গুড়ুম—গুম্!

এই অতর্কিত বন্দুকের শব্দে ডাকাত দলের লোকেরা স্তব্ধ হয়ে গেল। বুক কেঁপে উঠল তাদের।

—কে ছুড়ল বন্দুক—কে ছুড়ল? গর্জন করে উঠল কালু সর্দার।

—বন্দুক ছুড়েছি আমি—তোদের যম! ঘরের বারান্দা পেরিয়ে বন্দুক হাতে এগিয়ে এল জগদীশবাবুর বড় ছেলে মহীতোষ। এসে

দাঁড়াল ডাকাতদের সামনে। ডাকাতদের লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে করল আবার গুলি।

বন্দুকের চাবি তার কাছেই ছিল। কুলুঙ্গি খুলে বন্দুক নিয়ে তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে ডাকাতদের সামনে।

অন্ধকারেও লক্ষ্যভেদে মহীতোষ ওস্তাদ।

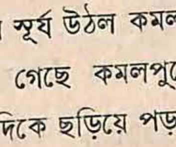
গুলি এসে লাগল সর্দারের পায়ে।

উঃ!—বলে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল সর্দার।

একটা যেন ঝড় উঠল চারদিকে। শুরু হল হৈ হুল্লোড়, চীৎকার ও আর্তনাদ। সারা কমলপুর গাঁ যেন কেঁপে উঠল।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে গেল ডাকাতের দল। অমন ভাবে পালাত না যদি বন্দুক হাতে ঐ সময়ে মহীতোষ এসে না দাঁড়াত।

কিন্তু যাবার সময় আহত সর্দারকে তারা নিয়ে যেতে পারল না। খুঁজে পাওয়া গেল না আর তাকে। বিষম হৈচৈ ভিড় আর অন্ধকারের মধ্যে সর্দারের অচেতন দেহটা কে সরিয়ে ফেলল কে জানে!



রক্তে স্নান করে পরদিন সূর্য উঠল কমলপুর গাঁয়ে।

বিরাট ডাকাতি হয়ে গেছে কমলপুরে জোতদারদের বাড়িতে। এ খবর দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

একদল ডাকাতের সঙ্গে গাঁয়ের লোকদের সংঘর্ষ হয়ে গেছে— এ খবর জানাজানি হয়ে গেল ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

একজন ডাকাত ধরা পড়েছে—গাঁয়ের একজন লোক মারা পড়েছে ডাকাতদের হাতে—এখবরও রটে গেল বাতাসের বেগে।

আশে পাশের নানা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল কমলপুর গাঁয়ে। সকাল থেকেই যেন সেখানে মেলা বসে গেল।

এমন ব্যাপার কেউ শোনে নি—কেউ দেখে নি।

লোকের মুখে মুখে শুধু এই কথা—এই আলোচনা।

নবাবগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। শেষ রাত্রেই গরুর গাড়ি করে রওনা হয়ে গেছে তিন চারজন লোক। থানায় এজাহার দিয়ে পুলিস নিয়ে তারা দুপুরের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

একজন ডাকাত বন্দুকের গুলিতে জখম হয়েছে। পায়ে লেগেছে গুলি। তাই সে পালাতে পারেনি। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

বিদঘুটে কালো—কি ভয়ঙ্কর সেই ডাকাতের চেহারা!

পুলিস এলেই তাকে চালান করে দেওয়া হবে।

যাক্ এবার তা'হলে ধরা পড়বে ডাকাতের দল।

দেশে এবার শান্তি আসবে। ডাকাতের যা উৎপাত হয়েছিল! ইস্!

এই নিয়ে কত আলোচনা—কত জল্পনা-কল্পনা। পথে ঘাটে এ ছাড়া লোকের মুখে আর কোন কথা নেই।

ওদিকে আর এক শোচনীয় ঘটনার জন্যও গ্রামের ওপর পড়েছে এক বিষাদের ছায়া।

জোতদারের বাড়ির সামনে সে কী বীভৎস দৃশ্য! নিহত লোকটির কাটামুণ্ড কোলে নিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে তার স্ত্রী। ছেলেমেয়েরাও চীৎকার করে কাঁদছে। এই গাঁয়েরই জামাই ছিল লোকটি। বৌ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল। বাড়িতে আর সে ফিরে যেতে পারল না।

এদিকে লাখীর জঙ্গলে ভয়ানক কাণ্ড শুরু হয়েছে।

এত ধন-সম্পত্তি লুঠ করে এনেও কারুর মনে শান্তি নেই।

সর্দারকে তারা ফিরিয়ে আনতে পারে নি—এই দুঃখই তাদের মনে সব চেয়ে বেশি। সর্দার জীবিত না মৃত তাও তারা জানে না।

বিশালাক্ষীর কাছে হাত জোড় করে সবাই বলতে লাগল—মা, তুই একি করলি? তোকে রক্ত দেইনি বলে আজ এমন সর্বনাশ করলি আমাদের?

সর্দারের বউ কমলমণির কানে খবরটা পৌঁছতেই সে ছুটে এল। কোলে তার বাবলু।

এসেই বিশালাক্ষীর পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল।—মা, তুই আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দে—আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দে—

ডাকাত দলের লোকেরা কমলমণির ওপর ক্ষেপে উঠল। তারা বলল—তোমার জন্যই তো এমন হল। তুমিই দোষী।

কমলমণি বলল—কেন আমি কি দোষ করেছি?

একজন ডাকাত বলল—তুমিই তো বলির মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছ। মা বলি পায় নি। তাই সে ক্ষেপে উঠেছে।

অন্য সব লোকেরা চেঁচিয়ে বলল—ঐ তো ছেলে রয়েছে তোমার কোলে। ওকে দাও, আমরা বলি দেই মায়ের সামনে, মাকে খুশি করি।

কমলমণি বাবলুকে চেপে ধরল। চীৎকার করে বলল—না, না, আমার বাছাকে দেব না।

কয়েকজন মরিয়া হয়ে উঠল। বলল—দিতেই হবে। ওর জন্যই আমাদের অমঙ্গল হয়েছে। মাকে খুশি করতে হবে। সর্দারকে বাঁচাতে হবে—আমাদের বাঁচতে হবে।

—ঠিক কথা! ঠিক কথা! সায় দিল আরও অনেকে। মাকে খুশি করলেই আমাদের বিপদ কেটে যাবে। কেড়ে নাও ওকে—আজ রাতেই পুরুত ডেকে ওকে বলি দেব।

কয়েকজন মিলে বাবলুকে কেড়ে নিতে গেল কমলমণির কোল থেকে।—দাও, বাচ্চাকে দাও—মায়ের কাছে ওর রক্ত দিতে হবে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠল বাবলু। কমলমণিও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল—না না, বাছাকে আমি দেব না। আমার রক্ত নাও—আমার রক্ত নিয়ে বাঁচাও তোমাদের সর্দারকে।

নিরস্ত হল ডাকাত দল। মেয়েমানুষের রক্ত কেমন করে দেবে বিশালাক্ষীকে? মায়ের কাছে তো মেয়েমানুষ বলি দিতে নেই ডাকাতদের।

কমলমণি নড়ল না সেখান থেকে। বাবলুকে আঁকড়ে ধরে বিশালাক্ষীর পায়ের তলায় পড়ে রইল।

ওদিকে বিকেল না হতেই কয়েকজন ডাকাত চলে গেল কমলপুরের দিকে। ঠিক কমলপুরে তারা যাবে না—যাবে আশেপাশের গ্রামে। সেখান থেকে করবে সর্দারের খোঁজ-খবর। তারপর যদি কিছু করবার থাকে করবে।

গরীব ভিক্ষুক সেজে দু'জন লোক দুপুরের আগেই বেরিয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে এরা যোগাযোগ করবে নির্দিষ্ট জায়গায়।

এদিকে সর্দারের মঙ্গল কামনা করে সন্ধ্যা হতে না হতেই বিশালাক্ষীর পূজার আয়োজন করতে লাগল ডাকাতরা। এ যেন অকালবোধন!

সর্দারের বউ সেই যে মা কালীর কাছে ধরণা দিয়েছে আর সে ওঠে নি। বাবলুও তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তাকে জাপটে ধরে রয়েছে।

পুরোহিত এল। পাঠ করল পূজার মন্ত্র। চোখ মুখ তার মোহে আচ্ছন্ন।

ঢাক বাজার তালে তালে মনের আবেগ যেন বাড়তে লাগল তান্ত্রিক পুরোহিতের। এক সময় উত্তেজনায় অধীর হয়ে বলে উঠল—ওরে বলি দে, বলি দে মায়ের কাছে। সর্দারকে যদি বাঁচাতে চাস শিগ্‌গির বলি দে। তোদের সামনে ঘোর অমঙ্গল। যদি মঙ্গল চাস তবে বলি দে—

—বলি!

—হ্যাঁ, বলি দিতেই হবে।

—ডাকাতরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

—ঐ শিশুর জন্যই তো যত সব অনর্থ ঘটেছে। ওকেই বলি দাও! বলে উঠল কয়েকজন ডাকাত।

কমলমণির তখন হুঁশ নেই। নির্জীব হয়ে পড়ে আছে—ছেলেটাও।

তাড়াতাড়ি তারা ছেলেটাকে তুলে এনে হাড়িকাঠের ওপর তুলে দিল। চান করাল না। অত সময় কোথায়? শুধু কপালে ছুঁইয়ে দিল তেল আর সিঁদুর। পূজার জল গায়ে ছিটিয়ে তাকে শুদ্ধ করে নেওয়া হল।

পুরোহিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সে খড়্গ উঠাল।

—মা বিশালাক্ষী, এবার খুসি হ' মা। অপরাধ ক্ষমা কর্।

মশালের আলোকে ঝকঝক করে উঠল খড়্গ।

—মা বিশালাক্ষী—

—জয় মা বিশালাক্ষীর জয়!

আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল ডাকাতেরা। তাদের বিপদ কাটবে। তারা অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাবে।

—জয় মা বিশালাক্ষী—

লাখীর জঙ্গলটা বুঝি কেঁপে উঠল। আর্তনাদ করে উঠল যেন বনের গাছপালাগুলি।

মন্দিরটা যেন কেঁপে উঠল হঠাৎ।

ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি রে! ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?

সবাই আতঙ্কিত হয়ে তাকাল বিশালাক্ষীর মূর্তির দিকে। কিন্তু তাতে আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল।

বিশালাক্ষী যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জিভটা লক লক করছে। আগুনের ভাটার মত জ্বলছে তার চোখ।

হঠাৎ একটা তীব্র আলোতে মন্দিরটা ভরে গেল।

সবার চোখ ঝলসে গেল সেই আলোকে।

একি হল! একি হল! সবার মুখ থেকে বেরিয়ে এল গভীর আতঙ্কের চীৎকার।

গোটা লাখীর জঙ্গলটাই তখন কাঁপছে।

ওরে পালা! শিগ্‌গির পালা! মা ক্ষেপে উঠেছে, কারুর আর রক্ষা নেই।

ছোটাছুটি করে পালাতে লাগল ডাকাতের দল।

কিন্তু পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে তখনও স্থিরভাবে। তার যেন বাহ্যজ্ঞান নেই। কোন কিছু হুঁশ নেই তার। এদিকে কখন কমলমণি জেগে উঠেছে—বাবলুকে সরিয়ে নিয়েছে হাড়িকাঠ থেকে—সে লক্ষ্য করেনি।

মুখে তার গুরু-গম্ভীর কাতর ধ্বনি—মা, অমঙ্গল দূর কর্—সর্দারকে রক্ষা কর্।

হাতের খড়গ যখন তার নেমে এল তখন হাড়িকাঠে বাবলু নেই—সেখানে মাথা পেতে দিয়েছে কমলমণি।

কিন্তু ভাববার সময় নেই—অপেক্ষা করবার উপায় নেই—উদ্যত খড়গ সে নামিয়ে দিল হাড়িকাঠের ওপর।

হায়, ওকি! তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরোহিত। গায়ের রক্ত তার হিম হয়ে এল। ছেলের বদলে কমলমণিকে সে বলি দিয়েছে মা কালীর সামনে।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে কাটা মুণ্ডু থেকে।

নারী হত্যা!

আতঙ্কে শিউরে উঠে পুরোহিত খড়গ ফেলে পালিয়ে গেল।



তিন

নবাবগঞ্জ থানা থেকে যখন কমলপুর গাঁয়ে পুলিসেরা এসে পৌঁছল তখন দুপুর গড়িয়ে পড়েছে।

কালু সর্দারকে তখনও বেঁধে রাখা হয়েছে শক্ত করে। শুধু বেঁধে রাখাই হয় নি, গাঁয়ের দশ বারোজন জোয়ান জোয়ান লোক তাকে ঘিরে রয়েছে। প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র। যাতে কালু ডাকাত পালাতে না পারে তার ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবেই করেছে তারা।

এত কড়া পাহারা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। যে ভাবে কালু সর্দারের পায়ে বন্দুকের গুলি লেগেছে তাতে তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভাল করে হাঁটতেও সে অক্ষম।

ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে সর্দার। গুলিটা বের করে ফেলতে না পারলে হয় তো জীবন বাঁচানোই দায় হয়ে উঠবে তার।

পুলিস দলের সঙ্গে একজন দারোগা এসেছেন। তাঁর নাম তারিণী চক্রবর্তী।

তারিণী চক্রবর্তী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন কালু সর্দারকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—কিরে, তোর নাম কি ?

কালু সর্দার ঝিমুতে লাগল। যত ব্যথা তার চেয়েও বেশি ব্যথার ভান করে কাতরাতে লাগল সে।

তারিণী চক্রবর্তী বললেন—আমাকে দেখেই বুঝি তোর কাতরানি বাড়ল! চালাকী করবার আর জায়গা পাস নি ? হাতের রুলটা

দিয়ে খুব জোরে একটা গুঁতো মেরে বললেন—নাম বল্। কি নাম তোর?

কিন্তু ঐ রুলের গুঁতোয় কি হয় ডাকাত সর্দারের! তিন চারটে রুলের গুঁতোয়ও যখন কিছু হল না তখন দারোগা বুটসুদ্ধ একটা লাথি মারলেন কালুসর্দারের পিঠে!

জোরে কাতরে উঠল কালু সর্দার—উহুঁ—উঃ—

—নাম বল্—নাম বল্ শিগ্‌গির—

—আজ্ঞে—মতি বাগ্‌দী।

—মতি বাগ্‌দী তোর নাম? সত্যি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কালু ডাকাতকে চিনিস তুই?

—আজ্ঞে না।

—তোর বাড়ি কোথায়?

আবার কাতরাতে লাগল কালু সর্দার। কাতরাতে কাতরাতে একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ল।

আঁতকে উঠল আশেপাশের লোকেরা। ডাকাতটা মারা গেল নাকি?

কিন্তু ঝানু লোক তারিণী দারোগা। তিনি কালু সর্দারকে রুলের আর একটা গুঁতো দিয়ে বললেন—ওঠ্ বেটা, ওঠ্। কত ঢং দেখলাম!

গাঁয়ের একজন বৃদ্ধলোক এগিয়ে এসে বললেন—ওরে, লোকটার মাথায় জল দে। বেঘোরে মারা গেলে গেরস্ত বাড়ির অমঙ্গল হবে যে।

তারিণী দারোগাও আপত্তি করলেন না। যদি তাতে লোকটার একটু জ্ঞান ফেরে। তবে তাঁরই জেরা করতে সুবিধে হবে।

কয়েকজন লোক ঘটি ও বালতিতে করে জল নিয়ে এল ছুটোছুটি করে। ঢালতে লাগল কালু সর্দারের মাথায়, চোখে মুখেও জলের

ছিটা দিতে লাগল। তবু লোকটা নড়ে না।

তারিণী চক্রবর্তী বলতে লাগলেন—লোকটা নিশ্চয়ই কালু ডাকাতের দলের লোক। নইলে এমন ভাবে ডাকাতি কালু ডাকাতের দল ছাড়া আর কে করবে ?

গাঁয়ের সেই বৃদ্ধ লোকটি বললেন—সত্যি, এমন ডাকাতি আমাদের গাঁয়ের আশেপাশে আর হয়নি দারোগাবাবু।

তারিণী চক্রবর্তী বললেন—কালু ডাকাতের দলকে ধরবার জন্য চেষ্টা কম করা হচ্ছে না। অথচ কি আশ্চর্য, দলটাকে ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই।

কেউ কেউ বলল—কালু ডাকাতের নাম আমরাও শুনেছি দারোগাবাবু।

তারিণী চক্রবর্তী বললেন—ওর নাম শোনেনি এমন লোক খুব কমই আছে বাংলা দেশে। সরকার ওকে ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, আমরাও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। এই লোকটি যদি সেই দলের লোক হয় তবে ভালোই। কালু ডাকাতকে ধরা যাবে এবার।

কিন্তু তারিণী দারোগা জানেন না, যাকে ধরবার জন্য এত তোড়-জোড় সে-ই এখন তাঁর একেবারে হাতের নাগালে।

ওদিকে তখনও ডাকাতের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে। জ্ঞান হয় না তবু কালু সর্দারের।

তারিণী দারোগাও ঘাবড়ে গেলেন একটু। ডাকাতের দিকে মন না দিয়ে রিপোর্ট লিখতে শুরু করলেন। নানা লোককে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

রিপোর্ট লেখা শেষ হয়ে গেল। তখনও তেমনি ভাবে পড়ে আছে কালু। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আর বেশি দেরি করাও চলে না। থানায় ফিরতে হবে।

ওদিকে কাটা লাসটা বেঁধে ফেলা হয়েছে। ওটা শহরের হাসপাতালের মর্গে পাঠাতে হবে। পরীক্ষা করা হবে লাসটাকে।

ছয়জন পুলিস এসেছে তারিণী চক্রবর্তীর সঙ্গে। তু'জন পুলিস লাসটাকে নিয়ে শহরে যাবে নৌকা করে। বাকী চারজন পুলিস ডাকাতটাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় চলে যাবে গরুর গাড়িতে। সঙ্গে থাকবেন তারিণীবাবু।

কিন্তু মুস্কিল বাঁধল কালু সর্দারকে নিয়ে। সে যে নির্জীবের মত পড়ে আছে তো পড়েই আছে।

কি করা যাবে? তারিণী দারোগা বললেন—ওকে এভাবেই গরুর গাড়িতে তুলে নেব। থানায় নিয়ে ওকে ধোলাই না দিলে ওর পেট থেকে কথা বেরুবে না।

সেই ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেল। গরুর গাড়িতে তুলে নেওয়া হল কালু সর্দারকে। তু'জন পুলিসকে কাটা লাস নিয়ে শহরের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

তারিণী দারোগা যখন রওনা হলেন তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

একটি লণ্ঠন গাড়িতেই ছিল। আরও একটি চেয়ে নেওয়া হল জগদীশবাবুর বাড়ি থেকে। লণ্ঠন তুটো জ্বালিয়ে একটি সামনের দিকে আর একটি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

কমলপুরের সীমানা পার হতেই শুরু হল মাঠ। তারপর জঙ্গল। সেই জঙ্গলের পাশ দিয়ে পথ।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। লণ্ঠনের টিমটিমে আলো—সেই অন্ধকারের মধ্যে মনে হতে লাগল যেন তুটি আলোদানা জ্বলছে।

জঙ্গলের পাশে গাড়ি এসে পড়তেই অন্ধকারের ভয়াবহতা যেন আরও বেড়ে গেল। চারদিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে গাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ ভেসে যেতে লাগল দূর দিগন্তে।

নির্জন অন্ধকারের মধ্যে যেন এক কালো দৈত্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। দমকা হাওয়াতে শরীরটা নাড়া দিচ্ছে—অজানা ভয়ে গা উঠছে ছমছম করে।

তারিণী দারোগা গাড়ির একদিকে বসে মাঝে মাঝে চুরুট টানছেন

আর পুলিসদের সঙ্গে একটু আধটু কথাবার্তা বলছেন। কালুর খবরও নিচ্ছেন মাঝে মাঝে। পুলিস চারজন কালু ডাকাতকে ঘিরে বসে আছে। সেদিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি। ডাকাতটি কিন্তু তেমনি নির্জীব-ভাবেই শুয়ে আছে।

গাড়ি চলছে আর চাকার শব্দ হচ্ছে কঁ্যা···চ্—কঁ্যা···চ্।

গাড়ির দোলায় ঢুলুনি আসছে তারিণী চক্রবর্তীর।

হঠাৎ জঙ্গলের এক পাশটা নড়ে উঠল। তারিণী চক্রবর্তীর চোখে না পড়লেও পুলিসদের চোখে তা এড়াল না। কিন্তু সেই শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘটল এক অদ্ভূত কাণ্ড। সাত আটজন লোক জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। অতর্কিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল গরুর গাড়িটার ওপর।

কি ঘটল কেউ কিছু বুঝতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে তারিণী চক্রবর্তীকে তারা পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল। চারজন পুলিসকেও তারা কাবু করে ফেলল।

পুলিসের দল ভাবতেও পারেনি ডাকাতের দল এমন করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

কিন্তু তখন তাদের করবার আর কিছু নেই। হাত পা তাদের বেঁধে ফেলেছে ডাকাতরা।

গাড়োয়ান করিমুদ্দিন অন্ধকারের মধ্যে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারল না। তবে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটছে তা অনুমান করতে পারল। ভয়ে সে বলে উঠল—তোবা—তোবা—

গাড়ির ওপর যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা চিৎকার করে উঠল—সর্দার! আমরা এসে গেছি।

কালু সর্দার মুহূর্তের মধ্যে উঠে বসল। তারপর সেই গুলি লাগা পা নিয়েই লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে। অন্য সব ডাকাতরাও ঝটপট লাফিয়ে পড়ল।

যেন এক ভোজবাজীর কাণ্ড ঘটে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

করিমুদ্দিন ভয়ে ভয়ে বিষম জোরে গাড়িটা চালিয়ে দিল।

নবাবগঞ্জের থানার চত্বরে যখন গাড়িটা এসে পৌঁছল তখন অনেক রাত।

থানার লোকেরা জেগেই ছিল। গাড়ির শব্দ পেয়ে তারা ছুটে এল। কিন্তু কাছে এসে যা দেখল তাতে তাদের চোখ চড়কগাছ। গাড়ির মধ্যে পড়ে আছে হাতমুখ বাঁধা চারজন পুলিস আর দারোগা তারিণী চক্রবর্তী! যে ডাকাতকে নিয়ে আসার জন্য এত তোড়জোড় করে যাওয়া হয়েছিল তার কোন পাত্তাই নেই।

একি ব্যাপার!

গাড়োয়ান করিমুদ্দিন ভয়ে কাঁপছে তখনও। মুখ দিয়ে তার কোন কথাই বের হচ্ছে না। শুধু বলছে—তোবা—তোবা!

অনেকবার জিজ্ঞেস করার পর তার মুখে কথা ফুটল। বলল—কর্তারা, আপনারা তো দেখনি কি কাণ্ডটা হলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তেনারা সব ঝাঁপিয়ে পড়লেন গাড়ির মধ্যি। তোবা—তোবা! তেনাদের দেখলি কার না ডর লাগে? আমার বুকটা এহনও ধড়ফড় করতিছেন।

—ক'জন ডাকাত ছিল রে সেই দলে? জিজ্ঞেস করলেন ছোট দারোগাবাবু।

বুড়ো করিমুদ্দিন বলল—কুড়িজনও হতি পারেন আবার পঞ্চাশজনও হতি পারেন। অন্ধকারের মধ্যি ঠাহর করা যায় না কর্তা। আমি তো রাত্তির বেলা চোহে একটু কম দেহেন।

এদিকে হাত ও মুখের বাঁধন খুলে তারিণী চক্রবর্তী ও পুলিস চারজনকে গাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তারা সবাই যেন আতঙ্কে ও ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিছুক্ষণ কারুর মুখ থেকেই কোন কথা বের হল না। একটু সুস্থ হওয়ার পর তারিণীবাবু বললেন—ইস্, কি আপশোস! হাত থেকে ফসকে গেল!

—কি ফস্‌কে গেল? ডাকাত? জিজ্ঞেস করলেন ছোট দারোগা

তিনকড়ি সামন্ত।

তারিণীবাবু বললেন—শুধু ডাকাত নয়, ডাকাতের সর্দার! কালু ডাকাত।

কালু ডাকাত!

কথা শুনে চমকে উঠল সবাই। কালু ডাকাত হাতের মুঠোতে এসেও ফস্‌কে গেল? কি আশ্চর্য!

কালু ডাকাতই তা'হলে ধরা পড়েছিল? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনেকে।

তারিণী চক্রবর্তী বললেন—হ্যাঁ। কমলপুরে যে ডাকাতটা ধরা পড়েছিল, সে আর কেউ নয়—কালু ডাকাত!

কালু ডাকাত! সবার চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

ছোট দারোগা তিনকড়ি সামন্ত বললেন—যে ভাবেই হোক কালু ডাকাতকে আবার ধরতে হবে। আমাদের হাত থেকে এমন চালাকি করে পালিয়ে যাবে একটা ডাকাত! ছিঃ ছিঃ!

কত জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল থানার লোকদের মধ্যে। বাকী রাতটা কেউ আর ঘুমাতে পারল না।



চার

সর্দারকে নিয়ে ডাকাতের দল যখন লাখীর জঙ্গলে এসে পৌঁছল তখন ভোর হয়ে গেছে।

বিশালাক্ষীর মন্দিরের সামনে এসে সবাই থমকে দাঁড়াল ; হাড়ি-কাঠের সামনে পড়ে আছে কমলমণির কাটা মুণ্ড। ধড়টা পড়ে আছে তার পাশে। রক্তে ভেসে গেছে সারা জায়গাটা।

ওদিকে, কাল রাত্রে বিশালাক্ষীর মন্দিরে অলৌকিক কাণ্ড দেখে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারাও ততক্ষণে এসে জড়ো হল। এসে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই বীভৎস কাণ্ড দেখে! পুরোহিত বাবলুকে হত্যা করবার জন্য খড়গ উঠিয়েছিল এই খবরই তারা জানে। তারপর কি হয়েছিল তারা তা জানে না।

ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেল তারা।

একি! বাবলু আছে অক্ষত দেহে। আর কমলমণির মুণ্ড মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এমন বিপরীত কাণ্ড কেমন করে ঘটল তা কারুর মাথায় এল না। কেবল তারা চোখ ছানাবড়া করে ছিন্ন মুণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইল।

কালু সর্দারের এবার চোখ পড়ল সেদিকে। তার মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল। সহসা সে কিছু বুঝতে পারল না। হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কালু সর্দার হুঙ্কার ছেড়ে বলল—বল্, কে এই কাণ্ড করেছে? কে এমন সর্বনাশ করেছে আমার?

গুলি-বেঁধা পা নিয়ে হাঁটতে পারছে না কালু সর্দার। ব্যথায় পা টন্‌টন্ করছে। তবু এগিয়ে গেল কমলমণির দিকে।

কাটা মুণ্ডর চোখ দু'টি যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে। নিস্তেজ দৃষ্টি—তবু যেন তাতে ক্রোধ ও অভিমান মাখা। সেদিকে তাকিয়েই সে ডাকল—কমল বৌ রে, কমল বৌ!

কালু সর্দার জানে, তার বৌ আর কোনদিন সাড়া দেবে না।

বাবলুর কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল—বাবলু। বাবলু রে!

কোন সাড়া নেই।

সর্বনাশ! বেঁচে আছে তো?

সর্দার বাবলুকে টেনে তুলল। ঘুমে ও ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আছে কচি শিশুর শরীর। অনেকবার ডেকেও তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

—বাবলু—বাবলু রে—বাবলু···

এবার চোখ মেলে তাকাল বাবলু। আতঙ্কে কেঁপে উঠে চারদিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজল!

খুব ভয় পেয়েছে বাবলু!

—কে? কে এই কাণ্ড করেছে? এরা এলই বা এখানে কেমন করে? সর্দারের গর্জনে কেঁপে উঠল বনের গাছপালা।

ভয়ে কাঁপতে লাগল ডাকাতরা। যারা কিছু কিছু ব্যাপার জানত তারা বলে উঠল—আমরা কিছু জানি না সর্দার। পুরুত জানে।

—পুরুত? চোখ কটমট করে সর্দার তাকাল তাদের দিকে।

—হ্যাঁ পুরুত! ডাকাতরা বলল—তোমার যাতে মঙ্গল হয় সেজন্য মায়ের পূজার আয়োজন করেছিলাম আমরা। পুরুত পূজা করতে করতে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। বলল, বলি চাই। যদি সর্দারের মঙ্গল চাস্ তবে শীগ্‌গির বলি দে। তোমার বউ আর ছেলে মন্দিরের সামনেই ছিল। পুরুত ছেলেটাকে বলি দেবার জন্য খড়্গ উঠাল।

—কি বললি? গর্জন করে উঠল সর্দার।

—হ্যাঁ। কাঁপতে কাঁপতে ডাকাতরা বলল—বলি না পেলে সর্দারকে বাঁচানো যাবে না, পুরুত বারবার এই কথা বলতে

লাগল। তাই তো আমরা তাকে কোন বাধা দিলাম না সর্দার। কিন্তু—

—বল্, থামলি কেন? সর্দার চীৎকার করে উঠল।

ডাকাতরা বলল—তখন আশ্চর্য এক কাণ্ড হয়ে গেল সর্দার। সারা বনটা কেঁপে উঠল মড়মড় করে। মন্দিরটাও কেঁপে উঠল। মা বিশালাক্ষীর চোখ থেকে আগুন বেরোতে লাগল। কী তার তেজ! মনে হল সারা বনটাই বুঝি পুড়ে যাবে।

সে কথা শুনে সবাই শিউরে উঠল। সবার গায়ের লোমগুলি উঠল খাড়া হয়ে। ভয় ও কৌতূহল নিয়ে তাকাল মা বিশালাক্ষীর দিকে।

—তারপর? তারপর কি হল? অধীর ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সর্দার।

ডাকাতরা বলল—তারপর আর আমরা কিছু জানি না সর্দার। আমরা ভয় পেয়ে জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে গেলাম।

সর্দার চোখ লাল করে তাকিয়ে রইল ডাকাতদের দিকে। তারা বলল—আমাদের কোন দোষ নেই সর্দার। তোমার ভালোর জন্যই আমরা মায়ের পূজা করতে চেয়েছিলাম।

সর্দার পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েই রইল কিছুক্ষণ। তার মুখ দিয়ে একটি কথাও আর বের হল না।

এমন সময় বাবলুর ডাকে সর্দারের সম্বিত ফিরে এল। বাবলু জেগে উঠে চীৎকার করে ডাকল—মা, মা গো! বাবা—

সর্দার বাবলুকে কোলে তুলে নিল। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল বাড়ির দিকে।

মাধব, গদাই আর চরণ হাঁক দিয়ে বলল—কোথায় যাচ্ছ সর্দার—কোথায় যাচ্ছ?

কালু সর্দার পেছনের দিকে তাকাল না। চলতে লাগল বাড়ির দিকে।

—সর্দার—সর্দার!

—না, আমি আর তোদের সর্দার নই। আজ থেকে আমার

ছুটি। ডাকাতি করতে আর কোনদিন বের হবে না কালু বাগদি।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে কালু সর্দার চলতে লাগল। মাধব, গদাই আর চরণ চলতে লাগল তার পেছনে পেছনে।

—সর্দার—সর্দার···

খোঁড়া পায়েও কত জোর। কী তার চলার বেগ!

বাড়িতে যখন এসে পৌঁছল তখন সর্দারের কোন হুঁশ নেই। বাবলুকে কোনরকমে কোল থেকে নামিয়ে সর্দার শুয়ে পড়ল দাওয়ার ওপর। মাধব, গদাই আর চরণ সেবা-শুশ্রূষা করে সর্দারের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। চাঁদসী ডাক্তার ব্রজলালকে নিয়ে এল হোসেনপুর থেকে। কাটা-ছেঁড়া চিকিৎসায় সে ধন্বন্তরী। ডাকাতদের নানা রোগ-বালাই ও বিপদের চিকিৎসা সে-ই করে। তার বিনিময়ে প্রচুর টাকা নেয় ডাকাতদের কাছ থেকে। তবে সে নেমকহারামি করে না। ঘুণাক্ষরেও ডাকাতদের নাম প্রকাশ করে না কারুর কাছে। কারণ সে জানে, নাম প্রকাশ করলে ডাকাতরা তাকে জ্যান্ত রাখবে না।

ব্রজ ডাক্তার এসে সর্দারের পা থেকে বন্দুকের গুলি বের করল। ওষুধ লাগিয়ে ভাল করে বেঁধে দিল জখমের জায়গাটি।

ডাকাত দলের লোকেরাই কমলমণির সৎকার করল।

কিছুদিনের মধ্যেই সর্দার ভাল হয়ে উঠল। কিন্তু আগের মত হাঁটবার তার ক্ষমতা রইল না।

এরপর সত্যি সর্দারি ছেড়ে দিল কালু ডাকাত। ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে আশ্রয় নিল লাখীর জঙ্গলে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটি বছর।

কালু ডাকাতের নাম ধীরে ধীরে দেশের লোক ভুলে গেল।

এরপর?

এরপর উদয় হল লালু ডাকাত।



পাঁচ

লালু ডাকাতের নামে সারা দেশ কাঁপে।

বয়স তার বেশি নয়! পনেরো কি ষোল। কিন্তু এই বয়সেই তার গায়ে কি জোর—মনে কি সাহস! যেমন তার হৃষ্টপুষ্ট শরীর—তেমন তার সুন্দর চেহারা।

সবাই অবাক হয়ে ভাবে—এতটুকু ছেলে ডাকাতের সর্দার। শুনলে ভয়ও হয় আবার দেখতেও কৌতূহল জাগে।

সেদিন গভীর রাত।

নদীর বুকে ঢেউ কাঁপছে—ছল ছলাৎ—ছল ছলাৎ।

একটি বড় নৌকা চলেছে নদীর মাঝপথ দিয়ে।

দাঁড় বেয়ে চলেছে মাঝিরা। জলের বুকে বৈঠা পড়ছে ঠিক সময় বেঁধে তালে তালে—ঝপ্ ঝপাৎ—ঝপ্ ঝপাৎ।

নৌকার আরোহী ধনী মহাজন নসীরাম। বহু মালপত্র নিয়ে গঞ্জের হাট থেকে ফিরছেন। চাল ডাল ও মশলা বোঝাই বিরাট নৌকা। টাকা পয়সাও সঙ্গে রয়েছে অনেক।

নসীরাম বললেন—এত রাত্রে আর নৌকা বেয়ে দরকার নেই মাঝি। পাড়ে ভিড়িয়ে দাও। কাল সকালবেলা আবার না হয় রওনা হওয়া যাবে।

মাঝি বলল—না কর্তা, এ জায়গাটা ভাল নয়। বিপদের ভয় আছে। কোন রকমে এই মহালটা পেরিয়ে যেতে পারলে রক্ষা। যমের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়—কিন্তু ডাকাতের হাত থেকে

রেহাই পাওয়া মুস্কিল।

নসীরাম আঁতকে উঠে বললেন—ডাকাত!

মাঝি বলল—হ্যাঁ বাবু। লালু ডাকাতের নাম আপনি শোনেন নি?

—লালু ডাকাত!

—হ্যাঁ। এটা সেই লালু ডাকাতের এলাকা।

নসীরাম বললেন—অনেকদিন এ দেশের ডাকাতি বন্ধ ছিল। আবার শুরু হয়েছে বুঝি?

মাঝি বলল—হ্যাঁ বাবু। লালু ডাকাত নাকি কালু ডাকাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর। বয়সে ছোট হলে হবে কি, ওর বুদ্ধির সঙ্গে পেরে ওঠা দায়।

নসীরামের পুরনো গোমস্তা গজানন। সে নৌকোর ভেতর মনের সুখে নিদ্রা দিচ্ছিল। ডাকাতের নাম শুনে সুখনিদ্রা ভেঙে গেল তার। সে বলে উঠল—ডাকাতের আবার বুদ্ধি কি! ওরা পণ্ডিত না হাকিম? সে রকম মানুষের পাল্লায় পড়লে লালু ডাকাতের জারিজুরি কোথায় ভেসে যেত।

মাঝি বলল—ও কথা বলবেন না কর্তারা। আপনারা তো ওর পাল্লায় পড়েন নি। পড়লে বুঝতেন একটুখানি ছেলের কি কেরামতি।

গজানন বলল—রেখে দাও ও-কথা। ওরকম ডাকাত আমি কত দেখেছি। আমি যখন মাদারিপুরে আলকাতরার আড়তে কাজ করতুম তখন একবার সেখানে ডাকাত পড়েছিল। ইয়া জোয়ান জোয়ান তাকতওয়ালা ডাকাত! কিন্তু আমি যেই লাঠি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন ডাকাতরা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

মাঝি সে কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—তাই নাকি কর্তা?

গজানন জবাব দিল—শুধু কি তাই? ডাকাতরা পালাবার পথ পায় না।

মাঝি জিজ্ঞেস করল—তখন কি হল কর্তা?

গজানন বলল—কিছু ডাকাত ছুটে পালিয়ে গেল। আর কিছু

গিয়ে পড়ল আলকাতার পিপের মধ্যে।

মাঝি অবাক হয়ে বলল—আলকাতার পিপের মধ্যে? বলছেন কি কর্তা?

গজানন বলল—হ্যাঁ আলকাতরার পিপের মধ্য থেকে যখন তারা উঠল তখন আর তাদের চেনাই যায় না। যেন এক একটা কালো ভূত!

—তারপর কি হল? জিজ্ঞেস করল মাঝি।

গজানন বলল—কি আর হবে? ঘুটঘুটে রাতের অন্ধকারে মিশে গিয়ে সেই কালো ভূতগুলো কোথায় যে পালিয়ে গেল আর দেখতেই পেলাম না। নইলে কি আর আমার হাতে ওদের রেহাই ছিল?

গজাননের কথায় নসীরামের মনে একটু সাহস হল। যাক্, ডাকাত এলে হয়তো তেমন সুবিধে করতে পারবে না। গজানন ছাড়াও আছে তাদের সঙ্গে দু'জন কুলী। আর নৌকার পাঁচজন মাঝিমাল্লা তো রয়েছেই।

গজাননই বলল—ভয় কি কর্তা, আমরা এতগুলো লোক আছি। ডাকাত কি যা তা একটা কাণ্ড করে যেতে পারবে? আমরা রুখে দাঁড়াব না?

ঠিক সেই সময়েই নৌকার পেছনের হালের মাঝি বলে উঠল—বাবু, দেখুন তো এই দিকে যেন একটা নৌকা এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে।

—নৌকা! বল কি! এগিয়ে গিয়ে দেখবার সাহস হল না। ভয়ে কেঁপে উঠলেন নসীরাম। গলার স্বর যেন হঠাৎ আটকে গেল। কোনরকমে বললেন—মাঝি ভাই—দেখ তো—দেখ তো, ওটা কিসের নৌকা—

মাঝি বলল—অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না বাবু। তবে ওর লক্ষ্যটা আমাদের নৌকার দিকেই—

নসীরাম গজাননের উদ্দেশ্যে বললেন—তুমি একটু মুখ বাড়িয়ে দেখ তো গজানন।

কিন্তু মুখ বাড়িয়ে দেখবার মত অবস্থা কি আর তখন গজাননের আছে?

গজানন তোতলাতে তোতলাতে বলল—ও-ও কিছু নয়। ভয়ের কি আছে?

নসীরাম বললেন—মাঝি, নৌকা চালিয়ে যাও জোরে। খুব জোরে চালাও—যেন আমাদের ধরতে না পারে।

হালের মাঝি তখন হেঁকে বলল দাঁড়ীদের—দাঁড় ফেলো জোরে—খুব জোরে ফেলো—

দাঁড়ীরা খুব জোরে দাঁড় ফেলতে লাগল। শব্দ হতে লাগল—ঝপ্ ঝপ্ ঝপাৎ—

কিন্তু দেখা গেল ওদিকের নৌকাটাও জোরে চালিয়ে ছুটে অসেছে। লক্ষ্যটা যে তাদের এদিকেই সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

ভয়ে কাঁপতে লাগলেন নসীরাম।

ঝপ্ ঝপাৎ ঝপ্ ঝপাৎ—

আরও কাছে এগিয়ে আসছে নৌকাটা।

এমন সময় শোনা গেল পেছনের নৌকা থেকে কে যেন হাঁকছে—নৌকা থামাও—নৌকা থামাও—

বুঝতে আর বাকী রইল না—ডাকাতের নৌকা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

হালের মাঝি বলল—কর্তা, ডাকাতের নৌকা।

নসীরাম 'রাম রাম' জপ করতে লাগলেন।

গজানন তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করতে লাগল—তো-তোমাদের নৌকায় লা-লাঠি আছে? ধা-ধারালো দা আছে?

মাঝির সেদিকে খেয়াল করবার সময় নেই। সে জোরে হাল বাইতে শুরু করল। এক ফাঁকে হাঁফ ছেড়ে বলল—আছে কর্তা, ডান দিকে পাটাতনের তলায় দেখুন।

ওদিকে ডাকাতের নৌকাটা এগিয়ে এসেছে আরও কাছে। তারা

আরও জোরে হেঁকে বলছে—নৌকা থামাও—নৌকা থামাও—নইলে ভাল হবে না—

কিন্তু নৌকা কি থামানো চলে ? আরও জোরে মাঝিরা চালাতে লাগল নৌকা।

—মাঝি, থামাও নৌকা। থামাও—

দেখতে দেখতে নৌকাটা অনেক কাছে এসে পড়ল। নসীরাম তখন আরও জোরে 'রাম রাম' জপ করতে লাগলেন।

এই নৌকাটি যত জোরে চলে তার চেয়েও বেশি জোরে এগিয়ে আসে পেছনের নৌকাটি। দেখতে দেখতে প্রায় কাছে এসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল একেবারে পাশাপাশি।

হঠাৎ কয়েকজন লোক সেই নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই নৌকার উপরে।

হারে···রে···রে···রে !

ডাকাত পড়েছে নৌকায়! মাঝিরা ভয়ে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু দু'বার চীৎকার করার আর সময় পেল না। সামনের চারজন দাঁড়ীকে ডাকাতরা আচমকা ধাক্কা দিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিল। অন্ধকারে নদীর স্রোতে তারা কোথায় কোন্ দিকে ভেসে গেল কে জানে।

পেছনের হালের মাঝি তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ডাকাতরা তাকেও বেঁধে ফেলল। কয়েকজন বলল—ওরে, ওকেও এবার জলে ফেলে দে।

পেছন থেকে একটি অল্প বয়সী ডাকাত বলে উঠল—না, ও বুড়ো মানুষ, ওকে জলে ফেলিস না।

সর্দারের আদেশ, সবাই তাই থমকে গেল। হালের মাঝিকে জলে আর ফেলে দিল না তারা।

ডাকাতের সর্দার লালু ছইয়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল—এটা নসীরাম মহাজনের নৌকা না ? কোথায় গেল নসীরাম ?

নসীরাম তখন 'রাম রাম' জপছেন আর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। তাঁর কাছে গিয়ে লালু বলল—আপনি তো নসীরাম! এত দেরী করে নৌকা ছাড়লেন কেন গঞ্জ থেকে? তাই তো এই বিপদে পড়লেন।

নসীরাম কাঁপতে কাঁপতে বললেন—কি করবো, খয়েরের বোঝা নিয়ে কুলীটা কোথায় পালাল, তার হদিস করতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল।

হেসে উঠল লালু সর্দার। বলল—সে কি নিজের খুশিতে পালিয়েছে? ওটা আমাদের কারসাজি। নইলে ভুয়া সাধুর পেছনে কুলীটা অমন করে ঘুরবে কেন?

সেকথা শুনে নসীরাম চমকে উঠলেন। তা'হলে ডাকাতের লোকেরাই একজনকে নকল সাধু সাজিয়ে কুলীর পেছনে পাঠিয়েছিল? আর সেজন্যই নৌকা ছাড়তে দেরী হল? না হলে রাত হবার আগেই এই জায়গাটা তারা পেরিয়ে যেতে পারত।

লালু সর্দার বলল—যা হোক, বিপদে যখন পড়েছেনই তখন আর কি করবেন? টাকাকড়ি যা আছে বের করুন শীগ্‌গির।

নসীরাম কাঁপতে কাঁপতে বললেন—টাকাপয়সা কিছু নেই বাবা। সব টাকা দিয়ে তো মাল কিনে ফেলেছি।

লালু বলল—চালাকী রাখুন। সব খবর আমরা রাখি। পেছনের দলের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল—ওহে কানাই, চাবুক মারো তো লোকটাকে।

সাগরেদ কানাই তৈরী হয়েই ছিল। কিন্তু ছইয়ের ভেতরে অল্প জায়গায় চাবুক চালাবে কেমন করে? তার বদলে বের করল সে ঝকঝকে ছোরা। বলল—সর্দার, এটাই বিঁধিয়ে দেই ওর পেটে! ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাক।

নসীরাম চীৎকার করে বললেন—দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না। তোমাদের হাতে পায়ে ধরছি, মেরো না আমাকে। ওহে

গজানন, আমাকে বাঁচাও—

কিন্তু কোথায় গজানন? কিছুক্ষণ আগেও যে হম্বিতম্বি করছিল, সে লুকিয়ে পড়েছে মাল বোঝাই বস্তার ফাঁকে। পাটাতনের তলা থেকে বের করে ধারাল দা খানা হাতে নিয়েই সে লুকিয়ে পড়েছে!

—গজানন আমাকে বাঁচাও! ওরে পঁচা, ওরে মানিক তোরা কোথায়?

কিন্তু কে বাঁচাবে নসীরামকে। তাঁর দু'জন জোয়ান কুলীকেও ডাকাতরা বেঁধে ফেলেছে।

লালু বলল—বের করো টাকা, নইলে রক্ষা নেই। কেটে ভাসিয়ে দেবো নদীর জলে।

কানাই ডাকাত ছোরাটা উঁচিয়েই ছিল। লালু সর্দারও কোমর থেকে তার ছোরাটা বের করল। বলল—দেরী করো না, শীগগির বের করো টাকা।

নসীরাম নিরুপায়! কোমরে জড়িয়ে-বাঁধা থলিটা খুলে বের করল। কাঁপতে কাঁপতে সেটা তুলে দিল লালু সর্দারের হাতে।

লালু থলিটা একটু দেখে নিয়ে চটপট নিজের কোমরে বেঁধে ফেলল। তারপর তার সাগরেদদের উদ্দেশ্য করে বলল—চাল ডালের কিছু বস্তা তুলে নাও এখান থেকে। গাঁয়ের লোকেরা খেতে পাচ্ছে না—তারা খেয়ে বাঁচবে।

ডাকাতের দল বস্তা টেনে উঠাতে শুরু করল। প্রথমেই একটা বস্তা টেনে বলল—কোথায় চালের বস্তা! এ যে শুকনো লঙ্কা—বেজায় হালকা—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তারা চমকে উঠল। ওকি, বস্তার তলায় নড়ছে কি? একটা মানুষ যেন! হঠাৎ সেই মানুষটি চীৎকার করে কেঁদে উঠল—ওরে আমাকে মেরে ফেললে রে! আমাকে কেটে ফেললে রে—

লোকটা আর কেউ নয়—গজানন।

একজন ডাকাত টেনে তুলল গজাননকে। গজানন কাঁদতে কাঁদতে বলল—দোহাই, আমাকে মেরো না, আমার কাছে কিচ্ছু নেই।

—আছে তোর কাছে, বের কর্। একজন ডাকাত লাঠির গুঁতো মারল গজাননের পিঠে।

গজানন ককিয়ে চিৎকার করে উঠল—বাবা রে, আমাকে কেটে দু' টুকরো করে ফেললে রে! আমি গেলাম রে!

—বের কর্, বের কর্ কি আছে তোর কাছে।

গজানন ট্যাঁক থেকে বের করল এক গোছা টাকা। এগুলি সে মহাজনের মাল কেনবার সময় সরিয়ে ছিল।

লালু সর্দার সবই জানে। সে হাসতে হাসতে বলল—পাপের ধন সব প্রায়শ্চিত্তে গেল। হায়রে, ভোগে সইল না! দলের লোকদের ডেকে বলল—ওরে, ওদিকে চাল ডালের বস্তা আছে, তুলে নে।

ডাকাতরা নৌকাটিকে বেয়ে নিয়ে এল পাড়ের দিকে। সঙ্গে নিজেদের নৌকাটিও। পাড়ে এসে ভিড়তেই চাল ডালের অনেকগুলো বস্তা তারা তুলে নিল। এবার সবাই লাফিয়ে নেমে পড়ল নৌকা থেকে। তারপর নৌকাটিকে ঠেলে ভাসিয়ে দিল মাঝ নদীর দিকে। বলল—যাঃ, এবার চলে যা যেখানে খুশি।

নৌকাটা স্রোতের টানে ভেসে চলল।

অন্ধকার নদীর বুকে তখন ঢেউ কাঁপছে ছল ছলাৎ—ছল ছলাৎ!

লালু ডাকাত! লালু সর্দার!

তার নাম শুনে দেশের লোক কাঁপে!

এই ডাকাত দলকে ধরবার জন্য পুলিস দলের চেষ্টার বিরাম নেই! কিন্তু কি আশ্চর্য! ধরতে কেউ পারে না।

কে এই লালু ডাকাত? অনেকের মনেই প্রশ্ন।

কেউ বলে—কালু ডাকাতের ছেলে। কেউ বলে—তার সাগরেদ।

লালু ডাকাতকে নিয়ে জল্পনা কল্পনার বিরাম নেই।

ছয়

কমলপুরের চার ক্রোশ দূরে ভুবনহাটি।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

গ্রামের জমিদার অনাদিনাথ মিত্র। দুর্দান্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি।

কিছুদিন ধরে তিনি লালু ডাকাতের ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

তার কারণও অবশ্য আছে। লালু ডাকাত চিঠি দিয়েছে—শীগগিরই সে বিশেষ দরকারে জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করবে!

জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করার কি যে কারণ তা আর বুঝতে কারুর বাকী নেই। তাই তিনি ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। থানায় খবর দিয়ে রেখেছেন সব কথা জানিয়ে।

ভুবনহাটি থেকে থানা অনেক দূরে। খুব বেশি যোগাযোগ রাখাও মুস্কিল।

শুধু থানায় খবর দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন নি অনাদি মিত্র। তাঁর লাঠিয়ালদের বলেছেন—তোমরা তৈরি হয়ে থাকবে। হুঁশিয়ার থাকবে সব সময়!

তারা ঠিক হুঁশিয়ার হয়ে রইল।

লাঠিয়ালেরা মাথায় পাগড়ী বেঁধে কোমরে লাল কাপড় জড়িয়ে রোজ রাত্রি বেলায় বাড়ির চারদিকে পাহারা দেয়। একটু কিছু শব্দ হলেই ছুটে যায় সেদিকে।

এই বুঝি ডাকাত এল!

বাড়ির লোকেরা ঘুমাতে পারে না শান্তিতে।

কিন্তু কোথায়……?

লালু ডাকাতের চিঠি পাওয়ার পরও বেশ কিছুদিন চলে গেল—তবু তার দেখা পাওয়া গেল না। অনাদিবাবু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—কিন্তু মন থেকে দুশ্চিন্তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারলেন না কিছুতেই।

অনাদিবাবুর বন্ধুবান্ধবরা আশ্বাস দিয়ে বললেন—ওটা কিছু নয়, ভুয়া চিঠি! মিছেমিছি কেউ তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য ঐ কারসাজি করেছে।

অনাদিবাবু তাই শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন আবার নানা আশঙ্কায় মনটা তাঁর দুলে উঠতে লাগল। এদিকে তাঁর মেয়ের বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। আগামী মাসেই বিয়ে। আয়োজন সব প্রস্তুত। বিয়েটা নির্বিঘ্নে চুকে গেলে তিনি রেহাই পান।

সেদিন বরের বাড়ির লোক এল কনেকে আশীর্বাদ করতে।

বরের বাবা কমলপুরের বিরাট জোতদার—জগদীশ রায়। তিনি নিজেই এসেছেন তাঁর ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করতে। একটু সকাল সকালই এসেছেন তাঁরা। শুভ কাজ সেরে সন্ধ্যার আগেই ফিরে যাবেন।

জলযোগ করে জগদীশবাবু বারান্দায় বসেছেন—

পাশে বসেছেন অনাদিবাবু। দু'জনে নানারকম গল্প করছেন।

গল্প হচ্ছে বিশেষ করে ডাকাতের চিঠি নিয়েই। অনাদিবাবু বললেন—চিঠিটা পেয়ে অবধি মনে শান্তি নেই। কি হবে কে জানে?

জগদীশবাবু বললেন—কি আর হবে? একটু হুঁশিয়ার থাকবেন। ক'বছর আগে তো আমার বাড়িও ডাকাতি হয়েছিল। যদি বন্দুকটা একটু আগে বের করতে পারতাম তবে কি আর এত জিনিস নিয়ে ডাকাতরা পালাতে পারত? যা হোক ডাকাত বাবাজী জব্দ হয়ে গিয়েছিল আমার ছেলের হাতে। বন্দুকের গুলিতে তাকে ঘায়েল করে

দিয়েছিল। শুধু পুলিসের দোষেই তো কালু ডাকাত পালিয়ে গেল। তাই বলি, হুঁশিয়ার থাকবেন খুব।

এমন সময় সদর দরজার কাছে বাউলের মধুর কণ্ঠের গান শোনা গেল। হু'জনের মনই ভরে উঠল খুশিতে। যা হোক, আজে বাজে চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া গেল একটু।

তাঁরা সদর দরজার দিকে তাকালেন। বাউলরা ভিতরে আসছে না তো! পাহারাদার লাঠিয়াল হয়তো তাদের বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

অনাদিবাবু চেঁচিয়ে বললেন—ওদের ভেতরে আসতে দে।

কর্তার হুকুম পেয়ে পাহারাদার পথ ছেড়ে দিল।

হু'জন বাউল গান করতে করতে এসে দাঁড়াল বাড়ির উঠোনে। একজনের হাতে একতারা আর একজনের হাতে খঞ্জনী। গায়ে লম্বা গেরুয়া রংয়ের আলখাল্লা, কপালে তিলক।

মিষ্টি তাদের গলার স্বুর, বাজনাও মধুর। জগদীশবাবু ও অনাদিবাবু অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কচি বয়স একজন বাউলের। যেমন স্বুন্দর তার চেহারা তেমনি অদ্ভুত চোখ মুখের ভঙ্গী। তার গলার স্বুরই সবচেয়ে মিষ্টি। আসলে সে-ই গান গায়। পাশের লোকটি শুধু তালিম দেয়।

গানের শব্দ শুনে অনাদিবাবুর স্ত্রী ভবানী দেবীও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কচি বয়সের বালকটিকে দেখে তাঁর মনের মমতা যেন উথলে উঠল। বললেন—আহা, এই কচি বয়সে ঘর ছেড়ে এসেছে। কার ছেলে গো!

জগদীশবাবু বললেন—হয় তো বাপ মা মরা ছেলে। তাই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভিক্ষা করছে।

ভবানী দেবী বললেন—আহা!

সত্যি, কি স্বুন্দর গান গায়। একটির পর আরও একটি গান তাদের গাইতে হল।

গান শেষ হলে ভবানী দেবী বাউল ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। নিয়ে গেলেন অন্দর মহলের দিকে। আসন পেতে বসতে দিলেন। বললেন—আহা, হেঁটে হেঁটে তোমার চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে বাছা। কিছু খাবে?

বাউল ছেলেটি বলল—না মা। একটু জল দিন। জল তেষ্টা পেয়েছে।

ভবানী দেবী বাড়ির ঝিকে জল আনতে বললেন। জল এল, সঙ্গে এল কয়েকটা নাড়ু আর মোয়া।

ভবানী দেবী বললেন—খাও।

বাউল ছেলেটি বলল—না মা, সঙ্গের লোকটি না খেয়ে আছে। আমি খেতে পারব না।

ভবানী দেবী বললেন—সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমি ওর জন্যও বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাইরে জল ও জলখাবার পাঠিয়ে দিয়ে ভবানী দেবী আবার ছেলেটির কাছে এসে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি বাবা?

ছেলেটি জবাব দিল—ভক্তদাস।

—তোমার মা বাবা নেই?

—না।

—থাকো কোথায়?

—আমাদের থাকার কি কোন ঠিকানা আছে মা? যখন যেখানে থাকি সেখানেই আমাদের ঘর।

—আহা!

ভক্তদাস নাড়ু ও মোয়া খেয়ে পেট পুরে জল খেল। বলল—এখন আসি মা।

ভবানী দেবীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল ভক্তদাস। ভবানী দেবী সঙ্কোচের সঙ্গে পা সরিয়ে নিলেন। বললেন—ছিঃ ছিঃ, একি করছ? তোমরা সন্ন্যাসী। তোমাদের কি কাউকে প্রণাম করতে আছে?

ভক্তদাস বলল—মা জ্ঞানে কাউকে প্রণাম করতে তো দোষ নেই। আপনি যে আমার মায়ের মতো। মা-ই তো আপনি।

ভবানী দেবীর বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ উঠল ছল ছল করে।

—বেঁচে থাকো বাবা, সুখী হও। ভবানী দেবী আশীর্বাদ করলেন ভক্তদাসকে। বললেন—আবার এসো বাবা। সামনের মাসে পাঁচ তারিখে আমার মেয়ের বিয়ে। সেদিন এসো কিন্তু। আসবে তো?

—আসবো, নিশ্চয়ই আসবো। কবে বিয়ে বললেন?

—সামনের বাংলা মাসের পাঁচ তারিখ। বুধবার।

—বেশ, আসবো মা। ছেলে তার মায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে না? তা কি হয় কখনো?

আবার প্রণাম করে বিদায় নিল ভক্তদাস। ভবানী দেবী এবার আপত্তি করলেন না। ছল ছল চোখে তাকিয়ে রইলেন ভক্তদাসের গমন পথের দিকে।

গান করতে করতে বাউল দু'জন জমিদার বাড়ির সদর দেউড়ী পার হয়ে চলে গেল।



সাত

কয়েকদিন পরেই অনাদিবাবু এক চিঠি পেলেন। তাতে লেখা—

মাননীয় জমিদারবাবু,

প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব কথা দিয়াছিলাম, সেই কথা আমি রক্ষা করিয়াছি। মায়ের চরণে প্রণামও জানাইয়া আসিয়াছি। তিনি আমাকে আপনার মেয়ের বিবাহে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। মাকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

ইতি—লালু ডাকাত।

পুনশ্চঃ—সেদিন পুলিসের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন না। করিলে তাহার ফল মোটেই ভাল হইবে না।

লালু।

চিঠি পড়ে অনাদিবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, বুক কেঁপে উঠল। সর্বনাশ! এমন ভয়ানক লোক ঐ ক্ষুদে লালু ডাকাত! বাউল সেজে এসেছিল!

স্ত্রীকে ডেকে অনাদিবাবু ঐ পত্র দেখালেন। ভবানী দেবীর মুখ দিয়েও কিছুক্ষণ কোন কথা বের হল না। স্তব্ধ হয়ে চিঠির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর বললেন—লালু ডাকাত এসেছিল আমার বাড়িতে। আমাকে প্রণাম করেছিল। আমাকে মা বলে ডেকেছিল। অতটুকু ছেলে ডাকাত! এ যে বিশ্বাস করা যায় না।

অনাদিবাবু বললেন—বিশ্বাস কি আমারও হয় ? কিন্তু এই চিঠিকে তো অবিশ্বাস করা যায় না ! সব যে মিলে যাচ্ছে !

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে অনাদিবাবু বললেন—কিন্তু তুমি যে আমাদের আরও বিপদের মুখে ঠেলে দিলে। মেয়ের বিয়েতে আসবার জন্য নেমন্তন করে দিয়েছ ডাকাতকে।

ভবানী দেবী বললেন—আমি কি তখন জানতাম ভক্তদাস ডাকাত। যতোই বলো ওকে ডাকাত বলে কিন্তু মোটেই মনে হয় না। এমন সুন্দর ভদ্র চেহারা—কে বলবে ও ডাকাত।

—অথচ কি আশ্চর্য, ঐ খুদে লালু ডাকাত সারা দেশকে কাঁপিয়ে তুলেছে ! কেউ বলছে ও কালু ডাকাতের ছেলে, কেউ বলছে ও অন্য লোক। ওর দল নাকি কালু ডাকাতের দলের চেয়েও ভয়ঙ্কর !

—তা হলে কি হবে ? গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন ভবানী দেবী।

অনাদিবাবু বললেন—এখন বাঁচাবার উপায় করতে হবে। বিয়ের দিনে যাতে রক্ষা পাওয়া যায়—যাতে ওকে ধরা যায় তার জন্য পুলিসের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভবানী দেবী বললেন—কিন্তু ও যে পুলিসের ব্যবস্থা করতে বারণ করেছে ?

অনাদিবাবু বললেন—ও তো বারণ করবেই। তাই বলে আমরা বসে থাকব ? সর্বনাশ হলে কার হবে ?

ভবানী দেবী বললেন—ও আমাকে মা ডেকেছে। মা ডেকে অমন সর্বনাশ আমাদের করবে ?

অতি দুঃখেও অনাদিবাবু হেসে উঠলেন। বললেন—তোমাদের মেয়ে মানুষের মন ! হায় রে !

ওদিকে কমলপুর গাঁয়ে জগদীশবাবুর বাড়িতেও এক চিঠি গিয়ে হাজির। সেই চিঠিতে লেখা—

মহাশয়,

কালু ডাকাতের সর্বনাশের জন্য আপনারা দায়ী। তাহার শাস্তি গ্রহণের জন্য তৈরি থাকুন। আপনার ছেলের বিবাহ ভুবনহাটির অনাদিবাবুর মেয়ের সঙ্গে। সেখানে আপনারা নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে যাইবেন। আমারও সেখানে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সাক্ষাতে পরিচয় হইবে।

ইতি—

লালু ডাকাত।

পুনশ্চঃ—কালু ডাকাতের দল আপনার বাড়ি হইতে পনের বৎসর পূর্বে যে ধনসম্পত্তি লইয়া গিয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আমাদের অর্থের প্রয়োজন। তবে বিশ্বাস করুন এই অর্থের বেশি অংশই গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। দয়া করিয়া কিছু বেশি অর্থ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

লালু।

চিঠি পড়ে জগদীশবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর গায়ের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল।

পনের বছর আগে যে বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেছে তার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও মন থেকে মুছে যায় নি। তাঁর ছেলে কালু সর্দারকে ঘায়েল করেছিল। রক্তে ভরে গিয়েছিল বাড়ির উঠোন। অবশ্য কালু সর্দারকে বন্দী করেও কোন লাভ হয় নি। পুলিসের হাত থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর কি হয়েছিল তা কেউ জানে না। আর কোন খবর পাওয়া যায় নি সেই কালু সর্দারের।

সেই কালু সর্দারের সঙ্গে এই লালু সর্দারের কি সম্পর্ক?

কে এই লালু ডাকাত?

জগদীশবাবুর বড় ছেলে মহীতোষ চিঠিটা দেখে বলল—বাবা, তুমি এত ভয় করছ কেন? সেবার কালু সর্দারকে খোঁড়া করেছিলাম, এবার লালু সর্দারকে একেবারে খতম করব।

জগদীশবাবুর মনের ভয় তবু কাটল না। তিনি চিঠিটা পেয়েই চলে গেলেন ভুবনহাটি, ছেলের ভাবী শ্বশুর অনাদিনাথ মিত্রের বাড়ি।

তাঁর মেজো ছেলে পরিতোষের সঙ্গে অনাদিবাবুর মেয়ে কাজললতার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

অসময়ে ও অতর্কিত ভাবে জগদীশবাবুর আগমনে অনাদিবাবু বিস্মিত হলেন। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার! আপনি—

জগদীশবাবু জবাব দিলেন—ব্যাপার বড় গুরুতর!

চিঠিটা দেখেই অনাদিবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এ কি ব্যাপার? তাঁর কাছেও যে একই ধরনের চিঠি এসেছে। সেই চিঠিখানাও বের করে দেখালেন অনাদিবাবু।

সেই চিঠি দেখে জগদীশবাবুও অবাক।

কি অদ্ভুত ব্যাপার! লালু ডাকাত এত খোঁজ খবর রাখে?

বাউলের বেশে সব নিজেই দেখেশুনে যেতে এসেছিল—কি আশ্চর্য! সে কথা ভাবতে গিয়ে আরও অবাক হয়ে গেলেন দু'জনে।

এখন বিপদ দু'জনেরই মাথার উপরে। বিষম বিপদ! কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে এই বিপদ থেকে—দু'জনে তাই পরামর্শ করতে বসলেন।

অনাদিবাবু বললেন—সেদিন আমার লাঠিয়ালরা সবাই তৈরি হয়ে থাকবে। দরকার হলে আরও লাঠিয়াল যোগাড় করব।

—কেন, থানা থেকে পুলিস আনাবেন না? জিজ্ঞেস করলেন জগদীশবাবু।

—সে কথাও অবশ্য ভাবছি। কিন্তু আমার স্ত্রীর ইচ্ছা নয় পুলিস আনি। তা'ছাড়া দেখেছেন তো চিঠিতে লালু ডাকাত পুলিসের ব্যবস্থা করতে নিষেধ করেছে।

—সে তো নিষেধ করবেই। পুলিস না এলেই তো সুবিধা।

—কিন্তু আমার স্ত্রী বলছে কি জানেন? সে বলছে লালু ডাকাত আমাকে মা বলে ডেকেছে, তারপরেও কি আমাদের কোন ক্ষতি করবে?

সে কথা শুনে অতি দুঃখেও জগদীশবাবু হেসে উঠলেন। বললেন—মেয়েদের সত্যি বড় কোমল মন। কিন্তু তাদের ঐ বুদ্ধি নিয়ে চললে

কি আমাদের চলে ? পুলিসের ব্যবস্থা আপনি করুন। চলুন আমরা দু'জনেই থানায় গিয়ে বড় দারোগাকে ব্যাপারটা জানিয়ে আসি।

অগত্যা তাই স্থির হল। দু'জনেই নবাবগঞ্জ থানায় গিয়ে হাজির হলেন। তারিণী চক্রবর্তী তখন অন্য থানায় বদলী হয়ে গেছেন। তাঁর বদলে এসেছেন রাজকুমার পাণ্ডা। তিনি তারিণী চক্রবর্তীর চেয়েও শাঁসালো মানুষ।

রাজকুমার পাণ্ডা সব কিছু শুনলেন এবং চিঠি দু'টিও দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—বলুন আমি কি করতে পারি ?

জগদীশবাবু এবং অনাদিবাবু দু'জনেই বললেন—বিয়ের দিনে বন্দুকধারী পুলিস দিন।

রাজকুমার পাণ্ডা একটু ভেবে বললেন—শুনুন, পুলিস দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে পুলিস গেলে সেদিন লালু ডাকাত আসবে না। সে অন্যদিন অতর্কিতে এসে হাজির হবে।

—তবে কি করা যায় বলুন তো ? হতাশার ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলেন অনাদিবাবু।

রাজকুমার পাণ্ডা বললেন—সেদিন পুলিসরা ছদ্মবেশে যাবে। আপনাদের বাড়িতে তারা থাকবে না। তারা থাকবে অন্য কোন বাড়িতে। তা হলেই লালু ডাকাতকে ধরতে আমাদের সুবিধা হবে।

জগদীশবাবু বললেন—লালু ডাকাতকে শায়েস্তা করতেই আমরা চাই। ওর স্পর্ধা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর ওকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

পাণ্ডা বললেন—তা তো নিশ্চয়ই। চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে লালু ডাকাত কালু ডাকাতেরই ছেলে। নইলে কালু ডাকাতের শাস্তির প্রতিশোধ ও নিতে চায় কেন ?

অনাদিবাবু বললেন—তা হতে পারে। নামেও তো মিল রয়েছে খুব। জগদীশবাবু তো কালু ডাকাতকে দেখেছেন। ওঁর কাছ

থেকে কালু ডাকাতের চেহারার যা বর্ণনা শুনলাম তাতে কিন্তু লালু ডাকাতকে ওর ছেলে বলে মনে হয় না। দু'জনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

রাজকুমার পাণ্ডা বললেন—ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। যাহোক আর কিছুদিনের মধ্যেই রহস্যের অবসান ঘটবে। লালু ডাকাতকে আমরা ধরবই। ওর মৃত্যুদিন ঘনিয়ে এসেছে। নইলে এমন করে আপনাদের দু'জনের কাছেই চিঠি দেবার দুর্মতি ওর হবে কেন? ও ভেবেছে পুলিশের কোন ক্ষমতা নেই, কোন বুদ্ধি নেই।

জগদীশবাবু বললেন—আমার ছেলে তো কালু ডাকাতকে ঘায়েল করেছিল। এবার বলছে লালু ডাকাতকেও রেহাই দেবে না। ও তো ভয়ানক ক্ষেপে আছে।

রাজকুমার পাণ্ডা বললেন—তবে আমাদের কাছে যা খবরাখবর আসছে তাতে মনে হয় কালু ডাকাতের চেয়ে লালু ডাকাত বেশি চালাক, তার আচার ব্যবহারও আলাদা। ডাকাতি করার টাকা-পয়সা নাকি সে গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দেয়।

জগদীশবাবু বললেন—আমার কাছে চিঠিতেও তো তাই লিখেছে। কিন্তু যে ডাকাত তাকে ডাকাত ছাড়া কি বলব?

রাজকুমার পাণ্ডা বললেন—তা তো নিশ্চয়ই। বেশ, আপনারা যান। আমি সেই বিয়ের তারিখে সন্ধ্যার দিকেই পুলিস পাঠিয়ে দেব। তবে তারা ছদ্মবেশে যাবে। সঙ্গে বন্দুক থাকবে অবশ্য। শুনুন অনাদিবাবু, ওদের আপনাদের বাড়িতে রাখবেন না। আপনার বাড়ির কাছাকাছি কোন বাড়িতে রাখবেন। গাঁয়ের লোকেরাও যেন টের না পায় যে পুলিস এসেছে। শুধু প্রয়োজনের সময় পুলিসের পোশাক পরে আপনার বাড়িতে ঢুকবে।

অনাদিবাবু বললেন—বেশ, তাই হবে। আচ্ছা এখন আসি, নমস্কার।

নমস্কার জানিয়ে দু' জনেই চলে গেলেন।



আট

লালু ডাকাত!

কালু ডাকাতের নাম যেমন এককালে মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত, পনের বছর বাদে তেমনি ত্রাসের সঞ্চার করছে লালু ডাকাতের নাম।

সবাই বলে লালু বয়সে ছোট হলে হবে কি, কালু ডাকাতের চেয়ে সে পাকা ডাকাত। বুদ্ধিতেও পাকা। ডাকাতি করবার আগে ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে ডাকাতি করে। গুপ্তচর পাঠায় নানা জায়গায়। বহুরূপী সেজে সে নিজেও ঘুরে বেড়ায়—ঘুরে বেড়ায় দলের লোকেরাও।

সত্যি, আশ্চর্য মানুষ লালু ডাকাত!

লোকে যেমন ভয় করে, তেমনি আবার ভালও বাসে। গরীব দুঃখী লোকের ভয়ানক উপকার করে সে।

কিন্তু কৃপণ ধনী লোকদের সে ক্ষমা করে না। তাদের উপর নির্দয় ভাবে অত্যাচার করে—তাদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেয়।

রহস্যময় ডাকাত লালু।

পুলিস চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারছে না। সাধারণ মানুষ তাকে চিনতে পারলেও ধরিয়ে দেয় না।

ধনী লোকের ত্রাস—গরীব লোকের বন্ধু লালু ডাকাত।

ধনী লোকের ত্রাস······

তাই ভয়ে কাঁপছেন অনাদি মিত্র আর জগদীশ রায়। পুলিস,

লাঠিয়াল আর বন্দুক থাকা সত্ত্বেও মন থেকে ভয়কে দূর করতে পারছেন না। একজন ভুবনহাঁটিতে বসে ভাবছেন কেমন করে লালু ডাকাতের হাত থেকে মুক্তি পাবেন আর একজন কমলপুরে বসে ভাবছেন কেমন করে জব্দ করবেন শয়তান ডাকাতকে।

দু'জনেই বসে বসে নানা উপায় চিন্তা করছেন। বিয়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে আনন্দের বদলে দুশ্চিন্তাই তাঁদের মনকে ছেয়ে ফেলছে বেশি করে।

দেখতে দেখতে দিন ঘনিয়ে এল।

আজ পাঁচ তারিখ।

বিয়ের লগ্ন রাত দশটায়। তাই অনাদিবাবুর মনে দুর্ভাবনা একটু বেশি। সন্ধ্যার দিকে লগ্ন হলেই ভাল হত, ঝামেলা চুকে যেত। পণ্ডিত ও পুরুতরা পাঁজি দেখে রাত দশটার আগে কোন লগ্ন স্থির করতে পারেন নি।

জগদীশবাবু বরযাত্রীর দল নিয়ে যাত্রার শুভক্ষণ দেখে বিকেলের একটু আগেই রওনা হলেন। চার ক্রোশ পথ যেতে সময় লাগবে কম নয়। যাত্রার শুভক্ষণ পেলে আর একটু আগেই রওনা হতে পারতেন।

জগদীশবাবুর বড় ছেলে মহীতোষ কিন্তু খুব বেশি আগে যাবার পক্ষপাতী নয়। বরযাত্রীদলের খুব আগে যাওয়ার মানে কনের বাড়িতে ঝঞ্ঝাট বাঁধানো। তা'ছাড়া বিয়ে তো রাত দশটায়। সন্ধ্যার মুখে পৌঁছতে পারলেই হল।

সেখানে গিয়ে যদি ডাকাতদলের সম্মুখীন হতে হয় সেজন্য প্রস্তুত হয়েই যাত্রা করেছেন তাঁরা। দুটো পালকি যাচ্ছে, একটি পালকিতে জগদীশবাবু ও তাঁর জমিদারী সেরেস্তার বৃদ্ধ সরকার। তাঁর হাতে টাকার থলি ও পুত্রবধূকে উপহার দেওয়ার জন্য কিছু সোনার অলঙ্কার। অপর পালকিতে আছে বরবেশে মেজো ছেলে পরিতোষ

ও বন্দুক হাতে নিয়ে মহীতোষ। অন্যান্য সব লোকেরা যাচ্ছে পায়ে হেঁটে।

বরযাত্রী প্রায় ষাট জন। এই বিরাট দলে বালক যুবক বৃদ্ধ সবই আছে। সবাই চলেছে দল বেঁধে হেঁটে। কেউ এগিয়ে যাচ্ছে কেউ পিছিয়ে পড়ছে। সমানতালে চলা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। পালকির বেহারারাও হাঁপিয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। তাই কিছুদূর গিয়েই পালকির বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে তারা বিশ্রাম করছে। সেই সুযোগে পায়ে হাঁটার দল এগিয়ে এসে আবার মিলিত হতে পারছে এক সঙ্গে।

এভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বরযাত্রীর দল।

সন্ধ্যাও ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে।

একটি গাঁয়ের পাশ দিয়ে যেতেই তারা দেখতে পেল ডুলি নিয়ে আরও একটি দল এগিয়ে চলেছে। সেই দলে প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন লোক।

তাদের সাজপোশাক ও আদব কায়দা দেখেই বোঝা গেল, তারা নিম্নশ্রেণীর লোক।

জমিদারবাবুর দলের একজন বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা যাচ্ছেন কোথায়? বরযাত্রী বুঝি?

সেই দলের একজন জবাব দিল—হ্যাঁ, আমরাও বরযাত্রী।

—যাচ্ছেন কোথায়?

—কদমহাটি।

ভুবনহাটির পাশের গ্রাম কদমহাটি! যাতায়াতের এই একটিই পথ। কাজেই দুই দলই চলতে লাগল পাশাপাশি।

জগদীশবাবু একটু নিশ্চিন্ত হলেন। যাক্, ভাল একদল সঙ্গী পাওয়া গেল।

গ্রামের সীমানা শেষ হতেই শুরু হল মাঠের পথ। মাঠ ছাড়িয়ে জঙ্গল। এক পাশে জঙ্গল আর এক পাশে ধানের ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে চলার পথ।

সেই পথে যখন ছুটো বরযাত্রীর দল এসে পৌঁছল তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। জঙ্গলের পাশ থেকে শোনা যাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক।

নতুন বরযাত্রী দলের ডুলিটা জগদীশবাবুর পালকির সঙ্গে সমান তালেই চলেছে! ডুলির মুখ ঢাকা। ভিতরে বসে আছে বর। মাঝে মাঝে সামান্য একটু পরদা সরিয়ে বর কি যেন দেখছে।

একটু পরে ডুলির চলার গতি যেন আরও বেড়ে গেল! চলতে লাগল জমিদার দলের বরের পালকির পাশাপাশি।

একবার এগিয়ে পড়ে, একবার পেছিয়ে পড়ে, আবার চলতে থাকে পাশাপাশি। মাঝে মাঝে পরদাটা একটু খুলে যায়, আবার যায় বন্ধ হয়ে।

হঠাৎ পরদাটা একেবারেই খুলে গেল। ডুলি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছ'জন অস্ত্রধারী লোক। তাড়াতাড়ি পালকির সামনে এসেই বেহারাদের ধাক্কা মারল। ঠিক তখনই ডুলির ভেতর থেকে অস্ত্র নিয়ে লাফিয়ে পড়ল আরও ছ'জন লোক। বেহারারা অতর্কিত আক্রমণে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। বুঝতে পারল তারা ডাকাতের হাতে পড়েছে। ভয়ে তারা পালকি ফেলে দিয়েই পালিয়ে গেল।

পালাবার সময় তাদের মুখ থেকে শোনা গেল—ওরে বাবারে! ডাকাত—ডাকাত!

পাশেই জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভিতরে গিয়েই লুকিয়ে পড়ল তারা।

পালকির ভেতর ছিল বরবেশে পরিতোষ ও বন্দুক হাতে মহীতোষ! পালকিটা আচমকা পড়ে যাওয়াতে তারা ছ'জনেই পালকির ভেতরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদেরও কানে গেল ডাকাত—ডাকাত শব্দ—

কিন্তু কিছু করবার আর সময় তারা পেল না। অস্ত্রধারী ছ'জন লোক তাড়াতাড়ি মহীতোষকে বেঁধে ফেলে হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল। আর একজন লোক বরকেও বেঁধে ফেলল।

কয়েকটি লোক এগিয়ে গেল অন্য পালকিটার দিকে।

সেই পালকিতে আছেন জগদীশবাবু ও তাঁর সেরেস্তার সরকার। এদিকে বরযাত্রীদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটেছে তা জগদীশবাবু ও তাঁর সরকার বুঝতে পেরেছেন। ভয়ে কাঁপছেন তাঁরা।

জগদীশবাবু তাকিয়ে দেখলেন তাঁর সামনে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর যুবক। তাঁর বুঝতে আর বাকী রইল না কিশোর যুবকটি আর কেউ নয়—লালু ডাকাত!

লালু বলল—কি জমিদারবাবু, চিঠি পেয়েছিলেন তো? আমাদের জন্য কি এনেছেন, দিন।

জগদীশবাবু সোনার বাক্সটা লুকোতে চেষ্টা করলেন, আর সরকার লুকোতে চেষ্টা করলেন টাকার থলিটা।

লালুর তা চোখ এড়াল না। সে বলল—লুকোচ্ছেন কেন? আমাদের জন্যই তো এনেছেন। দিন।

ওধার থেকে দু'জন ডাকাত এসে সোনার বাক্স আর টাকার তোড়াটা কেড়ে নিল।

জগদীশবাবু আর সরকার অসহায়ের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কোন কিছু করবার ক্ষমতাই যে আর তাঁদের নেই।

এদিকে ডাকাতদের ডুলি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। অস্ত্র হাতে যারা আছে তারাও দেখতে দেখতে জঙ্গলের ভেতর মিলিয়ে গেল।

লালু ডাকাত জগদীশবাবুকে বলল—ধন্যবাদ। এখন আসি। আপনাদের সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়েতে যেতে পারলাম না সে জন্য দুঃখিত।

লালু তার অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ল। কোন হদিস তাদের পাওয়া গেল না।

বরযাত্রীর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ডাকাতদের ভয়ে কেউ ক্ষেতের ভেতর কেউ জঙ্গলের ভেতর গিয়ে পালিয়েছিল। এবার ডাকাতদল চলে গিয়েছে জানতে পেরে সবাই এগিয়ে এল।

কেউ কেউ বীরত্ব জাহির করতে লাগল—ইস্, হাতে যদি একটা লাঠি থাকত তা হলে—

কেউ কেউ বলল—লাঠি খুঁজতেই তো আমরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকেছিলাম।

জগদীশবাবু তাদের ধমক দিয়ে বললেন—থাক্, আর কথা বলতে হবে না। কার কি রকম বীরত্ব আছে সব জানা গেছে! এখন মহীতোষ আর পরিতোষের বাঁধন খুলবার চেষ্টা করো।

সবাই তখন হাতাহাতি করে মহীতোষ আর পরিতোষকে বাঁধন থেকে মুক্ত করল। তারপর আবার সবাই যাত্রা করল ভুবনহাটির দিকে।

কত আনন্দ নিয়েই না জগদীশবাবু ছেলের বিয়ের উৎসবে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সব আনন্দ তাঁর মাটি হয়ে গেল।

পুত্রবধূকে উপহার দেবার জন্য সোনার অলঙ্কার আর খরচপত্রের জন্য টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছিলেন। লালু ডাকাত সব লুঠ করে নিয়ে গেল। এখন রিক্ত হস্তেই তাঁকে যেতে হচ্ছে নতুন বেয়াই-বাড়িতে। হায়রে, কি অদৃষ্ট!

কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক হয়ে গেলেন জগদীশবাবু লালু ডাকাতের কাণ্ড দেখে! কি তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি আর কি আশ্চর্য তার ক্রিয়া কৌশল।

এ যুগে এমন ডাকাত সত্যি দেখা যায় না।

বাহাদুর বটে লালু ডাকাত!

জগদীশবাবু দলবল নিয়ে যখন ভুবনহাটিতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়েছে। অনাদিবাবু বরযাত্রীদের পৌঁছতে বিলম্ব

হচ্ছে বলে ছটফট করছিলেন। অনেক কিছু আশঙ্কাও করছিলেন নানা কথা ভেবে।

অনাদিবাবু মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না।

বরযাত্রীর দল এসে পৌঁছতে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু জগদীশবাবুর মুখে যখন সব কিছু শুনতে পেলেন তখন তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কি আশ্চর্য ক্ষমতা লালু ডাকাতের। সে তার কথামত সব কাজ করছে! এই বাড়িতেও নিশ্চয় এসে হাজির হবে সে। তখন কি অবস্থা হবে কে জানে?

থানা থেকে পুলিসদল এসে পৌঁছল না। অথচ সন্ধ্যার ঠিক পরেই তাদের এসে যাবার কথা।

ছটফট করতে লাগলেন অনাদিবাবু। পথে লোক পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। রাত প্রায় নয়টা বাজতে চলল অথচ পুলিসের দেখা নেই। ভয়ে ও হতাশায় ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে লাগলেন অনাদিবাবু।

কেউ কেউ বলতে লাগল—পুলিসদের ব্যাপার-স্যাপারই এই রকম। কাজের সময় আসবে না। চোর পালালে আসবে।

অনাদিবাবু বললেন—এত করে থানায় গিয়ে নিজে বলে এলাম তবু তারা কথা রাখল না, এটাই আশ্চর্যের কথা।

কিন্তু তিনি তো জানেন না, পুলিসদল আজ সারা রাতের মধ্যেও এসে পৌঁছবে না ভুবনহাটিতে।

ওদিকেও এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটছে!

হু'জন বন্দুকধারী পুলিস ও হু'জন সাধারণ পুলিস যথাসময়েই নবাবগঞ্জ থানা থেকে রওনা হয়েছিল।

শিয়ালমারীর জঙ্গলের পাশ দিয়ে যখন আসছিল তখনই তারা দেখতে পেল কয়েকজন লোক একটি চোরকে ধরে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে।

পুলিসদল কাছে আসতেই লোকগুলি চেঁচিয়ে উঠল—চোর—চোর পালাল, পালাল—

ঠিক সেই সময়েই তাদের হাত থেকে চোরটি ছিটকে পালিয়ে ঢুকল জঙ্গলের মধ্যে। পুলিসরা চোর ধরবার জন্য পেছনে পেছনে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

সেখানে লুকিয়ে ছিল কয়েকজন সশস্ত্র লোক। তারা পুলিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ল পুলিসদল। তারপর যখন তারা অবস্থা কিছুটা বুঝতে পারল তখন তাদের দু'টি বন্দুকই ডাকাতদলের হাতে চলে গিয়েছে।

চারজন পুলিসকে ডাকাতেরা চারটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলল তারপর তাদের মুখও এমন করে বেঁধে ফেলল যাতে তারা চীৎকার করতে না পারে।

সারারাতের মত পুলিসরা বন্দী হয়ে রইল শিয়ালমারীর জঙ্গলে। পরদিন থানা থেকে খোঁজ খবর করে খুঁজে বের না করলে তাদের মুক্তি পাবার কোন উপায় রইল না।

অনাদি মিত্র আর জগদীশ রায় ওদিকে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছেন পুলিসদের জন্য ; পুলিসরা এদিকে তখন জঙ্গলে অসহায়ভাবে মশার কামড় খাচ্ছে।

বিয়ের লগ্ন এসে গেল! আর দেরী করা চলে না। এ লগ্নে বিয়ে না হলে রাত চারটার আগে আর লগ্ন নেই। তাই তাড়াহুড়া লেগে গেল বিয়ে বাড়িতে।

শুভ কাজ শুরু হল।

অথচ সবই যেন প্রাণহীন। বর ও বধূ এসে বসল বিয়ের আসনে অথচ বরের বাবা ও কনের বাবা কারুর মনেই কোন শান্তি নেই।

সানাই বাজছে নহবতখানায়, বাজনা বাজছে মধুর সুরে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই তাঁদের। তাঁরা চোখ ও কানকে সজাগ করে রেখেছেন বাইরের দিকে। লাঠিয়ালরা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে।

বিয়ে হয়ে গেল।

হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে অনাদিবাবু বললেন—কি আশ্চর্য! থানা থেকে পুলিস এল না। আমাদের এত বিপদ জেনেও এমন কথার খেলাপ করল তারা।

জগদীশবাবু কথা বলার কোন উৎসাহই পাচ্ছিলেন না। তিনি বিরস বদনে শুধু বললেন—পুলিসদের কথা ছেড়ে দিন।

নিমন্ত্রিত লোকদের খাওয়া দাওয়া চলেছে বাইরের মহলে এক তলায়। সেদিকে গিয়ে তদ্বির তদারক করার মত মনের উৎসাহ কারুর নেই। অনাদিবাবুরও নয়, জগদীশবাবুরও নয়। তাঁরা অনাগত এক বিপদের আশঙ্কায় অজানা প্রহর গুণছেন!

অনাদিবাবু নিজের বন্দুকটাকে খুব সাবধানে রেখে দিয়েছেন, যাতে ওটা ডাকাতের হাতে না পড়ে।

নিমন্ত্রিত লোকদের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। ধীরে ধীরে বাড়ির হৈ হট্টগোলও কমতে লাগল।

রাত বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে।

বাইরের মহলে একটি ঘরে তু'টি আরাম কেদারায় অনাদিবাবু ও জগদীশবাবু বসে রইলেন চুপচাপ। বসে বসেই অনাদিবাবু খোঁজ নিলেন লাঠিয়ালরা ঠিক মত পাহারা দিচ্ছে কিনা।

জগদীশবাবুর সঙ্গে তু'চারটি কথা বললেন, আবার চুপচাপ রইলেন। কিছুই যেন ভাল লাগছে না।

ঢুলুনি এল তু'জনের চোখেই।

সারাদিনের উদ্বেগ ও ক্লান্তিতে ভয়ানক অবসন্ন হয়ে পড়েছে তাঁদের শরীর।

তখন রাত বোধ হয় বারোটা বেজে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছে সারা গ্রাম। শুধু এই জমিদার বাড়িটাই জাগ্রত অথচ নিথর পাষাণের মত দাঁড়িয়ে আছে।

দূরে গাছের ডালে ডাকছে কোন রাতজাগা পাখী!

হঠাৎ বাড়িটা যেন সচকিত হয়ে উঠল।

চাপা আওয়াজ উঠল—ডাকাত এসেছে—ডাকাত!

তন্দ্রা ছুটে গেল অনাদিবাবু ও জগদীশবাবু দু'জনের চোখ থেকে। তাঁরা চমকে উঠলেন।

কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না। দিশেহারার মতই দু'জন বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

লালু ডাকাত তখন দোতলার সিঁড়ি বেয়ে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে বাসর ঘরে। সেখানে বর কনে বসে আছে আর আছে কনের বন্ধু ও বাড়ির অনেক মেয়েরা।

লালু ডাকাত সে ঘরে ঢুকতেই মেয়েরা আর্তনাদ করে ছুটোছুটি করতে লাগল। কিন্তু সব দরজার সামনেই তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে ডাকাত দলের লোকেরা।

তারা বলে উঠল—কেউ পালাতে চেষ্টা করবেন না, তা' হলে বিপদ হবে।

কেউ আর পালাতে পারল না।

ডাকাতরা বলল—যার গায়ে যা সোনার গয়না আছে সব খুলে দিয়ে দিন। কেউ কিছু লুকোতে চেষ্টা করবেন না।

কান্নার রোল পড়ে গেল ঘরের মধ্যে।

এমন সময় অন্য একটি ঘর থেকে বেরিয়ে সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন ভবানী দেবী।

ভয়ে তাঁর বুক কাঁপলেও তিনি স্থির ভাবে এসে দাঁড়ালেন। লালু ডাকাতের দিকে তাকিয়েই তাকে চিনতে পারলেন। ডাকলেন—বাবা ভক্তদাস!

লালু চমকে উঠল। ফিরে তাকাল ভবানী দেবীর দিকে। কি মোহিনী শক্তি ছিল সেই ডাকে! লালুর মাথা নত হয়ে গেল। বলল—মা!

ভবানী দেবী বললেন—আমার এই একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে, এই

আনন্দটাকে নষ্ট করে দিও না বাবা। এরা অনেকেই আমার বাড়িতে অতিথি, এদের সোনার গয়না কেড়ে নিও না। কত সোনা চাও, টাকা চাও—এসো, আমি তোমাকে দিচ্ছি।

লালু তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভবানী দেবী ডাকলেন লালুকে! লালু মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে ঢুকল আর একটি ঘরে।

বড় একটি ঘর। নানা মূল্যবান আসবাবে সাজানো।

ঘরের একপাশে রাখা একটি আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন ভবানী দেবী। আঁচল থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন। খুলতে খুলতে বললেন—তোমাকে আমি আমার মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম বাবা। তুমি এসেছ, খুব খুশী হয়েছি!

এমন সময় লালুর চোখ পড়ল ঘরের দেওয়ালে দু'টি ছবির দিকে। পাশাপাশি দু'টি ছবি—একটি ছেলের আর একটি মেয়ের।

লালু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

ভবানী দেবী তা লক্ষ্য করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—ওটা কি দেখছ বাবা? ওদিকে তাকালে আমার বুকটা ভেঙে যায়!

—কেন মা? লালু জিজ্ঞেস করল।

ভবানী দেবী বললেন—ঐ যে মেয়েটির ছবি দেখছ ওটা আমার মেয়ে কাজল। ওরই তো বিয়ে হচ্ছে আজ। আর ঐ যে পাশের ছবিটা দেখছো ওটা আমার ছেলে বাবলু—

—বাবলু!

—হ্যাঁ! বাবলু আজ বেঁচে থাকলে তোমার মতই হতো। তোমার মতই চেহারা ছিল তার! দেখ তো, তোমার চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার কত মিল। আমার মেয়ের চেহারার সঙ্গেও তো তোমার চেহারার বেশ মিল রয়েছে। সাধে কি তোমাকে আমি ছেলে বলে ডেকেছি।

—সেই বাবলু কোথায় মা? রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করল

লালু ডাকাত।

সে ছোটবেলায় জলে ডুবে মরেছে। নৌকায় বেড়াতে যাচ্ছিলাম, ঝড়ে নৌকা উলটে গিয়েছিল। আমাদের বুক থেকে ছিটকে চলে গেছে বাবলু।

কান্নায় বুঝি রুদ্ধ হয়ে আসছিল ভবানী দেবীর গলা। তাই থেমে থেমে বললেন—আমরা কোন রকমে বাঁচলাম। কিন্তু বাবলুকে বাঁচাতে পারলাম না। বাবলু—

—বাবলু!—বা—ব—লু···অনেক দিনের একটা ভুলে যাওয়া ডাক যেন ঘুরে ফিরে বাজতে লাগল লালুর কানের কাছে। বাবলু—বাবলু ডাক যেন কোথায় শুনেছে সে! কোথায়?

ভবানী দেবী তখন এগিয়ে গিয়েছেন আলমারির দিকে, আলমারিটা খুলে ফেলেছেন। সোনা ভরতি একটি বাক্স লালুর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন—নাও বাবা, নাও, সব সোনাই তুমি নিয়ে যাও। ঘরের আসল সোনাই আমার চলে গেছে—এই নকল সোনা দিয়ে কি করবো আমি!

লালু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনের ভেতরটা যেন তোলপাড় করে উঠল তার। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল জল। বলল—না মা, আমি সোনা চাই না। কি করব সোনা দিয়ে? আমি আমার মাকে পেয়েছি।

লালু প্রণাম করল ভবানী দেবীকে।

ভবানী দেবী তাকে টেনে তুললেন। কিন্তু টেনে তুলতে গিয়ে চমকে উঠলেন লালুর ডান হাতের কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে। তার হাতকাটা জামার তলায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডান হাতের কনুইয়ে পোড়ার দাগ। ছোটবেলায় গরম দুধে পুড়ে গিয়েছিল বাবলুর ঠিক ঐ জায়গাটা।

ভবানী দেবী চীৎকার করে বললেন—ওটা কি! ওটা কি! ঐ তো ডান হাতের কনুইয়ে পোড়া দাগ। ওরে, তুই যে আমার বাবলু

—আমার বাবলু—

ভবানী দেবী লালুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

লালু হতভম্ব। তার দলের লোকেরাও হতভম্ব হয়ে গেল। তারা ডাকতে লাগল—সর্দার—সর্দার—তাড়াতাড়ি এসো—

লালু বলল—চুপ করো।

ওদিকে দু'জন লাঠিয়াল নিয়ে অনাদিবাবু এসে হাজির হলেন। হাতে তাঁর বন্দুক। অন্যান্য লাঠিয়ালদের তিনি ধারে কাছে খুঁজে পাননি। পুলিসদের কাছ থেকে পাওয়া বন্দুক নিয়ে ডাকাতরা লাঠিয়ালদের কাবু করে রেখেছে।

—কোথায় লালু ডাকাত! জোরে হেঁকে উঠলেন অনাদিবাবু।

কিন্তু ডাকাতদের ভাব-ভঙ্গী দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। হাতে বন্দুক নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি জোয়ান ডাকাত। মেয়েদের কান্নাকাটিও বন্ধ হয়ে গেছে।

ডাকাতের হাত ধরে দাড়িয়ে আছেন ভবানী দেবী। কি ব্যাপার!

ভবানী দেবী ডাকলেন অনাদিবাবুকে। তাঁর মনে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। বললেন—এসো, এদিকে এসো—আমাদের বাবলু ফিরে এসেছে। আমাকে মা বলে ডেকেছে। এই যে আমাদের বাবলু—

এগিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন অনাদিবাবু। কোথায় বাবলু! এ যে লালু ডাকাত! তাঁর স্ত্রীকে মা বলে ডেকেছে বলেই কি ডাকাত তাঁর ছেলে হয়ে গেল? তিনি চোখ কটমট করে বললেন—ডাকাত!

ভবানী দেবী বললেন—না, ওযে আমার ছেলে—বাবলু।

চমকে উঠলেন অনাদিবাবু—বাবলু? তাঁর বাবলু আজ বাংলা-দেশের বিভীষিকা—কুখ্যাত ডাকাত! একি হতে পারে কখনো?

ভবানী দেবী বললেন—ভাল করে তাকিয়ে দেখো—আমাদের বাবলুর সঙ্গে ওর চেহারার কত মিল! ঐ যে ডান হাতের পোড়া দাগ—সেটা পর্যন্ত!

অনাদিবাবুও কিছু বুঝতে পারছিলেন না। অবাক হয়ে তাকালেন বাবলুর ছেলেবেলাকার ছবির দিকে আর লালু ডাকাতের দিকে। সত্যি তো—সেই নাক—সেই মুখ—সেই চোখ। আর ঐ যে কনুইর পোড়ার দাগটা—

বন্দুকটা অনাদিবাবুর হাত থেকে পড়ে গেল। আর সেটা তুলবার চেষ্টা করলেন না। চীৎকার করে বলে উঠলেন—ওরে, জ্যোতিষীর কথা সত্যি হয়েছে। জ্যোতিষী বলেছিল, বাবলু বেঁচে আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। তুই বাবলু—তুই আমাদের হারানো মানিক বাবলু—

লালুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে গেলেন অনাদিবাবু। কিন্তু সে পেছন দিকে সরে গেল।

লালুর দু'চোখ ছেপে জল এল। কাঁদতে কাঁদতে বলল—না না, মিথ্যা কথা। আমি বাবলু নই—আমি লালু ডাকাত। আমার বাবা যে এখনো বেঁচে আছে লাথীর জঙ্গলে—আমার বাবা—

লালু ছুটে পালাতে গেল। এমন সময় তার সামনে এসে দাঁড়াল কনে বেশধারিণী কাজল। বলল—দাদা!

লালু থমকে দাঁড়াল।

কাজল বলল—দাদা, আমার বিয়েতে আশীর্বাদ করবে না?

লালু তাকিয়ে দেখল তারই মত চেহারা—তারই মত চোখ ও মুখের ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে।

লালু ইসারায় ডাক দিল তার সঙ্গী বাচ্চুকে। কাছে এসে দাঁড়াতেই লালু বাচ্চুর কাঁধের ঝোলা থেকে বের করল একটা বাক্স। বাক্সটা লালু তুলে দিল কাজলের হাতে। বলল—এই নাও, তোমারই জিনিস তোমাকে দিলাম।

এদিকে জগদীশবাবু ও তাঁর বড় ছেলে দু'টি লাঠি হাতে নিয়ে উঠে এসেছিলেন দোতলায়। কাজলের হাতে বাক্সটা দেখে জগদীশবাবু বললেন—ঐ যে, ঐ বাক্সটা আমার কাছ থেকে ডাকাতরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। ওটাই তো বৌমার জন্য এনেছিলাম।

বাচ্চু বলল—যার জিনিস সে-ই ফেরত পেয়েছে কর্তা। এখন আর ভাবনা কি ?

লালু বলল—আমরা এখন যাই।

চলে যাবার জন্য সে পা বাড়াল, কাজল তাকে ধরে ফেলে বলল—দাদা, কোথায় যাবে তুমি !

লালু বলল—আমাকে যেতে দাও। আমি কারুর দাদা নই। আমার বাবা রয়েছে লাখীর জঙ্গলে।

ডাকাতের দলের যার হাতে বন্দুক ছিল, তার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে মহীতোষের হাতে দিয়ে লালু বলল—এই নিন, আপনার বন্দুক, এই বন্দুক দিয়েই আপনি আমার বাবাকে মেরেছিলেন। তাই বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে তার প্রতিশোধ নিলাম মাত্র।

লালু ছুটে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সব ডাকাতরাও চলে গেল বাড়ি ছেড়ে।

মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা ঝড় নেমে গেল।

বন্দুক আর লাঠি-সোটা হাতে নিয়েও কেউ কিছু করতে পারল না। সবাই দিশেহারা—হতভম্ব !

অনাদিবাবু আর ভবানী দেবী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লালু ডাকাত দলবল নিয়ে ফিরে এল লাখীর জঙ্গলে।

তখন ভোর হয়ে গেছে। বনের ভেতর বিশালাক্ষীর মন্দিরে তখনও আবছা আলো অন্ধকার লুকোচুরি খেলছে।

কালু সর্দার ঘুমিয়ে আছে মন্দির প্রাঙ্গণে। লালু ডেকে তুলল তাকে। আচমকা ঘুম ভাঙতেই চমকে উঠল সর্দার।

—কে কে, লালু ?

—না না, আমি বাবলু। বল আমার বাবা মা কোথায় ? কোথায়

তুমি পেয়েছ আমাকে ?

কালু সর্দার থতমত খেয়ে গেল প্রশ্ন শুনে। বলল—আজ একথা কেন জিজ্ঞেস করছিস রে লালু!

—দরকার আছে। তুমি কি আমার সত্যিকার বাবা নও ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল কালু সর্দার, তারপর অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলল —না রে, আমি তোর বাবা নই। একদিন ঝড়ের রাতে নৌকা ডুবিতে তুই ভেসে যাচ্ছিলি নদীর স্রোতে, তোকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

—হয়েছে হয়েছে, আর কিছু বলতে হবে না। চীৎকার করে উঠল লালু। এই রইল অস্ত্র···ডাকাতি আর কোনদিন করব না। আমি এখনই ধরা দিতে চললাম নবাবগঞ্জের থানায়। অনেক ধন সম্পত্তি লুঠ করেছি, অনেক লোকের সর্বনাশ করেছি। আর না, আর না···

বন্দুক ফেলে রেখে লালু ছুটে চলল।

কালু সর্দার ডাকল পেছন থেকে—ওরে লালু, ফিরে আয়—ফিরে আয়—

লালু পেছন ফিরে তাকাল না। শুধু শোনা গেল তার জবাব— না—না—না—

বনের মর্মরে সেই ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরতে লাগল।

লালু ছুটে চলল ডাকাতের জঙ্গল ছেড়ে।

লাখীর জঙ্গল যেন শূন্য হয়ে গেল।

নবাবগঞ্জ থানার দিকে লক্ষ্য করেই ছুটতে লাগল লালু। হঠাৎ তার কি খেয়াল হল—চলল সে ভুবনহাটির দিকে। সেখানে রয়েছে তার সত্যিকার বাবা মা। তাদের সঙ্গে দেখা করে সে চলে যাবে নবাবগঞ্জ থানায়—সেখানে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

জীবনে বহু ধন সম্পত্তি সে লুঠ করেছে, নরহত্যাও সে করেছে। এই অপরাধে তার কঠোর সাজা হবে, তাতে কোন ভুল নেই। কাজেই

এই জীবনে বাবা মকে আর দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। তাই শেষ দেখা সে করে যাবে বাবা মায়ের সঙ্গে।

অনাদি মিত্রের বাড়ির পথটা কি ভুলে গেছে সে? কালও তো সে এখানে এসেছিল। তবে পথ ফুরাচ্ছে না কেন?

ছুটতে ছুটতে সে এল ভুবনহাটি গাঁয়ে। ঐ যে—ঐ তো দেখা যাচ্ছে অনাদি মিত্রের বাড়ি। ওটা যে তারও বাড়ি। যদি সে ডাকাত না হতো তবে তো ঐ বাড়িতেই আজ সে বাস করতে পারত ভদ্র মানুষের মত। আজ সবাই তাকে বলত জমিদারের ছেলে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আজ সে ডাকাতের ছেলে—ডাকাত।

ছুটতে ছুটতে সে জমিদারের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু একি? এত লোকজনের ভিড় কেন বাড়িতে?

শুধু লোকজনের নয়, পুলিসের ভিড়ও জমে গেছে বাড়িতে।

লালু সেদিকে খেয়াল করল না। সে ছুটে দোতলায় উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

এদিকে বাড়ির লোকেরা সচকিত হয়ে উঠল লালুকে দেখে। যারা কাল রাত্রে লালু ডাকাতকে দেখেছিল তারা চীৎকার করে উঠল—ডাকাত! ডাকাত!

পুলিসের দলও চমকে উঠল। তারা তাকাতে লাগল এদিকে ওদিকে—কোথায় ডাকাত? দিন দুপুরে ডাকাত এল বাড়িতে—ভারি তো আশ্চর্যের কথা!

লালু ডাকাত তখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেছে। সে খুঁজছে ভবানী দেবীকে—তার মাকে। কোথায় তার মা?

ভবানী দেবী তখন বসে আছেন তাঁর ঘরে। কিন্তু তিনি সুস্থ অবস্থায় নেই। কাল রাত্রে লালু ডাকাত চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। জ্ঞান হওয়ার পরই ডাকছেন—আমার বাবলু—আমার বাবলু রে—

অনেক বলে কয়েও কেউ তাঁকে শান্ত করতে পারে নি। আজ

এতটা বেলা হয়েছে—জল গ্রহণ পর্যন্ত করেননি তিনি। হারানো ছেলেকে পেয়েও তিনি আবার হারিয়েছেন এই শোক কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। বাড়ির দাসীরা পাশে বসে অনবরত তাঁর মাথায় হাওয়া করছে।

অনেকক্ষণ অজ্ঞান থাকার পর এই মাত্র তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। বার বার বিলাপ করে বলছেন—বাবলু—আমার বাবলু রে—

ঠিক সেই সময়েই লালু গিয়ে হাজির হল তাঁর ঘরের সামনে। ভবানী দেবীর ডাকে সাড়া দিয়ে বলল—মা, এই যে আমি। এই যে আমি তোমার বাবলু—

চমকে উঠল ঘরের লোকেরা। চমকে উঠলেন ভবানী দেবীও। মেয়েরা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল—ডাকাত! ডাকাত!

কিন্তু ভবানী দেবীর মনে আতঙ্কের বদলে জেগে উঠল আনন্দ। তিনি অধীর আগ্রহে বলে উঠলেন—বাবলু—আমার বাবলু—তুই এসেছিস?

—হ্যাঁ মা, এই যে এসেছি আমি। বলে লালু এগিয়ে গেল ভবানী দেবীর সামনে। তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল—আমায় বিদায় দাও মা, শেষ বারের মত আমায় বিদায় দাও।

ভবানী দেবী লালুর হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন—না, তোকে বিদায় আমি দেব না। কোথায় যাবি তুই?

লালু বলল—আমি ডাকাত—ডাকাতি করে বহু লোকের সর্বনাশ করেছি—এবার আমাকে তার শাস্তি পেতে দাও।

ভবানী দেবী বললেন—না না, তুই ডাকাত নস্। তুই আমার ছেলে।

লালু বাধা দিয়ে বলল—না আমি ডাকাত—লালু ডাকাত—

এমন সময় পুলিসের দল সেখানে এসে হাজির হল। এবার ডাকাতকে তারা হাতের মুঠোয় পেয়েছে, ছাড়বে কেন?

এই লালু ডাকাতের জন্য পুলিসদলকে কত কষ্টই না করতে

হয়েছে। আজ বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যখন পুলিসরা বিয়েবাড়ি থেকে থানায় ফিরে গেল না তখন থানার লোকদের মনে সন্দেহ হল। তখন আরও কয়েকজন পুলিসকে পাঠিয়ে দেওয়া হল খবর জানবার জন্য। তারা পথে এসে কাঠ-কুড়ানো লোকদের কাছে জানতে পারল জঙ্গলে কয়েকজন পুলিসকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

তখন কিছু বুঝতে আর বাকি রইল না। খবর পেয়ে থানার দারোগাবাবু রাজকুমার পাণ্ডা ছুটে এলেন। সেই বন্দী পুলিসদের মুক্ত করে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে চলে এলেন ভুবনহাটিতে অনাদিবাবুর বাড়ি। এসে শুনলেন ডাকাতের অদ্ভুত কাহিনী।

তদন্তের কাজ শেষ করে দারোগাবাবু বাইরের মহলের ঘরে বসে গল্প করছিলেন। সে ঘরে ছিলেন জগদীশবাবু, অনাদিবাবু এবং গ্রামের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এমন সময় হঠাৎ তাঁদের কানে এল ভয়ার্ত চীৎকার···ডাকাত এসেছে—ডাকাত!

বন্দুকটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দারোগাবাবু। অনাদিবাবু আর জগদীশবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা বিস্মিত এবং হতভম্ব। দারোগাবাবুর পেছনে তাঁরাও এগোতে লাগলেন।

—কোথায় ডাকাত—কোথায় ডাকাত—বলতে বলতে উপরে উঠে এলেন দারোগাবাবু। ভবানী দেবীর ঘরের সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একি!

ডাকাতের হাত ধরে কাঁদছেন ভবানীদেবী। ডাকাতও কাঁদছে।

দারোগাবাবু এগিয়ে গেলেন। তিনি পুলিসের লোক—আইন মেনে তাঁকে চলতেই হবে।

বন্দুকটা লালুর দিকে লক্ষ্য করে দারোগাবাবু গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকলেন—লালু ডাকাত, হাত উঠাও।

লালু ফিরে তাকাল পেছন দিকে। দেখল—তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জাঁদরেল দারোগা রাজকুমার পাণ্ডা।

লালু ভয় পেল না—হাসল একটু। মলিন সেই হাসি। তারপর বলল—বন্দুকের কোন প্রয়োজন হবে না দারোগাবাবু, আমি নিজেই ধরা দিতে এসেছি আপনাদের হাতে। আমাকে ধরে নিয়ে চলুন।

রাজকুমার পাণ্ডা দেখলেন লালু ডাকাত নিরস্ত্র। তাই বন্দুকটা পাশের পুলিশের হাতে দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, ধরবই তোমাকে। সারা দেশকে তুমি জ্বালিয়ে মারছ। এবার তোমার মৃত্যুর পালা।

নিজেই দু'হাতে ধরে ফেললেন লালুকে। তারপর একজন পুলিসকে বললেন—এর হাতে হাতকড়া লাগাও।

লালু কোনই প্রতিবাদ করল না। নীরবে হাতকড়া পরল।

রাজকুমার পাণ্ডা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন—এ যেন এক ভোজবাজীর খেলা! যাকে ধরবার জন্য পুলিসের লোকদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না—সে আজ স্বেচ্ছায় তাঁদের কাছে ধরা দিল। তাই খুশী মনেই পাণ্ডা বললেন পুলিসদের—একে নিয়ে চলো।

লালু বলল—আমাকে নিয়ে যাবার আগে বাবা মাকে একবার শেষ বারের জন্য প্রণাম করতে দিন দারোগাবাবু।

ঘরের সামনে তখন লোকে লোকারণ্য। লালু গিয়ে প্রণাম করল অনাদিবাবুকে। অনাদিবাবু লালুকে জড়িয়ে ধরলেন—কান্নায় ভরে উঠল তাঁর দু'চোখ—কোন কথা মুখ দিয়ে বেরুল না।

কিছুক্ষণ পর বললেন—ওকে কি কোনরকমেই ছেড়ে দেওয়া যায় না দারোগাবাবু? যদি আমরা ওর ভার নিই?

দারোগাবাবু বললেন—তা হয় না অনাদিবাবু। শিক্ষিত হয়ে, আপনি কেমন করে ওকথা বলছেন—আগে বিচার চলুক—তখন যা করবার আপনারা করবেন।

ভবানী দেবী ছুটে এসে রাজকুমার পাণ্ডার হাত দু'টি জড়িয়ে ধরলেন। আকুল কণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ওকে ছেড়ে দিন দারোগাবাবু, ও যে আমার ছেলে—আমার ছেলে—

দারোগাবাবু বললেন—আপনার ছেলে হলেও আইনের চোখে সে



সারা দেশকে তুমি জ্বালিয়ে মারছ, এবার তোমার মৃত্যুর পালা।

গুরুতর অপরাধী। ক্ষমা করবেন, আমাকে আমার কর্তব্য করতেই হবে।

অনাদিবাবু অশ্রু ছলছল চোখে বললেন—কিন্তু আমাদের ছেলে হাতকড়া পরে আমাদের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে এটা যে প্রাণে সইছে না দারোগাবাবু। দয়া করে ওর হাতকড়াটা খুলে দিন।

দারোগাবাবু বললেন—বেশ, তা খুলে দিচ্ছি।

তখনই তিনি পুলিসকে লালুর হাতকড়া খুলে দিতে বললেন। পুলিস আদেশ পালন করল। দারোগাবাবু বললেন লালুকে—এবার চলো।

লালু এগোতে গিয়ে একটু পিছিয়ে এসে ভবানী দেবীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। তার অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ যেন নির্বাক হয়ে গেল এবার। কিছুক্ষণ পর মুখ থেকে বের হল মাত্র কয়েকটি শব্দ—মা, মাগো—

ভবানী দেবী লালুকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—বাবলু—আমার বাবলু—

লালুর মুখের জড়তা বুঝি কেটে গেল এবার। বলল—মা, মাগো, আশীর্বাদ কর, বাকি জীবনটা যেন ভালভাবে চলতে পারি।

ভবানী দেবী বললেন—আমার বুকের মানিক, আমার বুকে আবার ফিরে আসবি বাবা—

লালু কান্নাজড়িত কণ্ঠেই বলল—না, ডাকাত পরিচয় নিয়ে আমি আর এ বাড়িতে আসতে চাই না মা। তবে যেখানেই থাকি, জেনে রেখো, তোমার ছেলে সত্যিকার ডাকাত নয়।

ভবানী দেবী আরও জোরে লালুকে আঁকড়ে ধরে বললেন—আমি ছেড়ে দেব না—আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না আমার বাবলুকে—

কিন্তু ছেড়ে দিতেই হল। পুলিসের দল ভবানী দেবীর বুক থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল লালুকে।

লালুকে নিয়ে পুলিসের দল যখন বাড়ির সদর দেউড়ী পার হয়ে গেল তখনও শোনা যেতে লাগল ভবানী দেবীর করুণ কান্না।




ডাইনী দ্বীপের গুপ্ত ধন
রবিদাস সাহারায়



এক

দুর্দান্ত ছেলে অরিজিৎ। বয়স কুড়ি ছুঁই-ছুঁই করছে। মনে অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা—চোখে রঙীন স্বপ্ন। ইণ্ডিয়ান টেকনোলজি ইনস্টিটিটিউটে পড়াশোনা করছে। ছুটিতে এসেছে দাদার কাছে থেকে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে।

এছাড়া আসবেই বা কোথায়? বাবা মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। দাদা অভিজিৎ ছাড়া আর কেউ তার সংসারে নেই। আর এক দাদা ছিলেন সুরজিৎ—তিনি বেঁচে আছেন কি মারা গেছেন তা তারা জানে না।

কলকাতার এক প্রান্তে পৈত্রিক বাড়িতে থাকে মেজদা অভিজিৎ। বাড়িটাকে তিনটি ফ্ল্যাটে ভাগ করে হ'টি ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হয়েছে। একটি ফ্ল্যাটে অভিজিৎ থাকে।

সেদিন ভোর বেলাতেই বেরিয়ে গেছে অভিজিৎ। জ্যুলজিক্যাল বিভাগে চাকরি করে। জরুরী কাজ পড়ায় আজ সকালেই তাকে বেরুতে হয়েছে। হঠাৎ একটা পুলিসের ভ্যান এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। পি, জি, হাসপাতালের একটি জরুরী ম্যাসেজ নিয়ে এসেছে পুলিস ভ্যান। সেই ম্যাসেজে লেখা—'সুরজিৎ রায় সিরিয়াসলি ইল।'

ম্যাসেজটি এসেছে অভিজিতের নামে। অরিজিৎ সেটা সই করে রাখল।

অরিজিৎ স্তম্ভিত হয়ে হাসপাতালের সেই কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল। সুরজিৎ রায়? এ তো তারই বড়দার নাম! বড়দা কলকাতায়

কেমন করে এলেন ? মেজদার মুখেই সে শুনেছে চার বছর আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে তাঁর শেষ চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। তারপর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

পুলিসের জিপটা ততক্ষণে চলে গেছে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরিজিৎ। এমন সময় সেখানে ইন্দ্রনীল এসে হাজির হল—তাদেরই একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা।

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞেসা করল—'কি ব্যাপার ? পুলিসের গাড়ি এসেছিল কেন ?'

অরিজিৎ নিঃশব্দে হাসপাতালের কাগজটা ইন্দ্রনীলের দিকে এগিয়ে দিল। ইন্দ্রনীল কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সুরজিৎ আবার কে ?'

অরিজিৎ সংক্ষেপে জবাব দিল, 'আমার বড়দা'।

ইন্দ্রনীল অবাক হবার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার বড়দা ? তিনি তো মারা গেছেন শুনেছি।'

অরিজিৎ বলল, 'তাঁর কোন সঠিক খবর আমরা জানতাম না। আজ আশ্চর্যজনক ভাবে খবরটা পাওয়া গেল।'

ইন্দ্রনীল বলল, 'আশ্চর্যজনকই বটে। এখন কি করবে ?'

অরিজিৎ বলল, 'তাই তো ভাবছি। মেজদা চলে গেছেন অফিসে। তাঁর অফিসটাও আমি চিনি না। কি করে যে তাঁকে খবর দেই।'

ইন্দ্রনীল বলল, 'আমি তোমার মেজদার অফিস চিনি। চলো, একটা ট্যাক্সি ধরে তার কাছে যাই।'

অরিজিৎ যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেল। দু'জনেই একটা ট্যাক্সি ধরে গিয়ে হাজির হল অভিজিতের অফিসে।

অভিজিৎ তখন অফিসের একটি জরুরী কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সেই ব্যস্ততার মাঝেও এমন একটি খবর পেয়ে খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, 'কি আশ্চর্যের ব্যাপার ! দাদা এখন অসুস্থ হয়ে কলকাতায় পি,

জি, হাসপাতালে! তা' হলে তো এখনই যাওয়া দরকার।'

ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে অভিজিৎ বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ, নিজের কাজের ক্ষতি করে অরিজিৎকে নিয়ে এখানে এসেছ।'

ইন্দ্রনীল বলল, 'এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে কি না এসে পারি?'

অভিজিৎ বলল, 'তা এখন তুমি চলে যেতে পার। তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাই না।'

ইন্দ্রনীল বলল, 'না, আমার আর কষ্ট কিসের? তা ছাড়া আজ আমার বিশেষ কোন কাজও নেই।'

অভিজিৎ বলল, 'এখানকার কাজ আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেরে নিচ্ছি। অরি, তুই বরং একটা ট্যাক্সি ছ্যাখ্। দরকারের সময় ট্যাক্সি নাও পাওয়া যেতে পারে।'

অরিজিৎ আর ইন্দ্রনীল তু'জনেই ট্যাক্সির জন্য রাস্তার দিকে চলে গেল। পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যেই এসে গেল অভিজিৎ। ট্যাক্সিও পাওয়া গেল।

গাড়িতে উঠে সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। একসময় ইন্দ্রনীল বলল, 'অভি, তোমার দাদা না ভূপর্যটক ছিলেন?'

অভিজিৎ বলল, 'হ্যাঁ। এ ভাবেই তো সারাটা জীবন তিনি কাটিয়ে দিলেন। দাদা অনেক লেখাপড়া শিখেও কাজকর্ম কোনদিন কিছু করলেন না! বাবা মারা যাওয়ার পর নিজের অংশের নগদ টাকাটা সবই উড়িয়ে দিলেন দেশ বিদেশ ঘুরে। তাঁর শেষ চিঠি পেয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়া থেকে। সে আজ ঠিক চার বছর হল। তারপর অনেক খোঁজখবর নিয়েও তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারিনি।'

গাড়ি হাসপাতালের গেটে এসে দাঁড়াল। সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ইন্দ্রনীলকেও তাদের সঙ্গে যেতে দেখে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ নাকি?'

ইন্দ্রনীল বলল, 'চলো, দেখে যাই তোমার দাদাকে। এমন একটা লোককে দেখাও যে ভাগ্যের কথা।'

এনকোয়েরিতে গিয়ে সুরজিতের ওয়ার্ড নম্বর ও বেড নম্বর জেনে নিল অভিজিৎ। কিন্তু তখন রোগীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নয়। তাই হাসপাতালের মেসেজটা দেখিয়ে বিশেষ অনুমতি নিতে হল।

উত্তরদিকের ওয়ার্ডের ছোট একখানা ঘর। কয়েকজন মাত্র রোগীর থাকবার জায়গা আছে সেখানে। এক কোণে বেশ নিরিবিলি একটি সিটের দিকে এগিয়ে গেল অভিজিৎ। হ্যাঁ, এটাই সাত নম্বর বেড। কিন্তু বেডে যে রোগী শুয়ে আছে, তাকে দেখে হঠাৎ চিনতেই পারল না অভিজিৎ। এই কি তার দাদা? কপালে একটা লম্বা কাটা দাগ, ডান চোয়ালে একটা ইঞ্চিখানেক গর্ত—সেখানে যেন হাড়মাংস কিছুই নেই। একটা চোখ—সেটাও যেন কি রকম! একটু ভাল করে তাকিয়ে অভিজিৎ বুঝতে পারল, চোখের বন্ধ পাতার নীচে চোখই নেই। আর মুখের রং—সুরজিৎ ছিল রীতিমত ফর্সা—কিন্তু এখন কালো মূর্তি ছাড়া কিছু তাকে বলা যায় না।

চোখের সামনে যেন একটা বিভীষিকার দৃশ্য দেখছে, সেই রকম আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অভিজিৎ। এমন সময় একজন নার্স এসে সেখানে দাঁড়াল। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কাল পর্যন্ত রোগীর জ্ঞান ছিল, আজ আর নেই।'

প্রশ্ন করল ইন্দ্রনীল, 'রোগটা কি?'

'তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না'—বলে নার্স সুরজিতের নাড়ী দেখতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে হাতখানি সন্তর্পণে বিছানায় নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে সে বাইরে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে বলল, 'ডাঃ বোসকে খবর পাঠিয়ে দিলাম। রোগীর অবস্থা খুব বিশেষ ভাল বুঝছি না। আপনারা বসুন!'

অভিজিৎ বসল দাদার বিছানার পায়ের দিকে আর ইন্দ্রনীল বসল বিছানার পাশের টুলটা টেনে নিয়ে। অরিজিৎ দাঁড়িয়ে রইল। রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে পনের বছর আগেকার হাস্যময় কিশোর যুবক সুরজিতের ছবি যেন ভেসে উঠল অভিজিতের চোখের ওপর। সাঁতারে

চ্যাম্পিয়ান হবার জন্য কি দুর্জয় সাহস নিয়ে সে গঙ্গায় পাড়ি দিচ্ছে। তারপর সে দেখতে পেল দশ বছর আগের স্নুরজিতকে—'পেঙ্গুইন' জাহাজের ডেকে সে দাঁড়িয়ে আছে—এক হাতে বিরাট স্নুটকেশ, অন্য হাতে বন্দুক আর পিঠে মস্ত বড় এক ব্যাগ।

ছ'বছর আগেও স্নুরজিৎকে সে দেখেছিল একবার। সেই শেষবার। এবং দেখা হয়েছিল দৈবাৎ। অভিজিৎ মার্কিন মুলুকে প্রাণীবিদ্যার পড়া শেষ করে প্লেনে দেশে ফিরেছিল প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে। ম্যানিলার বিমান বন্দরে হোটেলের টেবিলে মুখোমুখি একটি লোককে দেখতে পেল—মিলিটারী পোশাক পরা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেনি অভিজিৎ। হঠাৎ সে চমকে উঠল লোকটির কথা শুনে, 'তুই এখানে, অভিজিৎ?'

লোকটিকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি অভিজিৎ। তারপর লাফিয়ে উঠে বলল—'একি, দাদা তুমি?'

'হ্যাঁ।'

মিনিট দশেক মাত্র কথা হয়েছিল। স্নুরজিৎ যাচ্ছে নিউজিল্যাণ্ড। সেখান থেকে কয়েকটি দ্বীপে সে ঘুরে বেড়াবে। দ্বীপগুলোর নাম তখন শুনেছিল অভিজিৎ, আজ আর তা মনে নেই। তাদের ভেতর কোন কোন দ্বীপে নরখাদক অসভ্যরা আছে—একথা বলেছিল স্নুরজিৎ। হাসতে হাসতেই সেখানকার ভয়ঙ্কর নরখাদকদের কথা বলেছিল সে, কিন্তু শুনে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল অভিজিতের। সেটা লক্ষ্য করে ভাইয়ের গালে আদরের মৃদু চড় মেরে স্নুরজিৎ বলেছিল, 'ভয় নেই রে, ভয় নেই। আমাকে খেয়ে ফেলবে, এমন রাক্ষস জন্মায়নি এখনো।' তারপরই সে চলে গিয়েছিল, তার প্লেন ছাড়বার আর দেরি ছিল না।

সেই স্নুরজিৎ, আর এই স্নুরজিৎ! এমন সাংঘাতিক পরিবর্তন কী করে হল? যে ছিল সূর্যের মত ভাস্বর, সে এমন ম্রিয়মান কালো মেঘের মত হল কী করে? কিসে নষ্ট হল তার চোখ? কার অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন কপালে? কোন্ শত্রুর গুলিতে চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে গর্ত হয়ে

গেল? কোন্ বিপর্যয়ে এমন শক্তিমান মানুষ বিছানার সাথে মিশে রয়েছে আজ?

ডাক্তার এলেন। ইনিই হয়ত ডাক্তার বোস। এঁকে যেন তার পরিচিত বলে মনে হচ্ছে! কোথায় কবে এর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তা ঠিক মনে পড়ছে না অভিজিতের।

ডাক্তার নাড়ী দেখলেন। মুখটা যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেল। তারপরেই ব্যাগ খুলে বের করলেন ইনজেকসনের সরঞ্জাম।

ইনজেকসন দেওয়া হল। ডাক্তার নাড়ী ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন! তাঁর গম্ভীর মুখ এবার যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অবশেষে এক সময়ে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। অভিজিতের দিকে এতক্ষণে তাকালেন তিনি। বললেন, 'বড় দেরিতে খুঁজে পেলাম তোমাকে। তোমার দাদা আর নেই।'

দাদার শোকে অভিজিৎ যতই অভিভূত হোক, ডাক্তার তাকে হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধন করাতে সে খুব অবাক হয়ে গেল! ডাক্তারের চাইতে বয়সে বেশ কয়েক বছরের ছোট হলেও সে একেবারে বালক নয়। চব্বিশ পঁচিশ বছরের একজন অচেনা লোককে কেউ 'তুমি' বলে বসবে এটা খুবই আশ্চর্যজনক বৈকি! সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগল তার মন। কিছুক্ষণ আগে ডাক্তারকে প্রথম দেখার পরও তাঁকে চেনা চেনা মনে হয়েছিল। তাই ডাক্তারকে প্রশ্ন করল, 'কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু, আপনাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে'—

'চেনা মনে হবেই তো। আমি তোমার দাদারই বন্ধু সুব্রত বসু, তোমার দাদার সঙ্গে যখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তাম, তখন তুমি মাঝে মাঝে কলেজ ফাংসনে আসতে।'

অভিজিৎ লজ্জিত ভাবে বলল, 'আপনি সেই সুব্রত দা? তখন দাদা আর আপনি তো ছিলেন অভিন্ন হৃদয়। তা, শেষ সময়ে দাদা এসে আপনারই কাছে পড়লেন। আশ্চর্যের ব্যাপার বৈকি।'

'হ্যাঁ, সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার। 'প্রিন্স উইলিয়াম' জাহাজের

লোকেরা ওকে যখন অ্যাম্বুলেন্স করে এই হাসপাতালে নিয়ে এল তখন ওর জ্ঞান ছিল। আমি ওকে চিনতে না পারলেও ও একনজরেই চিনেছিল আমাকে। এসেই তোমাদের বাড়ির ঠিকানা আমাকে দেয়। তারপর ওকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তোমাদের বাড়িতে খবর দেবারও সুযোগ পাইনি। তোমাদের বাবা মা মারা গেছেন, তাও জানতাম। এখন ঐ বাড়িতে আছ কিনা তাও জানি না। যা হোক, রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়তে তোমার ঠিকানায় থানার মারফৎ ম্যাসেজ পাঠালাম।'

অভিজিৎ বলল, 'অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি না থাকলে দাদার খোঁজই হয়ত পেতাম না। কিন্তু দুঃখ রইল দাদাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলাম না।'

চোখে জল গড়িয়ে পড়ল অভিজিতের। ওদিকে অরিজিতের চোখও ভরে উঠল কান্নায়। সুব্রত বলল, 'দুঃখ করে আর কি লাভ হবে? তোমরা এখন গিয়ে সৎকারের আয়োজন কর। আমি তোমার দাদার ডেড বডি বের করে দেবার ব্যবস্থা করছি। একটা কথা তোমায় বলে রাখি। সুরজিৎ হাসপাতালে এসেই তার টাকাপয়সা এবং কাগজপত্র সব আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। সে-সব আমি তোমায় দেব। আজ রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে আমি যাব তোমাদের বাড়ি।'

রাত ন'টা বাজবার কয়েক মিনিট আগেই ইন্দ্রনীল এসে বসল অভিজিতের ঘরে। সন্ধ্যাবেলা মৃত সুরজিতের সৎকার সেরে অভিজিৎও অরিজিৎকে নিয়ে একই সঙ্গে বাড়ি ফিরেছে। কথায় কথায় সুরজিতের অনেক প্রসঙ্গই আলোচনা হল। তারপর মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে ইন্দ্রনীল বলল, 'যাই বল, তোমার ভাগ্য খুব ভাল বলতে হবে। তোমার দাদা তো কলকাতা পৌঁছবার আগেই মারা যেতে পারতেন।'

অভিজিৎ বলল, 'তা সত্যি বলেছ। আর কলকাতায় এসেও দাদা পড়েছেন সুব্রতদার হাতে।'

ইন্দ্রনীল বলল, 'তোমরা খুব লাকি। যা হোক, তোমার দাদা যদি দশ বিশ হাজার দিয়ে গিয়ে থাকেন, আমার ভাই হাজার পাঁচেক টাকা ধার দিতে হবে, বড্ড টানাটানি চলছে'—

অভিজিৎ অনেক চেষ্টা করেও হাসতে পারল না। মুখ গম্ভীর করেই বলল, 'সত্যি যদি কিছু পাই তবে তোমায় দেব। কিন্তু সুব্রতদা হয়ত এসব ব্যাপারে আমার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে চাইবেন। যদি কিছু মনে না করো—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। বেশ, আমি যাচ্ছি। তবে আমার কথাটা মনে রেখো—বলে হাসি মুখেই বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনীল।

ঠিক তার দশ মিনিটের মধ্যেই এসে উপস্থিত হল সুব্রত।

কাজের লোক। কথাবার্তায় ভূমিকার কোন প্রয়োজন মনে করে না। ঘরে ঢুকেই অরিজিৎকে দেখে বলল, 'এ কে?'

অভিজিৎ বলল, 'আমার ছোট ভাই অরিজিৎ। হাসপাতালে তো ওকে দেখেছিলেন।'

সুব্রত বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল অরিজিতের দিকে। বলল, 'তাই নাকি? তখন খেয়াল করিনি। তোমার ভাইয়ের চেহারা কিন্তু তোমাদের মত হয়নি।'

অভিজিৎ বলল, 'আমার দাদার সঙ্গে আমার চেহারার মিল ছিল অদ্ভুত। কিন্তু অরিজিৎ পেয়েছে ওর মামাদের মুখের আদল।'

সুব্রত বলল, 'তাই হবে। যা হোক, দরজা বন্ধ করে এসো। ব্যাপারটা আর কারুর কানে না যায়। তোমার দাদার নিষেধ আছে।'

অভিজিৎ দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল।

কোটের ভিতর-পকেট থেকে সুব্রত বের করল একটা ছোট্ট চামড়ার থলে আর একখানা ছোট খাতা। থলেটা টেবিলের উপর উপুড় করতেই তা থেকে বেরিয়ে এল ছোট হাঁসের ডিমের আকারের দু'খানা সাদা পাথর। বিজলীবাতির ঝলক লেগে পাথর দুটোর গা থেকে যেন সূর্যের কিরণ ছিটকে বেরুতে লাগল।

অপরিসীম বিস্ময়ে ও আবেগে গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল অভিজিতের। কিছুক্ষণ পর শুধু একটি শব্দই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'হীরে!'

'হ্যাঁ, হীরে!' সংক্ষেপে জবাব দিল সুব্রত। তারপর খাতাখানা খুলে তার শেষের দিকের একটা পাতা মেলে ধরল অভিজিতের সামনে। বলল, 'পড়ো।'

অভিজিৎ পড়তে লাগল, 'নিউজিল্যাণ্ড থেকে স্টীমলঞ্চ নিয়ে একটানা হাজার মাইল পূব-দক্ষিণে চলে যাও। একটা বড় দ্বীপ, নাম তার ডাইনী দ্বীপ—উইচ আইল্যাণ্ড।'

এটুকু পড়া হতেই সুব্রত বলে উঠল, 'গলা খাটো কর ভাই, গলা খাটো কর। দেয়ালেরও কান আছে।'

গলা খাটো করেই অভিজিৎ আবার পড়তে শুরু করল, 'একটা বড় দ্বীপ, নাম তার ডাইনী দ্বীপ, উইচ আইল্যাণ্ড। সেখানে বাস করে বড় আকারের একজাতীয় বনমানুষ। আর লক্ষ লক্ষ বছর আগে যেসব অতিকায় প্রাণী পৃথিবীতে ছিল, তাদেরই বংশধরেরা—টেরোড্যাকটাইল, ইগুয়ানেডেন, ডাইনোসরস। সারা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েও কী করে এই অজানা দ্বীপে তারা এখনও বেঁচে আছে, আমার মাথায় এল না।'

'হীরে আনতে গিয়ে টেরোড্যাকটাইলের ঠোঁটের এক ঘায়ে আমার চোয়াল ভেঙে গেল। হীরে এনেছিলাম অনেক, কিন্তু প্রাণভয়ে পালাবার সময়ে পকেট থেকে বড় থলেটা পড়ে গেল। তাতে ছিল দশখানা হীরে। ছোট থলেটা পড়েনি, তাতে রয়েছে মাত্র দু'টি। পারি তো আবার ফিরে আসব। অতিকায় প্রাণীদের কবল থেকে উদ্ধার করব এ দ্বীপের হীরের ভাণ্ডার।'

'এই বনমানুষগুলো! হীরের জন্য নাও যদি আসি, এই বনমানুষের বংশকে নির্মূল করার জন্য আমাকে ফিরে আসতেই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—ওদের ধ্বংস করবই। ওরা হত্যা করেছে আমার

সব সঙ্গীদের। আমার একটা চোখ উপড়ে নিয়েছে ওরাই। ওদের আমি দেখে নেব।'

পড়া শেষ করে অভিজিৎ একবার তাকায় সুব্রতর দিকে, একবার অরিজিতের দিকে আর একবার বাঁ হাতের খাতার দিকে।

ডাইনোসরসের একটা ছবি আঁকা আছে পরের পাতায়। তার নীচে সুরজিৎ লিখেছে—'তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা জানোয়ার! ষাট-সত্তর ফুট উঁচু ঐরাবতের মতো মোটা। সাপের মতো লম্বা গলা আকাশে তুলে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। মুখটা খুব বড় ব্যাঙের মতো, কিন্তু তা থেকে দু'পাটি দাঁত বেরিয়ে আছে যেন হাঙরের দাঁত। সামনের পা দু'খানা কিন্তু আশ্চর্য রকম ছোট, হাতের মতো গুটিয়ে রাখে বুকের কাছে। আমি একে চোখে দেখেছি। এ আমাকে তাড়া করেছিল। এ আমার তিনটে সঙ্গীকে হত্যা করেছে।'

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমার কাজ আছে ভাই অভি। হীরে দু'খানা নিয়ে কোন ভাল জুয়েলারের দোকানে যাও। বেচে টাকা ব্যাঙ্কে রাখো। আর খাতাখানা দাদার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখতে যদি চাও, তবে—কিন্তু ও শব্দটা কিসের?'

শব্দটা অভিজিতেরও কানে গেল। দরজা খোলার শব্দ।

ঘর থেকে ছুটে বেরুল অরিজিৎ। সর্বনাশ! ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। এইমাত্র কেউ বেরিয়ে গেল এই ফ্ল্যাট থেকে। কে সে?

অরিজিৎ সবার আগে ছুটে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল। ফিরে দরজা বন্ধ করে ভিতরে গিয়ে বলল, 'বাইরে বা সিঁড়িতে কেউ নেই তো!'

সুব্রত চিন্তিত ভাবেই বলল, 'আমি এখানে আসবার আগেই বাইরের কেউ এসে লুকিয়ে ছিল পাশের ঘরটায়। আমাদের সব কথা শুনে গিয়েছে। হীরে দুটো খুব সাবধানে রেখো ভাই।'

অভিজিৎ বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো! কিন্তু লোকটা কে?'



দুই

সুব্রত বেশ কিছুদিন আগে থেকেই রাইফেল ক্লাবে যাতায়াত করছে। ওর ভয়ানক শখ, রাইফেল শিখবে। হঠাৎ একদিন অভিজিৎকে সেখানে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল সুব্রত। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ? উইচ আইল্যাণ্ড নাকি ?'

লজ্জিত ভাবেই জবাব দিল অভিজিৎ, 'না না, সেসব কিছু নয়। তবে রাইফেলটা শিখে রাখা ভাল। কখন কোথায় গিয়ে পড়ি ঠিক তো কিছু নেই। কিন্তু আপনি—'

'আমি এখানকার পুরনো পাপী। আমিও শিখে রাখছি যদি ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগে।'

'যাক্ আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমি ভাবছিলাম আপনার খোঁজ করব। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। কখন কোথায় দেখা করব বলুন।'

'কথা তো এই যে উইচ আইল্যাণ্ডে যাবার একটা পরামর্শ চাই ?'

হেসে ফেলল অভিজিৎ। 'কি করে বুঝলেন ?'

'একি আর বুঝতে কষ্ট হয় ? তুমি সুরজিতের ভাই যে ! তোমাদের রক্তে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।'

'তা ঠিক। বাবার জীবনেরও অর্ধেক কেটে গিয়েছিল বাঘ শিকার করে করে। সুন্দরবনে, কুমায়ুন পাহাড়ে, আসামের জঙ্গলে। আমি বেশ ছিলাম সুব্রতদা। প্রাণীবিদ্যার গবেষণা নিয়ে বেশ ছিলাম। কি ক্ষণেই যে দাদার সেই খাতাখানা এসে পড়ল আমার হাতে! সেই থেকে প্রাণীযুগের আদি প্রাণী ডাইনোসরস দাঁত বের করে যেন আমাকে

ঠাট্টা করছে।'

সুব্রত গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, 'ঠিক এইটেই আশঙ্কা ছিল আমার। ওসব চিন্তা কেন আবার মাথায় আনছ? ইতিহাসের আগের যুগের জানোয়ারেরা যে দেশে আছে, সে দেশেই থাক্—তাদের ঘাটাতে গেলে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য।'

অভিজিৎ বলল, 'মনকে অনেক বুঝিয়েছি যে কলকাতার এই আরামের জীবন ছেড়ে সাত সমুদ্দুরের পারের মৃত্যুপুরীতে যাওয়া চূড়ান্ত বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সুব্রতদা, আপনাকে বলতে কি, দাদাকে স্বপ্ন দেখি প্রায় রোজ রাত্রে। ডাইনোসরসের মাথায় চড়ে নাচতে দেখি তাকে, দেখি বনমানুষদের সঙ্গে কুস্তী লড়তে। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে শুনি, দাদা যেন বলছে—আয় অভি, আমি একা পেরে উঠছি না এদের সাথে।'

সুব্রত বলল, 'বুঝতে পেরেছি তোমাকে শক্ত ব্যাধিতে ধরেছে। তোমার খুদে ভাইটিও এ ব্যাপারে তোমাকে মদত দিচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছে বৈকি! দাদার মৃত্যুতে মনে খুব দুঃখ পেলেও নতুন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ও মেতে উঠেছে। ওর আগ্রহেই তো এখানে এলাম। রাইফেল চালাতে না পারলে ঐ অভিযান করার কোন অর্থই হয় না।'

'তা ওকেও সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?'

'ও আগেই এসব বিদ্যা রপ্ত করে নিয়েছে। খড়গপুরে এক রিটায়ার্ড পুলিস অফিসারের ছেলে ওর সহপাঠী। বন্ধুর সঙ্গে মিশে সে ভালই শিখেছে রাইফেল চালানো।'

'তা' হলে আটঘাট সব বাঁধতে শুরু করেছ দেখছি। তবু বলছি, মনটা বাঁধবার চেষ্টা কর। যদি নিতান্তই না পার, কথা দাও, আমাকে না বলে যাবে না।'

হেসে জিজ্ঞেস করল অভিজিৎ, 'কেন, সঙ্গে যাবেন নাকি?'

'যেতেও পারি হয়ত। রাইফেল শিখেছি, শিক্ষাটা যদি কাজে

লাগাতে হয়, ডাইনী দ্বীপই হচ্ছে তার উপযুক্ত জায়গা।'

সুব্রত চলেই যাচ্ছিল। তাকে ডেকে ফেরাল অভিজিৎ—'শুনুন সুব্রতদা, শুনুন। আমার সেই ভাড়াটে বন্ধু ইন্দ্রনীল দত্ত—যে আমার সঙ্গে হাসপাতালে এসেছিল, সে কাল আন্দামানে চলে গেল।'

'আন্দামানে গেল?' আকাশ থেকে পড়ল সুব্রত।

'হ্যা। আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছে। ঘরের জিনিসপত্রও কিছু বিক্রি করেছে। আরও নানাভাবে বেশ কিছু টাকা যোগাড় করে দীর্ঘদিনের জন্য চলে গেল বাইরে।'

'তোমার হীরে দুটো চুরি যায়নি তো?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সুব্রত।

'না। সে দুটো বেচে চল্লিশ হাজার টাকা পেয়েছি। তা থেকেই তো পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছি ইন্দ্রনীলকে।'

'হীরে তা' হলে চুরি যায়নি। কিন্তু খাতা খানা? তোমার দাদার খাতাখানা আছে তো?'

'খা-তা!' হঠাৎ যেন চিন্তিত হয়ে পড়ল অভিজিৎ। খাতাখানা চুরি যাবে? কিন্তু গেছে কিনা বলতেও পারছি না। দেরাজে ফেলে রেখেছিলাম, আছে কি নেই, দেরাজ খুলে তো আর দেখিনি।'

একটু চঞ্চল ভাবেই সুব্রত বলল, 'এক্ষুনি গিয়ে দেখবে। চুরি যদি গিয়ে থাকে, পুলিসে খবর দিয়ে ইন্দ্রনীলকে তার জাহাজ থেকে ধরে আনতে হবে।'

'জাহাজ থেকে ধরে আনতে হবে?' চোখ বড় বড় করে সুব্রতর দিকে তাকাল অভিজিৎ।

'হ্যাঁ। যদি চুরি গিয়ে থাকে, জানবে নির্ঘাৎ ইন্দ্রনীল চুরি করেছে। সেদিন রাত্রে তোমার ফ্ল্যাটে লুকিয়ে থেকে আমাদের সব কথা যে লোক শুনে নিয়েছিল—সে ইন্দ্রনীল ছাড়া আর কেউ নয়। এখন আমি বুঝতে পারছি। তারপর তার এই আন্দামান যাত্রা—আন্দামান না কচু! যে যাচ্ছে ডাইনী দ্বীপে।'

এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল অভিজিৎ। 'কি! আমার কাছ থেকে

টাকা নিয়ে, আমার খাতা চুরি করে, আমারই ভাগে ভাগ বসাতে যাচ্ছে ইন্দ্রনীল !'

'আগে দেখ, খাতাখানা আছে না গেছে। যদি গিয়ে থাকে তবে আমাকে খবর দিও।' ফোন নম্বরটা দিয়ে সুব্রত চলে গেল।

অভিজিতের বাড়ি ফিরতে দেরি হল। কারণ তার তখনও রাইফেল প্র্যাকটিস বাকী। কোন কারণেই প্র্যাকটিসে ঢিলে দিতে সে রাজী নয়। ডাইনী দ্বীপে যদি যেতেই হয়, রাইফেলের উপরেই জীবনটা নির্ভর করবে।

মন বিক্ষিপ্ত। সেদিন প্র্যাকটিসটা মোটেই ভাল হল না। দ্রুতপদে বাড়ি ফিরে দেরাজটা খুঁজতে লাগল অভিজিৎ। নেই! সত্যি খাতাখানা নেই! বাইরে গিয়ে এক ওষুধের দোকান থেকে সে ফোন করল সুব্রতর কাছে—'হ্যালো সুব্রতদা, সত্যিই খাতাখানা নেই। ইন্দ্রনীল যে এমন কাজ করবে—'

'শোন, ইন্দ্রনীল আন্দামানে যায়নি। গেছে বর্মায়।'

'বর্মায় ?'

'হ্যাঁ, পোর্ট কমিশনার অফিস থেকে জেনে নাও কাল বর্মার দিকে কোন্ জাহাজ ছেড়ে গিয়েছে। তারপর লাল বাজারে যাও। মূল্যবান দলিল চুরি করে নিয়ে ইন্দ্রনীল দত্ত অমুক জাহাজে পালাচ্ছে বলে ডায়েরী করো। বেতারে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দিতে বলো যে একটা চোর তার জাহাজে আছে, তাকে যেন সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। আমার বিশ্বাস ইন্দ্রনীল রেঙ্গুনে এ জাহাজ ছেড়ে দেবে—নিউজিল্যাণ্ডের জাহাজ ধরবার জন্য। রেঙ্গুন পুলিসকেও খবর দিতে বলো।'

'কিন্তু সুব্রতদা, দলিলটা সত্যি মূল্যবান তো নয়। এ নিয়ে আকাশ পাতাল তোলপাড় করতে যাওয়া কি ঠিক হবে ?'

'দলিলটা মূল্যবান নয় ? তুমি প্রাণীবিদ্যার গবেষক হয়ে একথা বলছ ? ইতিহাসের আগের যুগে—যাকে বলে জুরাসিক যুগ—যে সব সাংঘাতিক জীব পৃথিবীতে বাস করত, তাদের বিবরণ, তোমার দাদার

চোখে দেখা বিবরণ—তাকে মূল্য দিচ্ছ না তুমি? তারপর ঐ হীরের খনির কথা—ওসব কথা থাক্‌। আমার পরামর্শ যদি শোন, তুমি পুলিসে খবর দাও। রাত্রিতে তোমার ওখানে গিয়ে আমি এসব বিষয়ে আলোচনা করব।'

রাত্রিতে এল সুব্রত।

এসে প্রথমেই বলল, 'হাসপাতালে তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি। আর চেম্বারে বসবার জন্য ঠিক করেছি আমার এক বন্ধুকে।'

অভিজিৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

'ডাইনী দ্বীপে যাওয়ার জন্য যখন ক্ষেপেই উঠেছ, তখন তোমাদের অমন ভাবে ছেড়ে দেই কেমন করে?'

'অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তা'হলে আপনাকেও পেয়ে বসেছে সুব্রতদা?'

সুব্রত হেসে উঠে বলল, 'আমার বাবা অবশ্য কোনদিন বাঘ শিকার করেন নি, আমার দাদাও টেরোড্যাকটাইল বা ডাইনোসরদের সঙ্গে হাতিহাতি লড়েন নি, তবু স্বীকার করতে লজ্জা নেই—অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আমাকেও মাতিয়ে তুলেছে। তুমি যাবে এটা ধরে নিয়েই আমিও যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। কিন্তু তোমার খুদে ভাইটাকে নিয়ে কি সত্যি যাবে?'

অভিজিৎ বলল, 'ভাইটি দেখতে খুদে হলেও ওর সাহস কিন্তু আমাদের চেয়ে কম নয়। তা ছাড়া ও ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের লোক। পলিটেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে শখ করে কার্পেণ্টারি শিখেছে। সমুদ্র যাত্রা, পাহাড় ডিঙানো ইত্যাদি নানা ব্যাপারে ওকে কাজে লাগবে।'

সুব্রত জিজ্ঞেস করল, 'কবে যাবে ঠিক করেছ?'

অভিজিৎ জবাব দিল, 'আপনি যখন যাচ্ছেন, সব কিছু স্থির করার ভার আপনার উপরে। এ অভিযানের অধিনায়ক আপনি।'

সুব্রত বলল, 'পরশু একটা জাহাজ ছিল তাতে নিউজিল্যাণ্ড যেতে সুবিধা হত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট ভিসা পাওয়া যাবে না।'

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, 'ইন্দ্রনীল এত তাড়াতাড়ি কি করে এসব যোগাড় করল বলুন তো?'

'ঘুষ! বুঝলে তো, ঘুষ! যে বন্ধুর দেরাজ থেকে খাতা চুরি করতে পারে, সে অফিসের কেরানীকে ঘুষ দেবে, এর আর আশ্চর্য কি?'

'দশ-বারো দিনের ভেতর যে জাহাজ পাওয়া যাবে, তাতে যাতে যাওয়া যায়—সেই ব্যবস্থা করুন সুব্রতদা। ফার্স্ট ক্লাশ কেবিনে তিনটে টিকিটের ব্যবস্থা করুন।'

ঠিক দশদিন পরে, প্রিন্স উইলিয়াম জাহাজে চেপে বসল অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ। এই জাহাজেই রুগ্ন সুরজিৎ কলকাতায় ফিরেছিল।

জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হল সুব্রতর। বিদেশী ডাক্তার, নাম হাডসন। সুরজিতের কথা হাডসনের বেশ মনে আছে। নিউজিল্যাণ্ডে যখন প্রথম জাহাজে ওঠে সুরজিৎ, তখনই সে অসুস্থ। কী অসুখ, জাহাজের সীমিত ডাক্তারী যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা ধরা যায়নি। তবে ডাক্তারের সন্দেহ হয়েছিল—ওর রক্ত বিষিয়ে উঠেছে। গায়ে ক্ষতচিহ্ন অনেক ছিল, কিন্তু সব ক্ষতই পুরনো, শুকনো। ঘা শুকিয়ে যায়, অথচ তার বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে যায়—এমন ঘটনার কথা জানা আছে হাডসনের। তাই কলকাতার বন্দরে জাহাজ ভিড়তেই তিনি সুরজিতকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

ডাক্তারই দেখিয়ে দিলেন—কোন্ কেবিনের যাত্রী ছিলেন সুরজিৎ। সেই কেবিনে লোক আছে—দু'জন সিঙ্গাপুরী ছাত্র। ওরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছে প্রাণীবিদ্যার। গরমের ছুটিতে দেশে যাচ্ছে।

দাদার কেবিনটা দেখবার বড়ই আগ্রহ হল অভিজিতের। সে আলাপ জমিয়ে তুলল ছাত্র দু'টির সঙ্গে। সে নিজে প্রাণী বিজ্ঞানের গবেষক—একথা প্রকাশ করতেই ছাত্র দু'টিও খুব আগ্রহী হয়ে উঠল।

আলাপ জমে উঠল। দুই কেবিনেই চলতে লাগল উভয় পক্ষের যাতায়াত।

অভিজিৎ ওদের কেবিনটার চারদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কল্পনার চোখে যেন দেখতে চেষ্টা করে—দাদা এখনও এই কেবিনে রয়েছেন। ঐ বিছানায় তিনি শুয়ে থাকতেন। হয়ত অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতেন কেবিনের এদিকে-ওদিকে।

হঠাৎ কেবিনের কাঠের দেওয়ালের দিকে নজর পড়ল অভিজিতের। সাদা দেয়ালের ওপর পেন্সিল দিয়ে ম্যাপ আঁকা। সমুদ্র, নদী, অরণ্য, প্রান্তর, সব শেষে পাহাড়—কি চমৎকারভাবে আঁকা রয়েছে দেয়ালের গায়ে। সব মিলিয়ে সুন্দর একটি ম্যাপ।

এটা নিশ্চয়ই দাদার হাতে আঁকা। এতে কোন ভুল নেই।

অভিজিৎ খুব আগ্রহ সহকারে ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সিঙ্গাপুরী ছাত্র দু'টির মনে কৌতূহল জাগল। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'বেশ তো ম্যাপটি। কিন্তু কোন্ দেশের যে ম্যাপ তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

অভিজিৎ বলল, 'তোমরা যদি কিছু মনে না কর তবে আমি ওর একটা নকল তুলে নেব।' কথা বলতে গিয়ে তার গলা হয়ত একটু কেঁপে গিয়েছিল।

অপর ছাত্রটি অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। বলল, 'নকল নেবেন? তা নিন না। এই তো কাগজ রয়েছে।'

প্রথম ছাত্রটি বলল—'নকল একটা আমিও নিতে পারি। ম্যাপ বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব এটা কোথাকার ম্যাপ।'

অভিজিৎ এতে একটু বিব্রত বোধ করল। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিল এই ভেবে—ওরা এই ম্যাপ নিয়ে কি করবে?

ম্যাপ এঁকে নিয়ে অভিজিৎ নিজের কেবিনে ফিরে এসে সেটা দেখাল সুব্রতকে। সুব্রত অভিজিতের পিঠ চাপড়ে বলল, 'সাবাস, দাদার উপযুক্ত ভাই বটে। নিশ্চয়ই তোমার দাদার আত্মা আমাদের

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আমরা নিশ্চয়ই ঐ দেশে পৌঁছাতে পারব।'

এমন সময় কেবিন-ভৃত্য এল ফিনাইল দিয়ে কেবিন মুছে দেবার জন্য। অভিজিৎ, সুব্রত ও অরিজিৎ কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

ম্যাপটা টেবিলের উপরেই ছিল। ভৃত্যটার কি যে হল, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ম্যাপটার দিকে। হাতে আঁকা ম্যাপটার প্রতি একজন ভৃত্যের কেন যে এত আকর্ষণ তা কে জানে?

মিশকালো ওর গায়ের রং, অস্বাভাবিক উঁচু আর মোটা ওর নাক। নাকের ডানদিক থেকে একটা কাটা দাগ নেমে এসে গালের চাপদাড়ির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। নীল রঙের জাহাজী কুর্তার নীচে থেকে হাতের কব্জীতে দেখা যায় চিত্র-বিচিত্র উল্কি। এমন বিচিত্র একটা লোকের ঐ ম্যাপটা এমনভাবে দেখার কারণ কি?

'আরে তুমহারা কাম হুয়া নেই?' বাইরে থেকে ধমকে উঠল অভিজিৎ।

তাড়াতাড়ি মেজেতে ফিনাইল জলের একটা পোঁচ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। অভিজিৎ সুব্রত আর অরিজিৎ কেবিনে ঢুকে ম্যাপটা আবার ভাল করে দেখতে লাগল। দশ-বারো মিনিট পরেই হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা গেল বাইরে থেকে। শোনা গেল সেই সিঙ্গাপুরী ছাত্র দু'টির গলা।

কৌতূহলের বশে অভিজিৎ, সুব্রত ও অরিজিৎ বেরিয়ে এসে ডেকের উপর দাঁড়াল। তখন কালো চেহারার কেবিন ভৃত্যটাকে রেলিংয়ের ধারে কোণঠাসা করে তার ওপর ভয়ানক চোটপাট করছে সেই ছাত্র দু'টি—'জরুর তুম লিয়া, তুম বেগর দুসরা কোই ঘুসা নেই কেবিনমে। আভি দে দেও নক্সা, নেহি তো ক্যাপ্টেন সাহেবকো রিপোর্ট করে গা।'

কী হয়েছে? হয়েছে কী? কিছু সংখ্যক যাত্রী আর দু' একজন লস্কর ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের। কেবিন ভৃত্যটি বলছে—'নেহি সাব, হাম লিয়া নেই। হাওয়ামে উড় গিয়া রাহা।'

একজন লস্কর পরামর্শ দিল—ওকে তল্লাসী করা হোক।

কিন্তু লোকটা কিছুতেই তার গায়ে কাউকে হাত দিতে দেবে না। এতে সবার সন্দেহ বেড়ে গেল। টিকিট-সুপারভাইজার তখন সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ব্যাপার দেখে হুকুম করলেন, 'দু'জন লস্কর ওকে ধরে থাকো আর একজন করো তল্লাসী। যদি নক্সা ওর কাছ থেকে বেরোয়, ক্যাপ্টেনের কাছে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

লস্কর দু'জন হুকুম অনুযায়ী কাজ করবার জন্য এগিয়ে যেতেই লোকটা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। জাহাজের রেলিং টপকে ঝাঁপ দিল সমুদ্রে।

এক মুহূর্ত সবাই হতভম্ব। তারপর হৈ-হৈ। বিপদের ঘণ্টা বাজল। জাহাজের যাত্রীরা নীরব দর্শক হয়ে শুধু দেখল—পলাতক লোকটা সাঁতার কেটে উত্তর দিকে চলেছে।

ক্যাপ্টেন এলেন। সব দেখে-শুনে বললেন, 'জাহাজ থামিয়ে রাখার দরকার নেই। উত্তরদিকে উপকূল মাত্র এক মাইল। ও সহজেই ডাঙ্গায় উঠতে পারবে। বেতারে পুলিসকে খবর দিয়ে দিচ্ছি। জাহাজ চালাও, আর ১৪নং কেবিনের দেয়ালের ঐ নক্সাটা ঘষে তুলে ফেলো। এতদিন ওটা তোলা হয়নি কেন? স্টুয়ার্ড কোনদিকে নজর দেয় না দেখছি।'

অভিজিৎ ওরা ফিরে এল নিজেদের কেবিনে গম্ভীর মুখে। সুব্রত জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে?'

অভিজিৎ বলল, 'বোঝাবুঝি কিছু নয়, ওকে আমি চিনেছি। ও ইন্দ্রনীল।'

'এঁ্যা'! চমকে উঠল সুব্রত!

'সাঁতার দিতে দিতে ও এক সেকেণ্ডের জন্য ফিরে তাকিয়েছিল। আমি ওর মুখ দেখেছি সেই মুহূর্তে। ওর মোটা নাক জলে ভেসে গিয়েছে তখন। ধুয়ে গিয়েছে গায়ের কালো রঙ। দাড়ি গোঁফ যতই থাক, ইন্দ্রনীলকে চিনতে আমার দেরি হবে কেন?'



তিন

সুরজিতের খাতা চুরি করার পরেই ইন্দ্রনীল ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবার মতলব করেছিল। সে একা থাকত, কোন অসুবিধা ছিল না। ঘরের দামী জিনিসপত্র প্রায় সবই বিক্রি করে দিয়েছিল। অভিজিৎ পুলিসে খবর দিতে পারে তাই সে রটিয়ে দিয়েছিল যে সে কিছুদিনের জন্য জাপানে যাচ্ছে।

সুব্রত যেদিন অভিজিতের ফ্ল্যাটে এসেছিল খাতাপত্র ও টাকাপয়সা বুঝিয়ে দেবার জন্য, পাশের ঘরে আগের থেকেই লুকিয়েছিল ইন্দ্রনীল। ছুটো ঘরের মাঝের দরজায় মোটা পরদা, তারই আড়াল থেকে সে হীরে দেখতে পায়। আর কিছু কথাবার্তাও শুনতে পায়, যার ফলে সে জানতে পারে ডাইনী দ্বীপের কথা।

বাইরে বড় মানুষী ঠাঁট থাকলেও ইন্দ্রনীলের ভেতরটা ফোঁপরা হয়ে এসেছে অনেকদিন আগে থেকেই। আয় নেই, বেহিসাবী ব্যয় আছে, এতে আর পৈত্রিক তহবিল কতদিন বজায় থাকে ? খুবই চিন্তায় পড়েছিল ইন্দ্রনীল, এমন সময় পেল এই হীরের দ্বীপের খবর। অভিজিৎ একটা মাত্র রাত্রি সেই হীরে ছু'খানা কাছে রেখেছিল, তাই ইন্দ্রনীল সেগুলো সরাবার সময় পায়নি। তা না পাক, স্বপ্নরাজ্যের হীরের সন্ধান সে পেয়েছে।

সুরজিতের খাতায় ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ারের কথা পড়েও ভয় পায়নি ইন্দ্রনীল। কারণ সে জানতে পেরেছে জন্তু-জানোয়ারের কবলে পড়ে সুরজিৎ মারা যায়নি, সে মরেছে কলকাতায় এসে অসুখে। কাজেই সেই ছুর্গম ও ভয়ঙ্কর দ্বীপে ইন্দ্রনীলের পক্ষে যাওয়ার অসুবিধাটা

কোথায় ? যেমন করেই হোক সে যাবেই ডাইনী দ্বীপে।

নিউজিল্যাণ্ড! ওর পূর্ব উপকূলের বড় বন্দর হল ওয়েলিংটন। সেখানকার ওভারসি ব্যাঙ্কে সে নিজের টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিল। তারপর তৈরী হতে লাগল প্রিন্স উইলিয়াম জাহাজ ধরবার জন্য। টিকিট কিনতে গিয়ে দেখে অভিজিৎ ঠিক সেই সময় টিকিট হাতে করে বেরিয়ে আসছে। ওরাও তা'হলে যাচ্ছে সেখানে ? এখন উপায় ?

এক সঙ্গে যাওয়াও চলে না, আবার তাড়াতাড়ি না গেলেও নয়। অভিজিৎ আগে গিয়ে যদি হীরের ভাণ্ডার লুঠ করে নিয়ে আসে তা হলে পরে ডাইনী দ্বীপে গিয়ে আর কি লাভ হবে ? এই জাহাজেই যেতে হবে তাকে। কিন্তু কি ভাবে ?

থিয়েটারে অভিনয় করার শখ ছিল ইন্দ্রনীলের। অনেক বইয়ে নায়কের ভূমিকাও সে করেছে। ড্রেসের দোকানে এবং মেক-আপ ম্যান-এর সঙ্গে তার খুব চেনা ছিল। কাজেই তার ছদ্মবেশ ধারণ করতে অসুবিধা হল না। জাহাজের স্টুয়ার্ডকে ঘুষ দিয়ে জাহাজে চাকরি নিতে গেল। কেবিন-ভৃত্যের কাজ একটা খালি ছিল। সেখানেই বহাল হয়ে গেল ছদ্মবেশী ইন্দ্রনীল।

সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়াতে ইন্দ্রনীলের ছদ্মবেশ ঘুচে গেল বটে, কিন্তু আর কোন ক্ষতি হল না। অভিজিতের ঘর থেকে চুরি করা খাতা আর ১৪ নম্বর কেবিন থেকে চুরি করা ম্যাপ ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগে রয়েছে তার কোমরে বাঁধা, টাকা পয়সাও রয়েছে সেই ব্যাগে। জাহাজে ওর সঙ্গে আর কোন মালপত্র বিশেষ ছিল না। কেবিনবয়ের মালপত্র আর কি থাকবে ? ওয়েলিংটন বড় শহর, সেখানে পৌঁছে সব কিছুই সে কিনে নিতে পারবে।

চড়ায় উঠে ইন্দ্রনীল নির্জীবের মত পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ভাবতে লাগল যে ভাবেই হোক্ ওয়েলিংটন তাকে পৌঁছতে হবে।

প্রিন্স উইলিয়ম জাহাজ এখনও নজরের বাইরে যেতে পারেনি।

মালয় দ্বীপপুঞ্জ বড় মজার জায়গা। ডাইনে একটা ছোট দ্বীপ, বাঁয়ে একটা ছোট দ্বীপ, ঘুরে ঘুরে পাশ কাটিয়ে চলতে হয় জাহাজকে। খোলা সমুদ্রে হাওয়ার বেগে ছুটে এগিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। এখনও বেশ কিছুক্ষণ জাহাজটা নজরের ভেতর থাকবে নিশ্চয়ই। কারণ খাঁড়িটা বড় একটা মোড় ঘুরছে একটুখানি এগিয়ে গিয়েই। সেখানে জাহাজকে প্যাঁচানো একটা পথ অতিক্রম করতে হবে। এই সময় একটা ডিঙ্গি নৌকা পেলে খুব ভাল হত।

মাইল খানেক সে আগেই সাঁতার দিয়ে এসেছে, খুবই শ্রান্ত সে। তা না হলে এক্ষুণি আবার জলে নেমে পড়ত সাঁতার দিয়ে জাহাজ ধরবার জন্য। সেটা যখন সম্ভব হচ্ছে না, চাই একটা নৌকা। মাঝি সমেত না হলেও চলবে। ইন্দ্রনীল ভাল সাঁতার জানে।

সেক্সপীয়ারের নাটকে রাজা রিচার্ড এক জায়গায় বলেছেন, 'একটা ঘোড়া! আমার গোটা রাজ্যের বিনিময়ে একটা ঘোড়া কেউ এনে দিক।' দ্বীপের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্রনীল নিজের মনেই বলতে লাগল, 'একখানা ডিঙ্গি। ডাইনী দ্বীপের একটা হীরের বিনিময়ে একখানা ডিঙ্গি আমাকে কেউ এনে দিক।'

এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

তা আসুক। নৌকা যদি পাওয়া যায়, রাত্রির অন্ধকারেই জাহাজে ওঠার সুবিধা হবে। অবশ্য চলন্ত জাহাজে কী করে সে লাফিয়ে উঠবে, সে-সমস্যা সমাধানের উপায় তার মাথায় এখনও আসেনি।

নৌকা! নৌকা! এতটুকুন একখানা মোচার খোলার মত নৌকা হলেও তার চলবে। কিন্তু কোথায় পাবে নৌকা?

খাঁড়ির ধারে একটা বড় ঝোপের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতেই ইন্দ্রনীল দেখল, কয়েকজন লোক বসে আছে। তাদের চেহারা দেখেই সে বুঝতে পারল লোকগুলি ভাল প্রকৃতির নয়।

তা যেরকম লোকই হোক, ইন্দ্রনীলের তাতে এসে যায় না। তার দরকার একটি নৌকা—তা যারই হোক্। ইন্দ্রনীল ইংরেজী ভাষায় তাদের

জিজ্ঞেস করল—'আই ওয়াণ্ট এ বোট! হ্যাভ ইউ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল একটা লোক—'হ্যাজ'। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় সঙ্গীদের কি যেন বলল। তার জবাবে সকলেই মাথা নাড়ল। অর্থাৎ স্পষ্ট বলে দিল—নৌকা দিতে পারবে না।

ইন্দ্রনীল দূরবর্তী জাহাজটাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তারপর হাবভাবে বুঝাতে চেষ্টা করল—ঐ জাহাজ থেকেই সে জলে পড়ে গিয়েছে। ঐ জাহাজে তাকে উঠতে হবে।

তার কথা ওরা বিশ্বাস করল কিনা, ঠিক বুঝতে পারল না ইন্দ্রনীল। কিন্তু ওরা সবাই মাথা নেড়ে জানাল, 'নো, নো, নো।'

ইন্দ্রনীল চিন্তায় পড়ল। এদের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য চেষ্টা করবে কি? কিন্তু অন্য কোথাও যে নৌকা পাওয়া যাবে তারই বা ভরসা কোথায়? ব্যাগ খুলে ওদের টাকা দেবে কি? কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ওরা হয়ত সব টাকা কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রনীলকে খুন করে খাঁড়ির জলে ফেলে দেবে। যে রকম ওদের চেহারা তাতে ওদের বিশ্বাস কি?

তা'হলে কি করবে সে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা ফন্দী তার মাথায় এসে জুটল। তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠল, 'ক্যাচ দি সীপ! গেট মেনি মেনি জুয়েলস! গেট মেনি মেনি মানি!'

ইলেকট্রিকের শক লাগল যেন লোকগুলোর শরীরে। প্রায় সবাই উঠে দাঁড়াল। ঐ ভাষার অর্থ সবাই বুঝি বুঝতে পারল। বিকট কোলাহল করে উঠল তারা। ইন্দ্রনীল বুঝতে পারল এবার, এরা এ অঞ্চলের জলদস্যু।

খাঁড়িটা ঘুরে গিয়েছে ইংরেজী ইউ-এর মতো। ইউ-এর দুটো বাহু পেরিয়ে গেলেই জাহাজটা খোলা সমুদ্রে পড়বে। এখান থেকে সে-জায়গাটা খুব বেশী দূরে নয়—মাইল দেড়েকের মধ্যে। হাতছানি দিয়ে ইন্দ্রনীলকে সঙ্গে যেতে বলে দস্যুর দল দ্রুত হেঁটে এগিয়ে চলতে লাগল। জলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে চলল তারা। এইখানে খাঁড়ি থেকে একটা সরু

খাল বেরিয়েছে। তার ভেতর জাহাজ ঢোকা অসম্ভব, কিন্তু ছোট নৌকা অতি সহজেই চলতে পারে।

সেই খালের জলে ডোবানো আছে সারি সারি নৌকা। ছিপ নৌকার মত সরু সরু আর লম্বা। তারই একখানা জল থেকে তুলে নিল দস্যুরা। ইন্দ্রনীলকে নিয়ে সেই নৌকায় তারা উঠে বসল। ছিপ নিয়ে চলল তর তর করে। ছিপ চলছে আর জলদস্যুদের মত 'কূ' দিচ্ছে ওরা। দু'হাতের পাতা একত্রে মুঠোর মত করে শাঁখের ভঙ্গিতে মুখের কাছে নিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ করছে ওরা। সেই শব্দ দূরে সন্ধ্যার আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বোঝাই এক একখানা করে ছিপ সুরুৎ করে বেরিয়ে আসছে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে। দুর্বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করছে নবাগতেরা, সেই ভাষাতেই জবাব দিচ্ছে আগেকার দল। সরু খালটা যখন ও-পিঠের খাঁড়িতে এসে শেষ হল, তখন ইন্দ্রনীলের পেছনে আর দু'খানা নৌকা। দস্যুর সংখ্যা ষাট-সত্তর আর প্রিন্স উইলিয়াম জাহাজ তখন একেবারে হাতের নাগালে।

রাত্রি নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার নিয়ে। খাঁড়ির তীরে তীরে বড় বড় গাছ, তারই ছায়ায় নিঃশব্দে চলে ছিপ নৌকা। জাহাজ চলেছে অতি সাবধানে ধীর গতিতে। খাঁড়ির জল সব জায়গায় গভীর নয়।

যাত্রী জাহাজ। নিরীহ শান্তিপ্রিয় শ'দুয়েক বিভিন্ন জাতের মানুষ চলেছে এডেন থেকে ওয়েলিংটন—বিভিন্ন বন্দরে। যাত্রী জাহাজের উপর কোনদিন দস্যুদের হামলা হয় নি। দস্যুভয় আছে আরও উত্তরে, চীনের সমুদ্রে।

কিন্তু প্রিন্স উইলিয়াম জাহাজের ক্যাপ্টেনের হিসাবে ভুল হয়েছে। এ অঞ্চলে দুঃসাহসী দুর্বৃত্তেরা যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এটা তার মাথায় আসে নি। এচিন্তা যখন তাঁর মাথায় এল, তখন জাহাজ বাঁচাবার আর উপায় ছিল না।

পিল পিল করে জাহাজের পেছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে কালো কালো মুষকো জোয়ান। হাতে তাদের বর্শা আর বেঁটে

চওড়া তরোয়াল। ত্ব'একজনের হাতে রাইফেলও আছে বৈকি।

জাহাজে বিপদ-সঙ্কেত ঘণ্টা বেজে উঠল।

'ফল অন্! লাইন বেঁধে দাঁড়াও মাল্লারা। কেবিনের যাত্রীরা যার যার কেবিনের দরজা বন্ধ কর। ডেকের যাত্রীরা সাবধান হও।' ক্যাপ্টেন ঝড়ের বেগে হুকুমের পর হুকুম দিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু সে-হুকুম তামিল করে কে? এটা যুদ্ধ জাহাজ নয়। মাল্লাদের এমন শিক্ষা নেই যে মুহূর্তের নোটিশে তারা বন্দুক ঘাড়ে করে জঙ্গী জোয়ান হয়ে দাঁড়াবে। সবাই ছুটোছুটি শুরু করল। ছুটোছুটি এবং চেঁচামেচি। ডাকাতের বর্শা বল্লমে বিদ্ধ হয়ে তারা কেউ জাহাজে কেউ জলে পড়তে লাগল।

মাত্র ত্ব'টি বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ছেন ক্যাপ্টেন আর ফার্স্ট অফিসার। তাঁরা গুলি চালাচ্ছেন বটে, কিন্তু হাত তাঁদের কাঁপছে। অভ্যাসের অভাব—তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে তাঁদের গুলি। ত্ব'একজন দস্যু মাত্র আহত হয়েছে। আর সবাই ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কেবিনে কেবিনে ঢুকে লুটপাট শুরু করে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন আর ফার্স্ট অফিসারকে রুখবার জন্য কয়েকজন দস্যু রইল উপরের ডেকে। বাকীরা সব ঘুরে ঘুরে লুটপাট করতে লাগল।

অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ তখন কোথায়?

অরিজিৎ ঘুমোচ্ছে। কাগজে কি সব এঁকে তা নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে অভিজিৎ আর সুব্রত। হঠাৎ সারা জাহাজে তুমুল কোলাহল উঠতেই তারা চমকে উঠে পড়ল। জামা গায়ে গলিয়ে ত্ব'জনে ছুটে বেরুতে গেল ঘর থেকে। কি আশ্চর্য! তাদের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। প্রাণপণে দরজা ধরে টানতে লাগল তারা। তারপর ত্বমদাম করে লাথি মারতে লাগল। চেঁচাতে লাগল, 'কে আছ, দরজা খুলে দাও।'

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। অরিজিৎ তখন ঘুম থেকে জেগে উঠে বসেছে।

পরিশ্রান্ত হয়ে ত্ব'জনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে নিরুপায়

ভাবে তাকিয়ে রইল। এমন সময় ঘটাং করে খুলে গেল দরজা আর হুড়মুড় করে কয়েকজন দস্যু ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে কে যেন হুকুম দিল, 'বাঁধো! বাইণ্ড দেম ভেরী টাইট!'

ইন্দ্রনীল! স্তম্ভিত অভিজিৎ আর সুব্রতর মুখ দিয়ে দ্বিতীয় কথা বের হল না। শুধু অরিজিৎ 'ইন্দ্রদা তুমি!' বলে লাফিয়ে উঠল।

বাধা দেওয়ার সুযোগ পেল না কেউ। শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে তিন জনকেই সেই দস্যুরা টানতে টানতে বের করে নিয়ে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল নীচে। জাহাজের পেছন দিকে সারি সারি কয়েকখানা ছিপ নৌকা ছিল, তারই একটাতে তাদের নিয়ে তুলল। লুটপাটের কাজ তখন শেষ হয়েছে। দলের ভেতর যারা বন্দুকের গুলিতে জখম হয়েছিল, তাদের নিয়ে এসে শুইয়ে দিল নৌকায়। তারপর তারা নৌকা ছেড়ে দিল।

'ইন্দ্রনীল এমনি করে বন্ধুত্বের প্রতিদান দিলে?' দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বন্দী অভিজিতের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল। কিন্তু কোথায় তখন ইন্দ্রনীল! চারদিকে তাকিয়ে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না তাকে। সে বোধ হয় সেই নৌকাতেই উঠেনি।

দেখতে দেখতে অন্য ছিপগুলোও ছেড়ে দিল। কোনটাতেই ইন্দ্রনীল নেই।

ইন্দ্রনীল সত্যি নৌকায় উঠেনি। কারণ তার উদ্দেশ্য তো ডাকাতি করা নয়। লুটপাটের এই সামান্য ভাগ দিয়ে সে করবেই বা কি? তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ জাহাজে পৌঁছানো। মালয়ালীদের সাহায্যে সে জাহাজে উঠেছে, তার উপর তার পথের বাধা তিনজনকে সরিয়ে দিতে পেরেছে, এটাই তার মস্ত লাভ।

ইন্দ্রনীলের উদ্দেশ্য সফল! মালয়ালীদের ছিপগুলো চলে যাবার পরই সে জাহাজের রসুইখানায় ঢুকল। লোকজন কেউ কোথাও নেই। প্রচুর পরিমাণে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি জাহাজের

খোলের ভিতর ঢুকে পড়ল। বড় বড় সব মালের বোঝা পড়ে আছে সেখানে। তারই আড়ালে এক জায়গায় সে চুপি চুপি বসে পড়ল। যতদিন না জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছায়, ততদিন তাকে এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে। তার পরনে আছে এখনও জাহাজী পোশাক। বন্দরে জাহাজ ভিড়লে সে নিশ্চয়ই অন্য পাঁচটা জাহাজী লোকদের সঙ্গে মিশে পাড়ে নেমে যেতে পারবে।

অদৃষ্টের কি পরিহাস! ওদিকে অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ খালের ধারে নোংরা বস্তীতে পাতার ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে বন্দী। বাইরে যখন রোদ ঝলমল করছে, তখনও ভিতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

সেই অন্ধকারেই দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ। কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই শুধু তাদের দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবছে। হঠাৎ অভিজিৎ হেসে উঠল।

'একি! তুমি হাসছ যে!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সুব্রত।

অভিজিৎ বলল, 'হাসছি দুঃখে। সুখের জীবন ছেড়ে কেনই বা এখানে এলাম। কেনই বা অরি হল আমাদের সঙ্গী। আর কোথায় আপনি এখন হাসপাতালে রোগ নিয়ে গবেষণা করতেন, তার বদলে আছেন অজানা দ্বীপে বন্দী হয়ে।"

'গবেষণা তো এখনও করছি। ভাবছি ডাইনী দ্বীপের ডাইনোসর বেশী হিংস্র, না আমাদের প্রিয়বন্ধু ইন্দ্রনীল।'

'ইন্দ্রনীলকে হিংস্র বলুন আর যা-ই বলুন, ওর প্রশংসা না করে কিন্তু উপায় নেই। কাফ্রি কেবিনবয় সেজে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া, জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়া, তারপর আবার লোকজন নিয়ে জাহাজে চড়াও হওয়া সহজ কাজ নয়।'

'তা সত্যি! আমাদের নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে সে এখন নিশ্চয় নিশ্চিন্ত হয়েছে। কারণ সে-ই হয়ত এখন জাহাজের মালিক।'

অভিজিৎ বলল, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। জাহাজে ক্যাপ্টেন,

অফিসার, যাত্রী, সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই শ' লোক। আপনি কি মনে করেন তারা সবাই মারা পড়েছে? তাদের অর্ধেক লোকও যদি বেঁচে থাকে, ইন্দ্রনীল তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য।'

সুব্রত বলল, 'সত্যি, কি ডেয়ার ডেভিল!'

অরিজিৎ বলল, 'ইন্দ্রদা তো এমন না করে আমাদের সঙ্গে থাকলেই পারত।'

সুব্রত বলল, 'ইন্দ্রনীল জানে তোমরা কিছুতেই তাকে হীরের দ্বীপে নিয়ে যাবে না। তাই এই পথই বেছে নিয়েছে।'

অভিজিৎ বলল, 'সত্যি কি আমি দিতাম না? ফেরৎ পাব না জেনেও পাঁচ হাজার টাকা এক কথায় তাকে ধার দিয়েছি। ও যদি এই ব্যাপারে সাহায্য করত তা'হলে কি হীরের ভাগও কিছু দিতাম না? তা হলে ওকেও এত কষ্ট করতে হত না, আমাদেরও এই দুর্দশা হত না।'



চার

নানা কথা বলাবলি করছিল তারা। এমন সময় তিনজন কালো মোটা লোক এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। তাদের ইশারা করল বাইরে যাবার জন্য। তাদের গম্ভীর মেজাজ দেখে অভিজিৎ ও অরিজিৎ ভয় একটু পেলেও সুব্রত বলল, দেখা যাক, কোথায় ওরা নিয়ে যায়—বধ্যভূমে না রাজতক্তে!

রাজতক্তই বুঝি একখানা রয়েছে বাইরের উঠোনে। হাত দুই উঁচু একটা মোটা গাছের গুঁড়ির টুকরো। কেউ তা'তে বসে নেই। অথচ

সেটাকে ঘিরে প্রায় একশ'টা বিটকেল চেহারার দস্যু বসে আছে। কথাবার্তা বলছে ফিসফিস করে।

সুব্রত একটু শ্লেষ মাখান স্বরে বলল, 'ঐ রাজাসনটি বুঝি তোমার জন্যই খালি পড়ে আছে!'

'না, রাজার আসনে রাজাই বসবে। ঐ দেখুন।'

জমকালো পালকের টুপি মাথায়, গায়ে রং বাহারী কোট, পরনে বর্মী লুঙ্গি—একটা বিরাট লম্বা চওড়া লোক এসে হাজির হল। তার আগে একজন আর পেছনে একজন লোক রয়েছে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে। বিটকেল চেহারার লোকগুলি উঠে দাঁড়াল আর ওদের ভাষায় জয়ধ্বনি করে উঠল।

রাজা সেই গাছের গুঁড়ির উপর বসল। হুকুম করল সেই বন্দীদের তার সামনে নিয়ে আসার জন্য। একজন লোক তাদের সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'ইংলিস নো? ইউ নো ইংলিস?'

সুব্রত আর অভিজিৎ বুঝতে পারল তারা ইংরেজী ভাষা জানে কিনা তাই জানতে চাইছে। তখন তারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই লোকটি রাজাকে সেই কথা জানিয়ে দিল। রাজা তখনই বাজখাই গলায় বলে উঠল, 'হিয়ার কাম!'

এগিয়ে গেল তারা। দু'পাশে দু'দল দস্যু লম্বা লম্বা ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে রইল। হয়ত একটু এদিক-ওদিক হলেই বসিয়ে দেবে তাদের পেটে।

রাজা কটমট করে তাকাল অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিতের দিকে। তারপর আবার তার দৃষ্টি অভিজিতের উপর এসে পড়ল। কিন্তু তারপরেই একি হল? হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল রাজা।

অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ ভাবতে লাগল এটা তাদের মনের ভুল নয়ত? কাঁপবে কেন রাজা? এটা তো তার নিজেরই রাজ্য। আর তার সামনে তারই অনুগত সব প্রজা। তিনজন নিরস্ত্র বাঙালী বন্দী দেখে সে কেঁপে উঠবে কেন?

কেঁপে উঠলেও রাজা বুঝি মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। জিজ্ঞেস করল, 'হু ইউ? হয়ার ফ্রম?'

'টুরিষ্ট। ফ্রম ক্যালকাটা।' জবাব দিল সুব্রত।

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে তখনই আবার অভিজিতের দিকে মুখ ফেরাল রাজা। কি যেন দেখতে লাগল খুঁটিনাটি করে। চোখের পলক যেন পড়ছে না রাজার। তার হাবভাব দেখে সুব্রত অবাক হয়, অরিজিৎ ভয় পায় আর অভিজিৎ কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে।

অভিজিতের মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে পড়ে, 'উই আর ইয়োর প্রিজনার।'

রাজার গম্ভীর মুখটা সহসা যেন বদলে গেল। বলে উঠল, 'নো প্রিজনার, অনার গেস্ট।'

রাজার আদেশে তার পার্শ্বচর দু'জন বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিল। রাজা বলল, 'ইউ মাস্টার হিয়ার। কমাণ্ড মী! কমাণ্ড অল।'

এ কী ভোজবাজি! মুক্ত বন্দীরা অবাক। দস্যুরাও সব হতভম্ব। খোদ রাজার মুখে এই কথা? দস্যুরা অনেক আশা নিয়ে এসেছিল, রাজার হুকুমে একসঙ্গে তিনটি নরবলি দেখতে পাবে। কিন্তু তার বদলে এ কী?

রাজা উঠে পড়ল তার আসন থেকে। এগিয়ে এসে মাথা নীচু করে অভিজিতের সামনে দাঁড়াল। বলল, 'ইউ মাস্টার, পারডন মী, পারডন অল।'

তারপর নিজেদের ভাষায় দস্যুদের গড়গড় করে কি যেন বলল। এবার সে চলে গেল তার দেহরক্ষী নিয়ে। এগিয়ে এল ইংরেজী জানা দস্যুটা। তার কথার সুর এবার নরম,—'বাওয়ানা! কাম হাউস।'

বাওয়ানা! সুব্রত কথাটার মানে জানে। এদের ভাষায় বাওয়ানা মানে প্রভু। দস্যুরা প্রভু সম্বোধন করছে অভিজিৎকে! একি স্বপ্ন না সত্য?

সেই ইংরেজী জানা দস্যুটা এবং আরও একজন লোক ওদের সঙ্গে



রাজা কটমট করে তাকাল অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিতের দিকে।

করে নিয়ে চলল। সেই অন্ধকার কুটীরের দিকে নয়, এবার চলল অন্য দিকে। একটা খালের ধারে উঁচু টিলার মত জায়গা, তার উপর একখানা বড় বাড়ি। মাটির ঘর, কাঠের ছাউনি, দরজা জানালা সবই আছে।

সেই ঘরে নিয়ে অতিথিদের বসান হল। মোটা কাঠের গুঁড়ির টুকরোর উপর বসতে হল তাদের। এবার একজন লোক এনে দিল কাঠের বালতিতে করে জল আর একটি কাঠের মগ। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ হাত মুখ ধুয়ে এল।

এল চা, আলাদা আলাদা কাঠের মগে চায়ের লীকার, দুধ আর চিনি। নিজেরা মিশিয়ে নিয়ে এক এক মগ তারা তিনজনেই খেল। একধারে একটা বড় দড়ির খাটিয়াও ছিল। সেখানে তারা গা এলিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করল।

কিছুক্ষণ পরেই এল ভাত। ভাতের সঙ্গে দু'তিন রকমের মাছ।

আশ্চর্য হয়ে গেল ওরা মাছের তরকারি মুখে দিয়ে। ঠিক বাঙালী ধরনের রান্না। অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে কি হতে পারে সুব্রতদা? এই বাঙালী ধরনের রান্না এরা কি করে শিখল? আপনার মাথায় কিছু আসছে কি?'

একটা বড় চিংড়ির মাথা চিবুতে চিবুতে সুব্রত জবাব দিল, 'দাঁড়াও, আগে এই মাছের মাথাটা শেষ করি, তবে তো আমার মাথায় বুদ্ধি আসবে।'

খাওয়া শেষ করে তিনজনেই হাত মুখ ধুয়ে এসে বসল আবার খাটিয়ায়। অভিজিৎ আর অরিজিৎ কিন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সুব্রতর কথা শুনবার জন্য। সুব্রত বলল, 'আচ্ছা তোমার দাদা তোমার চেয়ে কত বছরের বড় ছিলেন?'

অভিজিৎ বলল, 'চার বছর। কেন তাতে কি হয়েছে?'

সুব্রত বলল, 'আহা ব্যস্ত হয়ো না। আমার ধারণা কিন্তু মিলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এই রাজা অর্থাৎ বুনো সর্দারটি এক সময়ে তোমার

দাদার সঙ্গে ছিল। চার বছর আগে সর্দার দেখেছিল তোমার দাদা সুরজিৎকে। সুরজিতের যে চেহারা সে দেখেছিল সেই সময়ে, ঠিক সেই চেহারাই আজ সে দেখতে পাচ্ছে তোমার মধ্যে। তোমার দাদার সঙ্গে তোমার চেহারার যে অদ্ভুত মিল রয়েছে।'

অভিজিৎ বলল, 'হ্যাঁ, সে কথা অনেকেই বলে!'

সুব্রত বলল, 'সুতরাং, এই বুনো সর্দার, মাঝখানে যে চার পাঁচটা বছর কেটে গিয়েছে, তার হিসাব না করেই সোজাসুজি তোমাকে তোমার দাদা বলে ধরে নিয়েছে। রক্ষা তোমার ভাই অরি তোমার মতো হয়নি, তা'হলে কিন্তু লোকটা খটকায় পড়ে যেত।'

অভিজিৎ যুক্তিটা মেনে নিল। আবেগ জড়িত কণ্ঠে সে বলল, 'এত বড় একজন মানুষ ছিলেন দাদা! কত বড় সাহসী, কত বড় উদ্যমী—'

সুব্রত বলল, 'শোন, এখন আমাদের আবেগ প্রকাশের সময় নয়। তোমাকে এমনভাবে চলতে হবে যাতে সর্দারের ভুলটা ভেঙে না যায়। তুমি নিজেকে তোমার দাদা বলেই চালিয়ে যাবে।'

অভিজিৎ বলল, 'না না, সেটা খুবই বিশ্রী ব্যাপার হবে। ভুল ধরা পড়লে আমাদের বিপদেও পড়তে হতে পারে।'

সুব্রত একটু ভেবে বলল, 'সে কথাও সত্যি। তা' হলে দুটো পথ আমাদের সামনে খোলা আছে। এরা আমাদের যে রকম স্বাধীনতা দিয়েছে, তাতে রাত্রি বেলা চেষ্টা করলে আমরা পালিয়ে যেতে পারি। ঐখানে ছিপ নৌকা রয়েছে। আর একটু আধটু নৌকা চালাতেও আমি জানি।'

অভিজিৎ বলল, 'নৌকা চালানো আমারও অজানা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় পথটা কি তা জানতে পারি কি?'

সুব্রত বলল, 'দ্বিতীয় পথটা হল সর্দারকে সব খুলে বলে তার মহত্ত্বের উপর নির্ভর করা। সে যদি সব জেনে শুনে তোমার দাদার সম্মান রক্ষার খাতিরে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হয়, তা'হলে আমাদের

সব দিক দিয়েই মঙ্গল। এখন কি করবে সেকথা চিন্তা করো।'

তিনজন মিলে তখন পরামর্শ করতে লাগল।

ওদিকে সর্দার ওয়াংগা তখন ঐ বাড়িরই অন্য একটা ঘরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। বাওয়ানা! এ সেই বাওয়ানা! ডাইনীর দ্বীপে ঢুকবার আগে বাওয়ানা জোর করে ওয়াংগাকে নিজের দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তোকে আমি নিয়ে যেতে পারিনে। তুই দেশে ফিরে যা।'

বাওয়ানা, ওয়াংগার প্রাণদাতা বাওয়ানা। ডাকাতি করতে গিয়েছিল সুরজিতের বজরায়। বেশী লোক ছিল না তার দলে। একা সুরজিৎ রাইফেলের গুলিতে সব ক'টি লোককেই মেরে ফেলেছিল। ওয়াংগাও জখম হয়েছিল সাংঘাতিক ভাবে। ওয়াংগা ভেবেছিল অন্যান্য মৃতদেহের সঙ্গে তার জ্যান্ত দেহটাও খাঁড়ির জলে ফেলে দেবে। কিন্তু তা সে দেয় নি। নিজেই ছুরির সাহায্যে ওয়াংগার উরু থেকে বুলেট বের করে তারপর শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলেছিল তাকে। সেই থেকে ওয়াংগার কি রকম পরিবর্তন হয়ে গেল, বাওয়ানার সঙ্গে লেগে রইল ছায়ার মত। তারপর কত বিপদের মুখে তারা পড়েছে—কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে সেই বিপদকে কাটিয়ে উঠেছে। কত হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ থেকে হাসতে হাসতে আত্মরক্ষা করেছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বাওয়ানা আর ওয়াংগা। একবার মালয় জঙ্গলের নরখাদক বামনদের খপ্পরে পড়েছিল সে। বাওয়ানা সময়মত গিয়ে না পড়লে তাকে মেরেই ফেলত নরখাদকরা। সবশেষে ডাইনী দ্বীপ থেকে উড়ে আসা রাক্ষুসে পাখি! একদিন স্টীম লঞ্চের ছাতের উপর দাঁড়িয়েছিল ওয়াংগা। তুরপুনের মত ঠোঁট দিয়ে তার মাথায় ঠুকরে দিল। মাথায় ছোটখাট একটা গর্ত হয়ে গেল—রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে। বাওয়ানা কাছেই ছিল, বর্শা ছুড়ে মেরেছিল উড়ন্ত রাক্ষসটাকে। ঘাড়ে আঘাত পেয়ে সেটা উৎকট চীৎকার করতে করতে উড়ে পালাল। বর্শাটা তখনও

বিঁধেই ছিল পাখিটার ঘাড়ে। ওয়াংগার মাথায় ঘা হয়ে গিয়েছিল। বাওয়ানা ওষুধপত্র দিয়ে ভাল করে তুলেছিল তাকে।

সেই বাওয়ানা আজ তার ঘরে অতিথি। তার নিজের লোকদের সামনে বেশী কথা সে বলেনি। বিস্ময় ও আনন্দে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। এবার সে তার কর্তব্য পালন করবে। কিন্তু বাওয়ানা কি তাকে চিনতে পারেনি? সে সর্দার হয়ে পাখির পালকওয়ালা টুপি পরেছে বলেই কি তাকে চিনতে পারেনি বাওয়ানা? এবার তা'হলে সে টুপি পরে তার সামনে যাবে না।

কিন্তু তাকে আর যেতে হল না, অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ নিজেরাই সর্দারের কাছে এল। এসে বলল তাদের কাহিনী। সত্যকার ঘটনাই তারা খুলে বলল।

আশ্চর্য, সে কথা শুনে দৈত্যের মত চেহারার মানুষটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার বাওয়ানা বেঁচে নেই? যাকে সে বাওয়ানা ভেবেছিল সে তার ভাই!

আপন ভাই হয়েও খুব বেশী কাঁদেনি অভিজিৎ সুরজিতের জন্য। আর এই বুনো লোকটা কি অঝোরে কাঁদছে। বড় ভাবপ্রবণ এই বন্য-জাতি। রাগের মাথায় মানুষ খুন করতেও তাদের যেমন আটকায় না, দুঃখে কেঁদে ভাসাতেও তেমনি লজ্জাবোধ করে না তারা।

কেঁদে কেঁদেই জিজ্ঞেস করল, 'বাওয়ানা কিছু বলে যায়নি আমার কথা? এই হতভাগা ওয়াংগার কথা?'

অভিজিৎ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, অনেক কিছু বলে গেছেন। মরার আগেও তোমার কথা তিনি ভোলেন নি। আমায় বলে গিয়েছেন ডাইনী দ্বীপে গিয়ে হীরে আনতে। তুমি নিয়ে যাবে আমাকে সেখানে?'

হঠাৎ এই সময়ে সুব্রতর মাথায় একটা বুদ্ধি জাগল। সে বলে উঠল, 'বাওয়ানা তার ডায়েরীতে তোমার নামও লিখে রেখে গিয়েছেন।'

কান্না একটু স্তিমিত হয়ে এল ওয়াংগার। কৌতূহল জাগল তার মনে। মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কি লিখে গেছে বাওয়ানা?'

সুব্রতই তার জবাব দিল, 'লিখে গিয়েছেন যে তাঁর ভাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার বিশ্বাসী বন্ধু ওয়াংগা। সে ডাইনী দ্বীপের পথ চেনে।'

ওয়াংগা বলে উঠল, 'না না, বন্ধু না। আমি তার চাকর। সে যদি হুকুম করে গিয়ে থাকে—আমি যাবই তার ভাইকে পথ দেখাতে। বাওয়ানা আমার প্রাণদাতা—কতবার আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তোমরা কি যেতে চাও সেই ডাইনী দ্বীপে? কিন্তু সেখানে গিয়ে কেউ জ্যান্ত ফেরে না—এটাই হল ওদেশের লোকের ধারণা। ডাইনী দ্বীপের পঞ্চাশ মাইল তফাতে ওটাম্বা দ্বীপ রয়েছে, মানুষ বাস করে না সেখানে। তার ওপিঠের সমুদ্রে ঢুকতে ভয় পায় সব মানুষ। ঢুকলে নাকি আর ফিরতে পারে না কেউ।'

অভিজিৎ বলল, 'দাদা তো গিয়েছিলেন, ফিরেও এসেছিলেন। তিনি তো মারা গেলেন দেশে গিয়ে অসুখে।'

ওয়াংগা মাথা নেড়ে বলল, 'না না, অসুখ নয়! ডাইনীদের নজরের বিষ। ডাইনীরা কেউ পাখি, কেউ বানর, কেউবা আরও ভয়ানক ভয়ানক জন্তুজানোয়ারের আকার ধরে ওখানে আছে। ডাইনরা কারো গায়ে নিঃশ্বাস ফেলেই তার জান খতম করে দিতে পারে।'

'তবু আমাদের যেতেই হবে সর্দার।' অভিজিৎ বলল, 'দাদা যে বলে গিয়েছেন।'

ওয়াংগা বলল, 'বলে গিয়ে থাকলে তো কথাই নেই। বাওয়ানার হুকুম ওয়াংগা কখনও অমান্য করবে না। আজ রাতটা এখানেই কোন রকমে কাটাও। বজরা সাজাই। সেই বজরাতেই সিঙ্গাপুর যাব। খোলা দরিয়ায় তো ছিপ টিকবে না।'

'বজরাও আছে তোমাদের এখানে?' জিজ্ঞেস করল সুব্রত।

'আছে বৈকি, তাও তোমার দাদার কৃপায়।'

সে কথা শুনে অভিজিতের মনে বজরা দেখবার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। খালের সংলগ্ন একটা পুকুরের ভেতর রয়েছে বজরা। বাংলা দেশের নদীতে যে বজরা দেখা যায়, এগুলো ঠিক সেই রকম। অভিজিতের

বুঝতে বাকী রইল না তার দাদাই এটা তৈরী করিয়েছিলেন।

ওয়াংগা বলল, 'এই বজরাতেই আমি ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম। তোমার দাদার গুলি খেয়ে ঐ গলুইয়ের উপর পড়ে যাই। সিঙ্গাপুর বন্দরেই এটা থাকত। ডাইনী দ্বীপ থেকে যখন আমায় ফিরিয়ে দিল, তখন বলল বজরা সিঙ্গাপুর থেকে এনে আমার কাছে রাখতে। সেই থেকেই বজরাটা এখানে আছে। এই বজরা এখন তোমাদের।'

পরের দিন কিন্তু তারা রওনা হতে পারল না। চার বছর ধরে পড়ে আছে বজরা। কিছু কিছু মেরামত করে, রং লাগাতে হল তাতে। আবার ওদিকে ওয়াংগা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার ভাইকে সর্দারির ভার দিয়ে যেতে হবে, তারও কিছু অনুষ্ঠান সমাধা করতে হল।

সাতদিন পরে ছাড়ল বজরা। চারজন জোয়ান লোক ওয়াংগার সঙ্গে চলল। তারা এই বজরা বেয়ে নিয়ে যাবে। পরে বজরার যখন দরকার থাকবে না, তারাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এটাকে। ওয়াংগা আর বজরা নিয়ে ফিরবে না। বাওয়ানার ভাই যদি ডাইনী দ্বীপে প্রবেশ করে তবে সে-ও করবে।



পাঁচ

ওয়াংগার বজরা যেদিন ছাড়ল, সেইদিনই ইন্দ্রনীল প্রিন্স উইলিয়াম জাহাজ থেকে নামল সিঙ্গাপুরে। তার পরনে ছিল জাহাজী পোশাক, কেউ তাকে বাধা দিল না।

সিঙ্গাপুরে নেমেই পোশাক বদল করল ইন্দ্রনীল। এবার পরল

ফ্যাসন-দুরস্ত বিলিতি স্যুট। সেইদিনই সে সিঙ্গাপুর থেকে প্লেনে রওনা হয়ে গেল! সেদিন সে ভাবতে পারেনি যে অভিজিৎরা তার খুব পেছনে পড়ে নেই। শত্রুরা মালয়য়ালী দস্যুদের হাতে মারা পড়েছে নয়তো বন্দী হয়ে আছে—এই কল্পনাতেই মশগুল হয়ে আছে ইন্দ্রনীল। ডাইনী দ্বীপে যাবার পথে আর কোন বাধা নেই, এটাই স্থির জানে সে।

সেই ভুল ভাঙতে তার দেরি হল না। ওয়েলিংটন পৌঁছবার এক সপ্তাহ পরেই সে দেখতে পেল, ওভারসী ব্যাঙ্কের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে অভিজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ, তাদের সঙ্গে একটা লম্বা চওড়া মালয়য়ালী। সিঙ্গাপুরে পৌঁছে বজরাটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে অভিজিৎরাও প্লেন ধরেছে।

এই ওভারসী ব্যাঙ্ক এ অঞ্চলের একটা বিখ্যাত ব্যাঙ্ক। কলকাতা ছাড়বার আগে নিজের সব টাকাকড়ি ইন্দ্রনীল এই ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েছিল, কারণ সে জানে ওয়েলিংটনই হবে তার ডাইনী দ্বীপ অভিযানের প্রধান ঘাঁটি। এখান থেকেই তাকে জিনিসপত্র কিনতে হবে, স্টীম লঞ্চ ভাড়া করতে হবে, তারপর যাত্রা করতে হবে অজানা পথে।

ঠিক ঐ রকম ব্যবস্থা অভিজিৎরাও করেছে। তারাও টাকাপয়সা পাঠিয়েছে ওভারসী ব্যাঙ্কে। তাদেরও ইচ্ছা এখান থেকেই স্টীম লঞ্চ ভাড়া করবে। সংগ্রহ করবে প্রয়োজনীয় জিনিস—রাইফেল, তাঁবু, পোশাক, ওষুধপত্র ইত্যাদি।

তাদের দেখে ইন্দ্রনীলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তার শত্রুরা এখানেও এসে পড়েছে। কী করে এল ? তা'ছাড়া একজন মালয়ালীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল কীভাবে ? কেনই বা আনল ?

হঠাৎ ইন্দ্রনীলের মনে হল, ঐ লোকটাকে সঙ্গে আনবারও একটা উদ্দেশ্য হয়ত অভিজিতের রয়েছে। ইন্দ্রনীলই মালয়ালী দস্যুদের লেলিয়ে দিয়েছিল জাহাজ লুঠ করবার জন্য। ইন্দ্রনীলই কৌশল করে অভিজিৎদের বেঁধে মালয়ালীদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই সব

ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবার জন্যই হয়ত নিয়ে এসেছে এই লোকটাকে!

ওয়াংগা যে ডাকাতির দলে ছিল না, ইন্দ্রনীলকেও যে সে চোখে দেখেনি, সেকথা ইন্দ্রনীল জানবে কেমন করে? পঞ্চাশ জনেরও বেশী দস্যু ছিল সেই দলে, সে কি আর সবাইকে চিনে রেখেছে?

কি করা যায় এখন?

প্রিন্স উইলিয়াম আজ পৌঁছাল ওয়েলিংটনে। ইন্দ্রনীল ভাবল, অভিজিৎরা আজ নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেনকে নিয়ে পুলিসের কাছে যাবে। তখন কি হবে?

ব্যাঙ্ক থেকে অভিজিৎরা বেরুল। ইন্দ্রনীলও অনুসরণ করল তাদের। প্রিন্স উইলিয়াম রয়েছে জাহাজঘাটায়, সেদিকে ওরা গেল না। কিনতে লাগল নানা দোকান ঘুরে নানারকম জিনিস।

এক দোকান থেকে আর এক দোকানে যেতে যেতে সুব্রত বলল অরিজিৎকে, 'ওহে খুদে ইঞ্জিনিয়ার, তোমার দরকারী টুকিটাকি জিনিস কিনে নাও। তোমার জিনিসের প্রেসক্রিপসন তো আমি করতে পারব না।'

অরিজিৎও তার খুশীমত কিছু জিনিসপত্র কিনল।

একগাদা জিনিস কেনা হয় আর সেগুলো নিয়ে ওয়াংগা কোথায় যেন চলে যায়। কৌতূহল হল ইন্দ্রনীলের। ট্যাক্সি বোঝাই মাল নিয়ে ওয়াংগা এবার যখন রওনা হল, সে আর একটা ট্যাক্সি চেপে অনুসরণ করল আগেকার ট্যাক্সিটাকে।

জাহাজঘাটারই একদিকে এসে পৌঁছাল ট্যাক্সিটা। কয়েকটা স্টীম লঞ্চ সেখানে বাঁধা আছে। তারই একটাতে ওয়াংগা মাল বোঝাই করতে লাগল।

ইন্দ্রনীলের বুকটা কেঁপে উঠল। তা'হলে কি ওরাও স্টীম লঞ্চ ভাড়া করে ফেলেছে? কী ভাবে করল? ইন্দ্রনীল যে অনেক চেষ্টা করেও এখনও স্টীম লঞ্চ ভাড়া করতে পারেনি। লঞ্চ যাদের আছে তারা পাসপোর্ট দেখতে চায়। সেই পাসপোর্টে ওয়েলিংটনের ভারতীয় হাই

কমিশনার অফিসের ছাপ ও সই থাকা চাই।

এখানেই বাঁধল গোলমাল। ইন্দ্রনীল ঘুষ দিয়ে পাসপোর্ট যোগাড় করেছিল কলকাতায়। তাড়াতাড়িতে ওর ভেতর কি জানি একটু গলদ রয়ে গেছে। সেটা ধরা পড়ল এই ওয়েলিংটনে। তাই হাই কমিশনার তার কাগজপত্রে সই করতে চাইছেন না। কলকাতায় টেলিগ্রাম করে জানবেন বলেছেন।

কিন্তু এরা তো দেখা যাচ্ছে পাসপোর্ট নিয়ে কোন গোলমালে পড়ে নি। লঞ্চ ভাড়াও করে ফেলেছে। হয়ত কালই ডাইনী দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে। তখন কি উপায় হবে?

কোন উপায় করতে পারবে না ইন্দ্রনীল? এত বুদ্ধি মগজে থাকতেও কোন একটা কৌশল সে খাটাতে পারবে না? জেটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু ভাবল সে। তারপর ওয়াংগা যখন আবার শহরের দিকে চলে গেল তখন সে এগিয়ে গিয়ে একজন খালাসীকে জিজ্ঞেস করল, 'এ লঞ্চ আজ ছাড়বার কথা ছিল না?'

খালাসী জবাব দিল, 'না। এটা তো কাল ছাড়বার কথা।'

ইন্দ্রনীল বলল, 'আমার পরিচিত একজন লোক এই লঞ্চে চাকরি নিয়েছে শুনেছি। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি কি?'

'তার নাম কি?'

'টমাস।'

'না, না, আপনি ভুল শুনেছেন। একজন নতুন লোক বাবুর্চির কাজ নিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও কাজ শুরু করেনি। আজই এসে যাবে বোধ হয়। তার নাম রহমত। বর্মী মুসলমান।'

সেখানে আর একটুও দেরি না করে ইন্দ্রনীল হোটেলে ছুটল। ঢুকল নিজের কামরায়। আধঘণ্টা পরে সে যখন বেরিয়ে এল, তখন সে একেবারে আলাদা মানুষ। প্রিন্স উইলিয়াম জাহাজে সে সেজেছিল কাফ্রী, এবারে সাজল বর্মী মুসলমান।

টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস ব্যাগে ভরে নিয়ে সে কামরা থেকে

বেরিয়ে গেল। অচেনা লোক দেখে ম্যানেজার ভাবলে, হোটেলের কোন গেস্টের কাছে হয়তো এসেছিল।

বর্মী মুসলমান বেশধারী ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জেটির ধারে 'সী-উলফ্'-এর কাছাকাছি। ওটাই অভিজিৎদের ভাড়া করা লঞ্চ।

আধঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনীল। কৈ, যার আসার কথা সে তো এল না? অথবা ইন্দ্রনীল যখন ছদ্মবেশ ধারণ করার জন্য হোস্টেলে গিয়েছিল, তখনই কি সেই লোকটা এসে গেছে? তা' হলে তো সব মাটি।

কিন্তু এত আগেই বা আসবে কেন? আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক্।

প্রায় তিনঘণ্টা পর একটা লোককে দেখা গেল। লোকটা বর্মী মুসলমান, তার পরিচয় লুঙ্গি, দাড়ি ও টুপিতেই রয়েছে। একটা টিনের তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে আসছে জেটির দিকে। ঐ লোকটাই নিশ্চয় রহমত।

চটপট পা চালিয়ে ইন্দ্রনীল লোকটার কাছে গিয়ে হাজির হল। সেলাম জানিয়ে বলল, 'আদাব! রহমত মিয়া তো?'

রহমত সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল অপরিচিত ইন্দ্রনীলের দিকে। বলল, 'আদাব! কিন্তু কে তুমি? চিনি না তো?' মনে মনে ভাবতে লাগল, টিকটিকি পুলিস নয় তো?

ইন্দ্রনীল বলল, 'আমি তোমার চাচেরা ভাই, আমায় চিনলে না? একটু আড়ালে চল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

রহমত ও ইন্দ্রনীল একটু আড়ালে এল। ইন্দ্রনীল বলল, 'তুমি ঐ সী-উলফ্ লঞ্চটায় কাজ নিয়েছ না?'

'হ্যাঁ, তুমি কি করে জানলে?' অনেকটা বোকার মতই মুখের ভাব করে জিজ্ঞেস করল রহমত।

ইন্দ্রনীল কথা বলতে লাগল ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আর কিছুটা বর্মী ভাষায়। বর্মী ভাষা ইন্দ্রনীলের সামান্য কিছু জানা ছিল। তাই

রহমতের কথা বুঝতে আর তার সঙ্গে কথা বলতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। ইন্দ্রনীল বলল, 'জান, ঐ লঞ্চে যাচ্ছে একদল ডাকু লোক। ওরা ঐ জাহাজকে বোমা ফাটিয়ে ফুটো করে জলে ডুবিয়ে দেবে।'

'এঁ্যা, তাই নাকি ? তোবা ! তোবা !' আঁতকে উঠল রহমত।

'হ্যাঁ। তাই তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্য এসেছি। তুমি যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তবে ঐ লঞ্চে যেও না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু আমার তু'শ টাকা যে লোকসান হয়ে গেল। চাকরিটা করলেই আমি তু'শ টাকা পেয়ে যেতাম। তাতে আমার মেয়ের সাদিটা—'

ইন্দ্রনীল তার জামার ভিতরের দিকের পকেট থেকে তু'শ টাকা বের করে রহমতের দিকে এগিয়ে দিল। বলল, 'এই নাও তু'শা টাকা। তোমার মেয়ের সাদির ব্যবস্থা কর।'

টাকাটা হাতে নিয়ে রহমত আবার সন্দেহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এতে তোমার লাভ কি ?'

ইন্দ্রনীল বলল, 'আমার লাভ কিছু নেই। আমি জানতাম তোমার মেয়ের সাদি ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ জাহাজে যদি যাও তবে জ্যান্ত ফিরে আসতে পারবে না। আমি তোমার জাত ভাই। তাই—'

রহমত বলল, 'আর কিছু বলতে হবে না। তোমার অনেক দোয়া। আল্লা তোমার মেহেরবানি করবেন। এই আমি বাড়ি চললাম।'

রহমত ফিরে চলল। তু'শ টাকার বিনিময়ে সে দিয়ে গেল তার পাসপোর্ট ভিসা এবং জাহাজের ক্যাপ্টেনের দেওয়া একটা নিয়োগ পত্র। ইন্দ্রনীল তাকিয়ে দেখল পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে তার চেহারার তফাৎ খুব বেশী নেই।

'সী-উলফ' ছাড়ল পরের দিন।

সুরজিতের খাতায় লেখা আছে—নিউজীল্যাণ্ড থেকে হাজার মাইল চলে যাও পূব-দক্ষিণ দিকে। কোন্ পথে পূব দক্ষিণ দিকে যেতে হবে

তা কিছু লেখা নেই খাতায়। ওয়াংগা সঙ্গে না থাকলে এ অবস্থায় খুবই অসুবিধা হত। ভগবানই তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন! ইন্দ্রনীল যখন হাত পা বেঁধে ওদের তিনজনকে দস্যুদের নৌকায় তুলে দিয়েছিল, তখন কে জানত যে নিজের অজ্ঞাতেই ইন্দ্রনীল তাদের একটা পরম উপকার করেছে। দস্যুদের দেশে গিয়েছিল বলেই না ওয়াংগাকে তারা পেয়েছে।

লঞ্চ চলছে। প্রথম প্রায় দু'শ মাইল ফাঁকা সমুদ্র। তারপরেই এখানে ওখানে ছোট বড় মাঝারি দ্বীপ। মাঝে মাঝে দুটো দ্বীপের ভিতরকার সরু খাঁড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে। দ্বীপের উপকূলে দেখা যায় কৌতূহলী দ্বীপবাসীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখছে। ওরা প্রায় উলঙ্গ, কালো কুচকুচে দেহ, নাদা পেট, কোঁকড়া চুল, বিকট চেহারা। ওয়াংগা বলল, 'এরাই মাওরী নরভুক জাতি।'

অরিজিৎ বলল, 'ক্যাপ্টেন কুককে তো এরাই হত্যা করেছিল, এই অসভ্যরাই, তাই না দাদা?'

অভিজিতের হয়ে সুব্রত জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এরাই। হাতে পেলে এরা যে আমাদেরও হত্যা করবে না, আগুনে আধপোড়া করে আমাদের দেহগুলো খেয়ে ফেলবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

অভিজিৎ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবেই বলল, 'না, কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই।'

লঞ্চ চলেছে। দু' ধারে খাঁড়ির উপরে মাদল বাজে মাওরীদের ডুং ডাং ডুং ডুং। বাজনা যারা বাজায় তাদের কাছে এই শব্দ খুব মধুর, কিন্তু যারা শোনে তাদের ভেতর জাগে ভয়। যখন শত শত মাদল একসঙ্গে বেজে ওঠে—আতঙ্কে বুক কাঁপে। গা ছমছম করে অভিজিৎ, সুব্রত ও অভিজিতের। গুলিভরা রাইফেল কেবিনের ভেতরেই রাখে। কি জানি, প্রিন্স উইলিয়াম জাহাজের মত এই লঞ্চও অস্ত্রহীন কিনা। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করা উচিত।

এদিকে দ্বীপ, ওদিকে দ্বীপ—এঁকেবেঁকে পথ চলে সী-উল্‌ফ। সমুদ্রের খাঁড়ির ভেতর দেখা যায় দল বেঁধে ভেসে বেড়াচ্ছে কুমীরের দল।

মাঝে মাঝে জঙ্গলও রয়েছে সমুদ্রের পাড়ে। সেখানে দেখা যায় বাঘ।

তারা কেউ না কেউ মাঝে মাঝেই রাইফেল ছোড়ে খাঁড়ি ও জঙ্গল লক্ষ্য করে। বাঘ বা কুমীর শিকার করা উদ্দেশ্য না হলেও তারা হাতকে চালু রাখার চেষ্টা করে। ওয়েলিংটন থেকে রাইফেল কেনার পর তারা আর প্র্যাকটিস করার সুযোগ পায়নি। মাঝে মাঝে গুলি খেয়ে কুমীরের দল ছুটে পালায়, সমুদ্রে জল খেতে আসা বাঘ বিকট গর্জন করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে—দেখে বেশ কৌতুক অনুভব করে বিশেষভাবে অভিজিৎ।

ওয়াংগা মাঝে মাঝে বলে, 'এখনই বন্দুক চালিয়ে গুলি নষ্ট করো না। ডাইনী দ্বীপে সেগুলি কাজে লাগতে পারে। এজন্যই তো বড় বাওয়ানা বন্দুকের বদলে বল্লম চালাত। তোমরা তো বল্লম চালাতে শেখনি। আমি সঙ্গে কিছু বল্লম এনেছি। ডাঙ্গায় উঠলে তোমরা শিখে নিতে পারবে।'

অভিজিৎ হাসতে হাসতে বলে, 'সত্যি কথা ওয়াংগা। তবে তার আগেই রাক্ষুসে পাখিদের ঠোঁটের খোঁচায় মাথা ফুটো হয়ে মারা না পড়ি।'

এর মধ্যে একদিন লঞ্চে একটু হৈ-চৈ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে ওষুধ চুরি গেছে। ছোট লঞ্চ, এতে কোন ডাক্তার নেই। লস্করদের কোন অসুখ-বিসুখ হলে ক্যাপ্টেনই মোটামুটি চিকিৎসা করেন। একটা ছোট আলমারিতে ওষুধপত্র সাজানো থাকে! 'বিষ' লেবেল লাগানো একটা শিশি হঠাৎ সেখান থেকে লোপাট হয়েছে। ক্যাপ্টেন তাই মাল্লাদের উপর ভীষণ রাগারাগি করলেন।

অভিজিৎ মাল্লাদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াল। সে বলল, 'ওরা বিষ চুরি করবে কেন? কাকে বিষ খাওয়াবে?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'বড় বজ্জাত ওরা। কার মনে কি আছে বলা যায় কি? ওরা কেউ অহমিয়া, কেউ আরাকানী, কেউ বর্মী—এদের

ভেতর পলাতক খুনী আসামী আছে কিনা তাই বা কি করে জানব।'

সুব্রত জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি বিষ ছিল ক্যাপ্টেন?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আর্সেনিক। লঞ্চে ইঁদুরের উৎপাত হয় খুব মাঝে মাঝে। তখন ঐ আর্সেনিক মাখানো রুটি বিস্কুট এখানে ওখানে ফেলে রাখি, তাতেই ইঁদুরের বংশ লোপাট হয়ে যায়।'

সুব্রত বলল, 'আর্সেনিক বিষে তো মানুষও মরে।'

'তা মরে বৈকি।' ক্যাপ্টেন বললেন।

নিজেদের কেবিনে ফিরে এসে সুরজিৎ, সুব্রত আর অরিজিৎ পরামর্শ করতে লাগল, 'খাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে কুকার আছে, ওয়াংগা যদি রেঁধে দেয় ভালই, না হয় নিজেরাই রেঁধে খাব। নইলে একটা কিছু অঘটন ঘটলে ডাইনী দ্বীপে পৌঁছবার আগেই আমরা মরা ইঁদুরের সামিল হয়ে যাব।'

ছোট লঞ্চ, লোকজন কম। তা' হলেও কাজের কমতি নেই। ক্যাপ্টেনকে যেমন নানা রকমের কাজ করতে হয়, বাবুর্চি রহমতকেও রান্নার কাজ ছাড়া হাত লাগাতে হয় অন্যান্য কাজে। আর্সেনিক চুরি যাওয়ার পর দু'তিন দিন কেটে গেছে, ঘটনার কথা অনেকেরই আর মনে নেই। সন্ধ্যার পরেই রহমতের ডাক পড়ল বয়লারে কয়লা ঠেলবার জন্য। কারণ বয়লারে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে একজনের খুব জ্বর হয়েছে।

রহমত বয়লারে গেল, ওয়াংগা ঢুকল বাবুর্চিখানায়।

ওয়াংগা হল যাত্রী, লঞ্চের কোন কাজে সাহায্য করার কথা নয় তার। তবে সে লোক ভাল, খাটতেও পারে খুব। তাই ক্যাপ্টেনকে বলে রেখেছে, দরকার হলে তাকে যে কোন কাজের ভার তিনি দিতে পারেন। আজ কি হঠাৎ খেয়াল হল ক্যাপ্টেনের, ওয়াংগাকে ডেকে বললেন, 'পারবে হে, এ বেলাটা বাবুর্চিখানার কাজটা চালিয়ে দিতে? তোমার মালিকদের রান্না তুমিই নাকি করে দাও আজকাল। আজ এক সঙ্গেই সব চাপিয়ে দাও না।'

ওয়াংগা রাজী হয়ে গেল। বেশী কিছু হাঙ্গামা তো নয়। লস্করদের জন্য একটা আলুর ঝোল আর ভাত রাঁধতে হবে। ক্যাপ্টেনের জন্য বরফে জমানো মাংস বের করে নিয়ে রাঁধতে হবে তারই একটা সুরুয়া। তিনি ভাত খান না, তাঁর জন্য প্যাক করা পাঁউরুটি রয়েছে।

আজ সবার রান্না ওয়াংগা এক জায়গাতেই করছে। মশলাপাতি কোথায় কি আছে জানা নেই, ঘাঁটাঘাঁটি করতে হচ্ছে শিশি-বোতল কৌটো সবকিছু। তেল কই? তেল? ছোট বোতলটাতে তো এক ফোঁটাও নেই! ঐ টিনটাতে হয়ত থাকতে পারে।

টিনটা ভর্তি আছে মনে করে সেটা তুলবার জন্য বেশ খানিকটা জোরেই টান দিল ওয়াংগা। ফলে টিন তো উঠে এলই, যে কাঠখানার উপরে টিন বসানো ছিল, সেটা সড়াৎ করে খানিকটা সরে গেল। তার নীচে বেরুল ত্রিপলের টুকরোয় মোড়া একটা পাতলা প্যাকেট।

তেলের টিনের তলায় এটা কেন? নিছক কৌতূহলের বশেই ওয়াংগা খুলে ফেলল সেই প্যাকেটটা। একটা হিজিবিজি নক্সা। দেখে কিছুই বোঝা যায় না। তার নীচে ওটা আবার কী? হাতে নিয়েই চমকে উঠল ওয়াংগা। এ জিনিস যে তার চেনা। এই যে এর পাতায় বাওয়ানার হাতের খুদে খুদে লেখা। পড়তে না পারুক, বাওয়ানার লেখা সে চেনে। তার প্রাণদাতা বাওয়ানার খাতা এখানে কেন?

খাতা হাতে করে আনন্দ, কৌতূহল ও উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল ওয়াংগা।



ছয়

ওটাম্বা দ্বীপে এসে নোঙর ফেলল 'সী-উলফ্'।

রহমত বাবুর্চি তখন হাতে পায়ে শেকল-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে লঞ্চের গুদাম ঘরে।

ওয়াংগা খাতাটা পেয়ে ছুটে এসে অভিজিৎকে দেখাতেই সেও চিনতে পেরেছিল। তারপর সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিল ক্যাপ্টেনের ঘরে। বলেছিল, 'এই লঞ্চে একটি মারাত্মক চোর আছে।'

আর্সেনিক চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা তখনও ক্যাপ্টেনের মাথায় ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, 'চোর তো আছেই। লোকটা কে তা বুঝতে পারাই মুস্কিল।'

সুব্রত বলেছিল, 'বুঝতে পারা মোটেই মুস্কিল নয়। বাবুর্চিখানা তল্লাসী করুন।'

তাই করা হল। একটা ভাঙা হাঁড়ির ভেতর থেকে বের হল চুরি যাওয়া আর্সেনিকের শিশিটা। ক্যাপ্টেন শিশিটা দেখে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'যাক্, একটুও খরচ হয়নি! কিন্তু কি করতে এটা এনেছিল?'

সুব্রত বলল, 'যা করতে এনেছিল তা করবার সুযোগ আমরা দেইনি বলেই একটুও বিষ খরচ হয়নি। এখন এক কাজ করুন। রহমতটিকে বেঁধে ফেলুন আর গুদামঘরে তালা বন্ধ করে রাখুন। খোলা জায়গায় রাখলে ওয়াংগা ওর ঘাড় মুচড়ে দেবে।'

সত্যই ওয়াংগা বাঘের মত গজরাচ্ছিল। তার বাওয়ানার খাতা কে চুরি করেছে, কেন চুরি করেছে? এই ছিল তার মনের ক্ষোভ।

অবশ্য কি ভাবে কোথা থেকে রহমত চুরি করেছে অভিজিৎরা তা

ওয়াংগার কাছে প্রকাশ করেনি। রহমতই যে ইন্দ্রনীল একথা এখন তারা জানতে পারলেও ঘুণাক্ষরেও জানতে দিচ্ছে না কাউকে।

এমনি সময়েই ওটাম্বা দ্বীপে এসে লঞ্চ ভিড়ল। যাত্রা শেষ। এবার আবার ফিরে যাবে ওয়েলিংটনের দিকে। অভিজিৎরা ভাবল, যাক্, ভালই হয়েছে। রহমত বনাম ইন্দ্রনীল ফিরে যাক্ এই লঞ্চে! সেখানে নিয়ে ক্যাপ্টেন তাকে পুলিসে দিক বা ছেড়ে দিক যা খুশী করুক।

রহমত পড়ে আছে গুদাম ঘরে। হাত পা বাঁধা, তার উপর ঘরের দরজায় তালা বন্ধ। লঞ্চ আর চলছে না, এইটুকুই সে বুঝতে পারছে। কিন্তু যে জায়গায় থেমে আছে—সেখান থেকেই কি ফিরে যাবে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে? এই অবস্থায় সে তা জানতে পারেনি।

রহমত জানে, আর্সেনিক ধরা পড়ার জন্যই তার এই অবস্থা। স্থরজিতের যে খাতা তেলের টিনের নীচে থেকে বেরিয়ে পড়েছে, সেখাতা যে এখন আবার স্থরজিতেরই ভাইয়ের হাতে, তা সে জানতে পারে নি। তার ছদ্মবেশ যে অন্ততঃ দু'টি লোকের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে, এটা তার মাথায় ঢোকেনি এখনও। এখনও সে আশা করছে কোন কৌশলে সে এই বন্দীশালা থেকে মুক্ত হবে, খাতাখানা নিয়ে লঞ্চ থেকে নামবে, আবার রওনা হবে ডাইনী দ্বীপের দিকে। টাকা? টাকা সে এক মুহূর্তের জন্যও কাছ ছাড়া করেনি। তার কোমরে চামড়ার থলির ভিতর নিউজিল্যাণ্ডের নোট রয়েছে হাজার দশেক টাকার। কাজেই তার আর ভাবনা কি?

লঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার সময় হল অভিজিৎদের। মোটঘাট জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গিয়েছে ওয়াংগা। তার সঙ্গে কিছু মালপত্র নিয়ে অরিজিৎও গিয়েছে। স্থব্রত বিদায় নিচ্ছে ক্যাপ্টেনের কাছে। অভিজিৎকে সে ধারে কাছে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় অভিজিৎ? আবার কি কেবিনে ফিরে গেল কোন দরকারে? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্থব্রত কেবিনের দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছে, এমন সময়

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে থেকে উঠে এল অভিজিৎ।

'নীচে গিয়েছিলে কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সুব্রত।

'রহমতের অবস্থাটা একটু দেখতে গিয়েছিলাম।' জবাব দিল অভিজিৎ।

'ওর অবস্থাটা দেখে তোমার মনের দুঃখ আবার উথলে ওঠেনি তো? তোমার যা দয়ার শরীর। এখন তাড়াতাড়ি চল, সিঁড়ির নীচে নৌকা আছে, সেই নৌকা করেই তো লঞ্চ থেকে তীরে পৌঁছতে হবে।'

তাড়াতাড়ি করে নীচে নেমে গেল দু'জনে।

অভিজিৎ কি শুধু রহমতকে দেখতেই গিয়েছিল, না গিয়েছিল অন্য কারণে? তবু সুব্রতকে সেকথা সে বলতে পারল না কেন? গুদাম ঘরের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে সে কথা বলে এসেছে রহমতের সঙ্গে। আশেপাশে মাল্লারা ছিল, তাই 'ইন্দ্রনীল' নামটা আর ব্যবহার করেনি।

অভিজিতের গলা তো ভুলবার নয়। রহমত চমকে উঠেছিল। জবাব দিতে পারে নি হঠাৎ, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'কি!'

অভিজিৎ বলল, 'আমরা নেমে যাচ্ছি, লঞ্চ আর যাবে না। বিদায় নিতে এলাম।'

'লঞ্চ যাবে না?' কথাটা শুনে রহমত উঠে বসবার চেষ্টা করল। 'এ লঞ্চ তবে কোথায় ফিরে যাবে?'

সে কথার আর জবাব দিল না অভিজিৎ। শুধু বলল, 'একদিন তুমি বন্ধু ছিলে। তুমি তা ভুলে গেছ, আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি। তুমি অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে না—এটা বিশ্বাস করতে পারলে তোমাকে সঙ্গে নিতাম। কলকাতায় ফিরে যাও, যদি হীরে-টিরে পাই, আর ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারি, হীরের ভাগ তোমাকে দেব। আপাততঃ তোমার কাছে হয়ত টাকা নেই। কলকাতায় ফেরার জন্য তোমাকে এইটে দিলাম, রাখো।' বলে এক তাড়া নোট ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে অভিজিৎ রহমতের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

তারপর তড়তড় করে উঠে গিয়েছিল সিঁড়ি বেয়ে।

অভিজিৎ চলে যাবার পর ইন্দ্রনীলের হুঁশ হল। এ যেন মৃত্যুর অন্ধকার মাঝে জীবনের আলোর ঝলকানি। ইন্দ্রনীলের ভিতরের মনটা যেন নাড়া দিয়ে উঠল। এ কী কাজ করে গেল অভিজিৎ? এটা কৃতজ্ঞতা না অন্য কিছু? বিশ্বাসঘাতকতার জবাবে কি কেউ এভাবে পুরস্কার দেয়?

এবার আসল ইন্দ্রনীলের মনটা যেন ভিতর থেকে নাড়া দিয়ে উঠল। শুভবুদ্ধি আর দুষ্টবুদ্ধির লাগল দ্বন্দ্ব। একবার কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে, আবার মনে জেগে ওঠে শয়তানী বুদ্ধি। ইন্দ্রনীল ভাবে, এটা অভিজিতের চালাকী ছাড়া আর কিছু নয়। অভিজিৎ চায় যাতে ইন্দ্রনীল ডাইনী দ্বীপে আর না যায়।

কিন্তু ডাইনী দ্বীপে যাওয়াও কি আর সম্ভব? লঞ্চ তো ফিরে যাচ্ছে আমাকে নিয়ে। এখন তা'হলে কি হবে?

হঠাৎ তার মাথার ভিতর মগজটা যেন কিলবিলিয়ে ওঠে। তীরে এসে তরী ডুববে? কত বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে সে কলকাতা থেকে এতদূর আসতে পেরেছে, আর এই টুকু সে যেতে পারবে না? এই লঞ্চ থেকে কি নেমে যাওয়ার কোন উপায় নেই?

সত্যি কি উপায় নেই কিছু?

হ্যাঁ, উপায় আছে। মাথার মগজই তার বুদ্ধিটা যোগায়। টাকা! টাকা দিয়েই সেই উপায় বের করা যাবে। নিজের টাকা একটিও খরচ না করে, অভিজিৎ যে টাকা দিয়ে গেল, সেই টাকা দিয়েই সে কাজ হাসিল করতে পারবে।

কিছুক্ষণ পরেই দরজা খুলে রহমতের খাবার নিয়ে এল একটা লোক। তার হাতের শিকলও খুলে দিল। রহমত সুযোগ বুঝে জড়িয়ে ধরল লোকটার হাত। বলল, 'তোমাকে টাকা দেব। আমাকে নামিয়ে দাও এই লঞ্চ থেকে।'

লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেল। 'তোমাকে নামিয়ে দেব, একি বলছ তুমি? আমার চাকরি থাকবে না যে।'

রহমত বলল, 'কি করে ধরবে তোমাকে? আর যদি ধরাই পড় তবে না হয় চাকরি ছেড়ে দেবে। আমি তোমাকে পাঁচশ' টাকা দেব।'

লোকটা যেন কি ভাবল। তারপর বলল, 'আরও কিছু দাও তো ভেবে দেখি।'

রহমত এবার বলল, 'এক হাজার টাকা দেব তোমাকে। তুমি এই লঞ্চ থেকে আমাকে কোন ভাবে নামিয়ে দাও।'

খানিকটা লোক দেখানো ওজর আপত্তি করে লোকটা রাজী হয়ে গেল। বলল, 'রাত্রিবেলা যখন খাবার নিয়ে আসব তখন হাতের শেকল শুধু নয়, পায়ের শেকলটাও খুলে দেব। খুলে দেব গুদামের দরজা। তুমি পালাবে।'

রাত্রিবেলা সেই ব্যবস্থামতই কাজ হল। কড়কড়ে হাজার টাকা গুনে নিয়ে রহমতের হাতের ও পায়ের শিকল খুলে দিল লোকটা। খুলে রেখে গেল গুদামের দরজা। মনে মনে ভাবল, ক্যাপ্টেন যদি আমাকে এ জন্য শাস্তি দেয়, দিক্। হাজারটা টাকা তো লাভ হল।

ওটাম্বা খুবই ছোট দ্বীপ। কোন মাওরি এ দ্বীপে বাস করে না। কী করে বাস করবে? ফসল ফলাবার মত জায়গা নেই এখানে, মানুষও এখানে কদাচিৎ আসে, তাই তাদের ধরে খাবার ভরসায় থেকে কি লাভ? বনজঙ্গল আছে বটে, কিন্তু তাতেও কোন জানোয়ার নেই। না থাকার ঐ একই কারণ। মানুষের যেমন খাদ্য নেই এ দ্বীপে, পশুরও নেই।

দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই অভিজিতের কাছে। নরখাদকের কোন উৎপাত নেই, তা ছাড়া তাদের সঙ্গে আছে প্রায় ছয় মাসের মত রসদ।

লঞ্চ থেকে নৌকায় উঠে তীরে গিয়ে নামল তারা। দ্বীপটার উপর সবাই চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। এখানে কিছুক্ষণ তাদের বিশ্রাম করতে হবে। ওয়াংগা লেগে গেল মাছ ধরার কাজে। একটা ডোবা আছে

বনের ধারে, জোয়ারের সময় তাতে সমুদ্রের জল ঢোকে। সেই ডোবা থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে অনেক বড় বড় গলদা চিংড়ি সে ধরে নিয়ে এল।

সুব্রত বলল, 'ওয়াংগার উপস্থিত বুদ্ধি খুব আছে। একটা মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা তো করে ফেলল।'

অভিজিৎ বলল, 'একটা সমুদ্র তো পার হয়ে এলাম, এখন আমাদের সামনে অকূল পাথার। এই মুখরোচক খাদ্য খেয়ে তারপর সেই দুর্গম পথ পাড়ি দেবার বুদ্ধিটা বের করতে হবে। সেটাও কম চিন্তার কথা নয়।'

চিন্তার কথাই বটে! ডাইনী দ্বীপ এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল। সেখানে পৌঁছবার উপায় করতে হবে। ওয়াংগা আর অরিজিতের কথা মতো ওয়েলিংটন থেকে পাকা চামড়া কিছু কিনে আনা হয়েছে। ওটাম্বা দ্বীপে বাঁশ পাওয়া যায় অনেক। বাঁশ কেটে তাই দিয়ে একটা নৌকোর কাঠামো তৈরি করতে হবে। সেই কাঠামোর ছাউনি হবে চামড়া দিয়ে। সেই নৌকায় জল উঠবে না, অথচ এত হাল্‌কা হবে যে দু'জন লোক অনায়াসেই বয়ে নিয়ে যেতে পারবে ডাঙায়।

ওয়াংগা বলল, 'আমি বাঁশ কেটে নিয়ে আসি। বলেই সে একটি কুড়োল নিয়ে বনের দিকে চলে গেল। অরিজিৎও গেল তার সঙ্গে। সুব্রত আর অভিজিৎ তাদের মালপত্রগুলো টেনে নিয়ে আসতে লাগল বনের ছায়ায়। কারণ সমুদ্রের ধারে রোদ্দুর বড় বেশী, ছায়া দেবার মত কোন গাছও সেখানে নেই।

অর্ধেক মালপত্র যখন বনের ভেতর এসে গেছে, সেই সময় অভিজিৎ বলে উঠল, 'বিস্কুটের টিন দশটা ছিল, নয়টা কেন?'

'সমুদ্রের ধারে পড়ে নেই তো?' জিজ্ঞেস করল সুব্রত।

'দেখে আসি', বলে অভিজিৎ তাড়াতাড়ি চলে গেল ওদিকে, আর সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'না, নেই। এখানে একটাও নেই।'

আশ্চর্যের ব্যাপার তো! তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল এদিক থেকে ওদিকে। না, পাওয়া যাচ্ছে না একটি বিস্কুটের টিন।

সুব্রত বলল, 'এই বনে বানর নেই তো? দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু থাকাও বিচিত্র নয়। গাছ থেকে নেমে এসে বিস্কুটের টিন হয়ত তুলে নিয়ে গেছে।'

অভিজিৎ বলল, 'তা'হলে তো বড় মুস্কিলের কথা। সব সময়েই বন্দুক বাগিয়ে ধরে পাহারা দিতে হবে একজন।'

সুব্রত বলল, 'শুধু বানর কেন, এখানে অনেক কিছু থাকতে পারে। ভুললে চলবে না যে ডাইনী দ্বীপ এখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে।'

'ডাইনীরা এখানে এসেও চড়াও হতে পারে বলে মনে হয় নাকি সুব্রত দা?' একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলল অভিজিৎ।

'ওটা কী, তাকিয়ে দেখ তো!' আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল সুব্রত।

'পাখি! খুব বড় পাখি বটে। ঈগল পাখি নাকি? এ অঞ্চলে ঈগল আছে বলে তো ভূগোল বলে না।'

'না, ঈগল নয়। ওর দু'খানা ডানা ছড়িয়ে আছে অন্ততঃ পঁচিশ ফুট জায়গা নিয়ে। কোন ঈগলের এত বড় ডানা হয় না।'

'ক্ষেপে গেলে অনায়াসেই একটা মানুষের আয়ু শেষ করে দিতে পারে। ডাইনী দ্বীপের রাক্ষুসে পাখি নয় তো? ওয়াংগা কাছে থাকলে বলতে পারত।'

পাখিটা একখণ্ড ছাই রং-এর মেঘের মতো উড়তে উড়তে সুদূর আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়াংগা ঠিক সেই সময়েই তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কাঁপা গলায় সে বলে উঠল, 'আমরা ওকে রাক্ষুসে পাখিই বলি। কিন্তু মাওরিরা ওকে কি বলে জান?'

অরিজিৎ তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার কৌতূহল আরও বেশি হয়ে উঠল. সে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলে?'

ওয়াংগা বলল, 'যে সব মানুষকে ওরা হাজার হাজার বছর ধরে পুড়িয়ে খেয়েছে, তারাই এখন ডাইনী হয়ে আছে ঐ ওদিকে ডাইনী

দ্বীপে। তারাই এখনও মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। মাওরিরা বলে, ও পাখি নয়—পাখির আকারে ডাইনী ওরা।'

কথা শুনে একটা ভয় ও রোমাঞ্চ জেগে উঠল অরিজিতের মনে। অভিজিৎ ও সুব্রত মনে মনে হাসল। তবু কি জানি কেন, ঐ আজগুবি কথা শুনে ওরা মন খুলে হাসতে পারল না। সাগরের নীল জলের উপর দুপুরের জ্বলন্ত রোদ্দুর জ্বলছে যেন গলানো আগুন। আকাশের নীল বুকে দূরে দূরে উড়ছে ঐ ডাইনীপাখিরা—যারা নাকি আগুনে-পুড়ে মরা অভাগা মানুষদের বিদেহী আত্মা। অথচ তীরে এই নির্জীব বনানী—পশু না পাখির কোন চিহ্ন এখানে চোখে পড়ে না। গা যেন ছমছম করে ওঠে।

সুব্রতই প্রথমে ঝেড়ে ফেলে এই শরীর শিরশির করা ভয়াতুর ভাবটা। ওয়াংগাকে বলল, 'মাওরিরা যা বলে বলুক। তুমি কি নিজে ওদের ডাইনী বলে বিশ্বাস কর? ভয় যদি তোমার মনে থাকে তবে তুমি আর এগিও না। সেবারও তো তুমি ওটাম্বা দ্বীপ থেকেই ফিরে গিয়েছিলে?'

ওয়াংগার চোখ ছল ছল করে উঠল। বলল, 'এই পাপেই আমি আমার বাওয়ানাকে হারিয়েছি। আমি সঙ্গে থাকলে কোন বন মানুষের সাধ্য হত না বাওয়ানার চোখ উপড়ে নেবার। কোন ডাইনী পাখি পারত না ঠোকর মেরে তার চোয়াল ভেঙ্গে দিতে। না না, এক ভুল দু'বার ওয়াংগা করে না। বাওয়ানাকে হারিয়েছি, তার ভাইদের আমি জীবন দিয়েও রক্ষা করব।'

আর কোন কথা হল না। এক টিন বিস্কুট সকলের অজান্তে উধাও হয়ে যাওয়ার কথা আর তুলল না কেউ। তা'হলে ওর আতঙ্ক আরও বেড়ে যাবে। ভাববে, ডাইনীরাই ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে টিনটাকে। কিছু বলার দরকার নেই, শুধু সতর্ক হয়ে দেখতে হবে কোথায় কি ঘটছে!

বাঁশের কাঠামো তৈরি করে ফেলেছে ওয়াংগা আর অরিজিৎ। অরিজিতের কার্পেন্টারী বিদ্যা কাজে লাগল এবার। বাঁশের কাঠামোর

উপর চামড়ার ছাউনি দেওয়া হল। সরু সরু পেরেক দিয়ে বাঁশের সঙ্গে এঁটে দেওয়া হল সেই চামড়া। তার উপরে আবার মাঝে মাঝে পাতলা পাতলা বাখারি। বাঁশ থেকে চামড়া খুলে যাওয়ার কোন ভয় রইল না। চামড়া ভেদ করে জল উঠবারও উপায় রইল না কোন।

জলে ভাসিয়ে পরীক্ষা করা হল নৌকাটাকে। বাঁশ দিয়ে ছোট ছোট বৈঠা তৈরি করেছিল অরিজিৎ আর ওয়াংগা। সুব্রত আর অরিজিৎ সেই বৈঠা দিয়ে নৌকা বাইতে লাগল।

বেলা পড়ে এসেছে। অভিজিৎ বলল, 'মালপত্র আজই নৌকায় বোঝাই করে রাখা যাক, কাল সকালেই রওনা হওয়া যাবে।'

আপত্তি করল ওয়াংগা, 'তা করার দরকার নেই ছোট বাওয়ানা। রাত্রিবেলা কত কি বিপদ ঘটতে পারে। নৌকায় মাল তো বোঝাই করবই না, নৌকাও জলে রাখব না। কাল সকালেই যা করার করা যাবে। আজ রাতটা তো ভালয় ভালয় কাটুক।'

ছোট দ্বীপ, এ মাথা থেকে ও মাথা দেখা যায়। লোকজন নেই। লঞ্চের যাত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগ যাত্রীই আগের সব বন্দরে নেমে গিয়েছিল। এখানে নেমেছিল মাত্র কয়েকজন। তারা অন্য একটি লঞ্চ ধরে চলে গেছে নির্দিষ্ট জায়গায়। কিন্তু অভিজিৎদের ঐ লঞ্চে গেলে চলবে না। তাই তারাই শুধু এখানে রয়ে গেছে।

নির্জন দ্বীপ। বনজঙ্গল দু'একটা থাকলেও জন্তু-জানোয়ার কোথাও চোখে পড়ে না। তবে সাপ অবশ্য থাকতে পারে। তাতে ভয়ের কিছু নেই। কারবলিক এসিড আছে তাদের সঙ্গে। সুব্রত ডাক্তার মানুষ, পাহাড় জঙ্গলের দেশে যাচ্ছে বলে অন্যান্য ওষুধপত্রের সঙ্গে কারবলিক এসিডও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ঠিক হল, চারদিকে এসিড ছড়িয়ে শুয়ে থাকবে চারটি মানুষ। জিনিসগুলিও থাকবে তাদের পাশেই।

রান্না সেরে নিয়ে খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল সন্ধ্যার পরেই। ওয়াংগা বলল, 'ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। কাল সারাদিন বৈঠা বাইতে হবে সবাইকেই।'

এত ক্লান্তির পর ঘুমিয়ে পড়তে তাদের দেরি হল না।

ঘুম ভাঙল পরের দিন ভোরে।

ঘুম ভাঙতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তারা। জিনিসপত্র যেখানকার যা সব ঠিকই আছে। নেই কেবল নৌকা।

নৌকাখানা উধাও হয়েছে। বনের ভেতর নেই, সমুদ্রের ধারে নেই, জলের উপরেও ভাসছে না। কোথায় গেল নৌকা?

'একটা রাইফেলও নেই সুব্রতদা।' চেঁচিয়ে উঠল অভিজিৎ।



সাত

ক্রমে ক্রমে দেখা যেতে লাগল, আরও দু একটা জিনিস লোপাট হয়েছে। কিছু বুলেট, এক টিন মাংস আর এক কলসী জল।

সবাই সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এমন আশ্চর্য চুরি তো তারা কখনও দেখেনি।

ওয়াংগা বলল, 'ডাইনী দ্বীপের ওরাই—'

সুব্রত বলে উঠল, 'কি যা-তা বলছ ওয়াংগা। ডাইনীরা মাংস ভালবাসতে পারে, কিন্তু রাইফেল বুলেটের দরকার কি ওদের? আর আকাশে যখন ওরা উড়তে পারে, তখন নৌকা দিয়েই বা ওরা করবে কি? তুমি ওসব চিন্তা ছেড়ে এখন ভাবতে থাক কী উপায়ে ডাইনী দ্বীপে পৌঁছান যায়।'

কোন কিছু জবাব না দিয়ে ওয়াংগা বুঝি সে কথাই ভাবতে লাগল। বলল, 'চামড়া আরও থাকলে আর একটা নৌকা তৈরি করতে পারতাম। এখন কি করি?'

একটু ভেবে তার সমস্যা সমাধান করে দিল অরিজিৎ। বলল, 'এবার আর নৌকা নয়, ভেলা তৈরি করতে হবে।' কথায় ও ভঙ্গিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই ওয়াংগা উল্লসিত হয়ে উঠল। অরিজিৎকে সঙ্গে নিয়ে কুড়োল হাতে চলে গেল বনের ভিতর। এবার শুধু বাঁশ নয়, সরু সরু গাছও কেটে আনতে হবে কয়েকটা। এক সারি কাঠের গুঁড়ি পাশাপাশি সাজিয়ে উপরে বাঁশ নীচে বাঁশ বেঁধে দিলেই ভেলা তৈরি হবে। সে ভেলায় চড়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঢেউয়ের জল তার উপরে উঠবে। জিনিসপত্র ভেসে যাবে তাতে। কাজেই ভেলা করতে হবে দোতলা বা তেতলা। এক সারি গুঁড়ির উপর আড়াআড়ি আর এক সারি বাঁশ ফেললেই দোতলা হবে। তার উপর আর এক সারি হলেই তেতলা।

এ ব্যাপারে অরিজিতের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কার্পেণ্টারি বুদ্ধিটাই বেশী কাজে লাগল। বাঁশ আর গুঁড়িগুলো করাত দিয়ে কাটা হল বিভিন্ন মাপে। সেগুলো জায়গা মত সাজিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। এতেই কেটে গেল একদিন। তৈরি হল একতলা ভেলা। কাল হয়ত তেতলা পর্যন্ত হতে পারে, যদি না আজ রাত্রে এটা আবার লোপাট হয়ে যায়।

এ সন্দেহটা অবশ্য ওয়াংগার। যে ডাইনীর নৌকার দরকার হতে পারে, ভেলাতে তার অরুচি হবে কেন? আসলে ডাইনীরা চায় না যে বাওয়ানারা বার বার তাদের দ্বীপে হানা দেয়। তাই তারা এবার আগে থাকতে সাবধান হয়েছে, জলযান তৈরি হওয়া মাত্র তা উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

ওয়াংগার মনের ভাব বুঝতে পেরেই সুব্রত অভিজিৎকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মনে কর অভি?'

অভিজিৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল, 'আমার তো মনে হয় যে আর আমাদের কিছু এখন চুরি যাবে না।'

'কেমন করে একথা বলছ?'

'বলছি এ কারণে যে ইন্দ্রনীল একজন ছাড়া দু'জন নেই। আর

সেই ইন্দ্রনীল এখন আমাদের নৌকায় চড়ে এতক্ষণে ডাইনী দ্বীপের অন্ততঃ চার ভাগের এক ভাগ পথ বেরিয়ে গেছে।'

সুব্রত চোখ বড় বড় করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অভিজিতের দিকে। তারপর বলল, 'লোহার শিকলে বাঁধা দেখে এসেছি রহমতকে। এতক্ষণ সেই সী-উল্ফ লঞ্চেই অন্ততঃ পঞ্চাশ মাইল চলে যাওয়ার কথা ওয়েলিংটনের পথে। কি করে সে উল্টো দিকে আসবে?'

'ঘুষ! সুব্রতদা, ঘুষ!' জোরে জোরে মাথার চুল টানতে টানতে অভিজিৎ বলল, 'ঘুষের অসাধ্য কিছু নেই। সুসভ্য শহরেও না, সীমা হীন সমুদ্রের উপরেও না। আর সে ঘুষের টাকা আমি জুগিয়ে এসেছি ইন্দ্রনীলকে। নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরেছি সুব্রতদা।'

সুব্রত বলল, 'সী-উল্ফ লঞ্চে তা'হলে তোমাকে নীচ থেকে উপরে উঠতে দেখে যা ভেবেছিলাম তাই সত্য? মানুষ ঠেকে শেখে, কিন্তু তোমার দেখছি ঠেকেও শিক্ষা হল না।'

অভিজিৎ বলল, 'সত্যি, একান্ত মুর্খের মত কাজ করেছি আমি। ইন্দ্রনীল নৌকা পেয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু সে পথ চিনে যেতে পারবে কি? খাতাখানা আমাদের হাতে এসে গেছে। জাহাজের কেবিন থেকে যে নক্সা চুরি করেছিল, তাও ফেরৎ পেয়েছি। তার হাতে এমন কোন নিশানা নেই—যা দেখে সে ডাইনী দ্বীপে পৌঁছাতে পারে।'

সুব্রত বলল, 'সুরজিৎ বিনা নিশানাতেই পৌঁছেছিল তা ভুলে যাও কেন? তবে এটা ঠিক সুরজিতের বুদ্ধি বা সাহসের এক চতুর্থাংশও ইন্দ্রনীলের নেই। তবু আমার মনে হয় নক্সা দেখে নিশানা সে কিছু না কিছু ঠিক করে নিয়েছে, নইলে অজানা সমুদ্রে সে একা ডিঙি ভাসাতে সাহস করত না।'

অভিজিৎ বলল, 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় কিছুতেই আসছে না। আমাদের পাশ থেকে সে গুলি ভরা রাইফেল তুলে নিয়ে গেছে। আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। ইচ্ছা করলে সে আমাদের চার-জনকেই—'

সুব্রত বলল, 'না, চারজনকে একসঙ্গে সে কিছুতেই মারতে পারত না। সেরকম চেষ্টা করলে অনর্থই হয়ত ঘটত। অতি সহজে যা নিতে পেরেছে তাই নিয়েই সে সরে পড়েছে। লোকটা সব কাজই করে মাথা খাটিয়ে। নইলে পর পর বিপদে পড়েও এমন ভাবে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে কেমন করে?'

অভিজিৎ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এবার দেখা যাক্ কোন বুদ্ধির সে পরিচয় দেয়।'

পরের দিন ভেলার কাজ শেষ হল। ভেলাটিকে আগের নৌকার মত তাড়াতাড়ি চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। নৌকাটা ছিল যেমন খুব হাল্‌কা, এটা তেমনি বেজায় ভারী! হাল, বৈঠা তৈরি করতে হল ভেলার ওজনের অনুপাতে। তা ছাড়া লম্বা বাঁশ কেটে লগি তৈরি হল, তীরের কাছাকাছি জায়গায় বাইবার জন্য।

বাইতে কষ্টও হবে, সময়ও বেশী লাগবে ডাইনী দ্বীপে পৌঁছতে। অথচ রোদ্দুরের তেজ অসহ্য। পর পর তিন চারদিন যদি এই রোদ্দুরে পুড়তে হয়, তা'হলে অসুস্থ হয়ে পড়তে হবে। মোটা চাদর ছিল সঙ্গে। ভেলার চার কোণে চারখানা বাঁশ খাড়া করে তাইতে বেঁধে দেওয়া হল চাদরের চারদিক।

ওটাম্বা দ্বীপে তিন দিন কাটিয়ে চারদিনের দিন সকাল বেলায় খেয়ে দেয়ে সকলে উঠে বসল ভেলায়। ওয়াংগা লগি ঠেলে কিছুদূর যাবার পরই বৈঠা নিয়ে বসল। পাশাপাশি আর একটি বৈঠা নিয়ে বসল অরিজিৎ। নক্‌সা খুলে অভিজিৎ খুঁজতে লাগল পথের নিশানা। আর সুব্রত পেছনে হাল ধরে রইল বাঁ হাতে, আর ডান হাতে পাতা উল্টাতে লাগল সুরজিতের খাতার। রাইফেল আর বল্লম শোয়ানো রয়েছে ভেলার মাঝখানটিতে।

সুরজিতের খাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ একসময় বলে উঠল সুব্রত, 'জানো অভি, একটা মস্ত বড় ভুল আমরা এতদিন করে আসছি।

তোমার দাদার এই খাতাখানি আমরা কেউ ভাল করে পড়িনি। এই যে সাত আটখানা পাতা গোড়ার দিকে—'

'সত্যি তো, ওগুলো যে একদম সাদা।'

'সাদাই দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু সাদা হওয়া কি সম্ভব? এতকাল আমিও ভেবেছি এগুলো সাদা পাতা। কিন্তু আজ কি জানি কেন সন্দেহ হয়েছে আমার। তোমার দাদা বিনাকারণে কোন কাজ করতেন না বলেই আমি মনে করি।'

'তবে এর কি কোন রহস্য আছে বলে আপনার মনে হয় সুব্রতদা?'

'মনে হয় ওতে কিছু লেখা আছে। লেখা আছে অদৃশ্য কালিতে।'

'অদৃশ্য কালি? তা'হলে কি দাদা আপনাকে বলে যেতেন না?'

'কতক্ষণ সে ভালভাবে কথা বলতে পেরেছিল আমার সঙ্গে? সব চেয়ে জরুরী যে বিষয়টা সেইটে বলতে বলতেই শ্রান্ত হয়ে পড়ল। তার পর কখনও জ্ঞান ছিল—কখনও ছিল না। এই ছিল তার অবস্থা।'

'সব চেয়ে জরুরী কথা বুঝি ছিল ঐ—নিউজিল্যাণ্ড থেকে বরাবর চলে যাও দক্ষিণ-পূবে হাজার মাইল—পাবে একটা বড় দ্বীপ—'

'ঠিক তাই। আমার মনে হয় সাদা পাতার পরেরটুকু তার অসুস্থ হয়ে পড়ার পরের লেখা। তখন আর অদৃশ্য কালি জোটাতে পারেনি হয়ত। অথবা বাকীটুকু যাতে সহজে মানুষের চোখে পড়ে সে ভাবে লেখাই তার উদ্দেশ্য ছিল।'

'তা হতে পারে। কিন্তু অদৃশ্য কালি তো আবার অনেক রকম আছে শুনেছি। কোনটার লেখা ফোটে আগুনের তাপে ধরলে, কোনটা বা এসিড গোলা জলে ডুবালে।'

'একে একে সব রকম পরীক্ষাই করে দেখব ডাঙায় উঠে। ভেলার উপরে থেকে এসব করা সম্ভব নয়। এখানে আগুন জ্বালান কষ্ট, তা ছাড়া এসিড রয়েছে ওষুধের বাক্সে। কিন্তু ওকি? কি হল?'

হঠাৎ ঝড় উঠল নাকি? মাথার উপর একটা দারুণ সোঁ সোঁ শব্দ শুনে চমকে উঠল সবাই। কিছু ভাববার সময় কেউ পেল না। মাথার

উপরকার চাদরটা ছিঁড়ে হু'টুকরো হয়ে গেল। আর সেই ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল—একটা রাক্ষুসে পাখি তীরবেগে তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। অভিজিৎ ও সুব্রত হু'জনেই রাইফেল উঁচিয়ে ধরল। কিন্তু তারা গুলি করার আগেই ভয়ার্ত চীৎকার করে ওয়াংগা বলল, 'ওদিকে নয়, গুলি কর পেছন দিকে। তাকিয়ে দেখ ঝাঁকে ঝাঁকে ডাইনীরা আমাদের মাথা ফুটো করে রক্ত খাবার জন্য আসছে।'

তাকিয়ে দেখল অভিজিৎ ও সুব্রত—সত্যই আর একটা পাখি এসে পড়েছে কাছাকাছি। পাখিটা লম্বা গলা বাড়িয়ে দিয়েছে নীচের দিকে। হুটো কুতকুতে লাল চোখ থেকে রক্ত ফেটে পড়ছে যেন। মাথার উপর এখন আর চাদর নেই। এবার ওদের ঠোঁটের ঠোকর পড়বে যে কোন সময়ে মাথার উপর।

এক সঙ্গে হুটি গুলি ছুটল রাক্ষুসে পাখির দিকে।

পাখিটা আকাশেই একটা ঘূর্ণীঝড় তুলে যেন ডিগবাজি খেল। তারপর একটা ভয়াবহ চীৎকার করে পড়ে গেল সমুদ্রের জলে এক খণ্ড পাহাড়ের টুকরার মত। পড়ল ভেলা থেকে মাত্র হাত দশেক পেছনে। জলে একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। ভেলার গায়ে লাগল বিষম দোলা। আর জল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল তাদের গা, মাথা, জিনিসপত্র।

'আরও আসছে,' আঙুল দিয়ে দেখাল ওয়াংগা।

সত্যই সেই পথ ধরে কাছে এসে পড়েছে আর একটা পাখি, তার পেছনে আরও একটা। আকাশে মেঘের ভেলা উড়িয়ে দিয়ে আসছে যেন একসারি ডাইনী পাখির মিছিল।

সুব্রত বলল, 'আমি রাইফেল চালাচ্ছি, তুমি দেরি কর একটু।'

সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল সুব্রতর রাইফেল, তার গুলি গিয়ে বি ধল সামনের পাখিটার বাঁ দিকের ডানায়। একটা বিকট ক্কো-ও-ও শব্দ, তারপরেই ডাইনে ঘুরে ধনুকের মতো বেঁকে পাখিটা তীরবেগে উঠে গেল উপর দিকে।

এর পরের পাখিটা আর কাছে এল না। দূর আকাশে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল দশবারোটা রাক্ষুসে পাখি। অভিজিৎ রাইফেল নামিয়ে রেখে বলল, 'এই কি তা'হলে টেরোড্যাকটাইল? দাদা যাদের কথা লিখে গিয়েছেন?'

অরিজিৎ সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ তাই হবে নিশ্চয়।'

সুব্রত বলল, 'এদের কথাই ওয়াংগাও গল্প করেছে। ওদের ডাইনী বলে ধারণা করা ওয়াংগার পক্ষে একটুও অন্যায় হয়নি। যা হোক্, মনে হয় ওরা আর আমাদের এখন আক্রমণ করবে না। ওরা বুঝতে পেরেছে যে শত্রুকে ঘায়েল করতে গেলে নিজেদেরও ঘায়েল হতে হবে।'

ওয়াংগা বলল, 'ওদের দ্বীপে আমাদের ঢুকতে দিতে চায় না ওরা। তাই এগিয়ে এসে আমাদের রুখতে চেষ্টা করছে।'

অভিজিৎ বলল, 'আমাদের আগে যে গিয়েছে, তার দশা তা'হলে কী দাঁড়িয়েছে ওদের পাল্লায় পড়ে? তার নৌকায় তো চাঁদোয়া ছিল না। রাক্ষুসে পাখির ঠোকরে তার মাথা ফুটো হয়ে যায় নি কি?'

অরিজিত বলল, 'হয়েছে হয়ত।'

সুব্রত বলল, 'হলে তো ভালই হয়।'

ইন্দ্রনীলের কিন্তু কোন বিপদ হয় নি। তার হালকা নৌকার উপর ছই বা কোন আবরণ ছিল না বলেই হয়ত রাক্ষুসে পাখিদের দৃষ্টি তার ওপর পড়েনি।

তিন দিন সে সমানে বৈঠা বেয়েছে। রোদে মাথা ফেটে যাচ্ছে, সারা গায়ে পড়ছে ফোস্কা। সে আপসোস করছে—ইস্, যদি একটা ছই থাকত বা একটা পাল!

কিন্তু বেচারী জানে না যে ওসব কিছু নেই বলেই সে রাক্ষুসে টেরোড্যাকটাইলের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছে। সীমাহীন সাগরের উপরে হালকা একটুখানি মোচার খোলার মত নৌকা আকাশ থেকে নজরেই পড়েনি পাখিদের।

ইন্দ্রনীল সারাদিন বৈঠা চালায়, রাত্রি বেলা নৌকায় শুয়েই সাগর দোলায় দোল খায়। সাগরে স্রোত নেই, ঢেউও নেই বললেই চলে। যেখানকার নৌকা প্রায় সেখানেই থেকে যায় সারারাত। ভোর হতেই উঠে ব'সে আবার বৈঠা ধরে ইন্দ্রনীল। খিদে পেলে দু'খানা বিস্কুট খায় আর পিপাসা পেলে খায় এক ঢোঁক জল। দুপুরের দিকে মোটামুটি পেট ভরে খেয়ে নেয় টিনের মাংস। তাও দু'তিন দিনের বেশি আর চলবে না। তা না চলুক, দু'তিন দিনের ভেতর ইন্দ্রনীল যা হ'ক একটা কিছু করেই ফেলবে। হয় পৌঁছে যাবে ডাইনী দ্বীপে, নয়ত ডুবে যাবে অতল সমুদ্রে।

খোলা সমুদ্র, কুল কিনারা নেই। কোথাও দেখা যায় না ডাঙার কোন চিহ্ন। নকসায় আছে সুংটান থেকে সোজা দক্ষিণে ডাইনী দ্বীপ। এখন সূর্যকে লক্ষ্য রেখে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। পঞ্চাশ মাইল পথ এ ভাবে এগিয়ে যেতে কে জানে কতদিন লাগবে ?

অবশেষে পাঁচদিনের দিন সকালে সে দেখতে পেল—সামনে ডাঙা। আকাশ ফুঁড়ে যেন একটা ধূসর পাহাড় উঠেছে। আরও কাছে এগিয়ে যাবার পর দেখল—লালচে পাথরের যেন একখানি খাড়া দেওয়াল। মাথার উপর সবুজের সমারোহ, বিশাল বিশাল গাছ। মনে হয় যেন অতবড় পাহাড়টার মাথা-জোড়া এক দুর্ভেদ্য অরণ্য।

অবাক হয়ে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনীল।

ঐ কি তা'হলে ডাইনী দ্বীপ ? আনন্দের চাইতে আশঙ্কাই জাগছে বেশী তার মনে। খাতাখানা সে চুরি করেছিল, পড়েও দেখেছে। লেখা অবশ্য সামান্যই ছিল তাতে। গোড়ার দিকে সবই সাদা পাতা। কিন্তু শেষ দিকে এক জায়গায় ভয়াবহ সব প্রাণীর কথা লেখা আছে। পৃথিবীর মানুষ জন্মাবার লক্ষবছর আগে যে সব অতিকায় প্রাণী বাস করত, তাদেরই বংশধররা অন্য সব দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবার অনেক পরে, আজও নাকি বেঁচে আছে এই দ্বীপে। তাদের আক্রমণ থেকে সুরজিৎ

রেহাই পায়নি। জীবন নিয়ে কলকাতা পর্যন্ত ফিরেছিল বটে, কিন্তু বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারে নি। ইন্দ্রনীল হয়ত এখান থেকে বেরুতেই পারবে না। বেরুবার একমাত্র উপায় এই হাল্‌কা নৌকা। এ আর ক'দিন টিকবে ? রাক্ষুসে প্রাণীদের নজরে এলে এর আয়ু আর কতক্ষণ ?

কিন্তু একটা দুরাশাও ঝিলিক দিয়ে উঠল মনের কোণে। হয়ত সে নিরাপদে ফিরতে পারবে। অগুণতি হীরে নিয়েই ফিরতে পারবে। রাতারাতি হয়ে উঠবে রাজরাজড়ার মত ধনী।

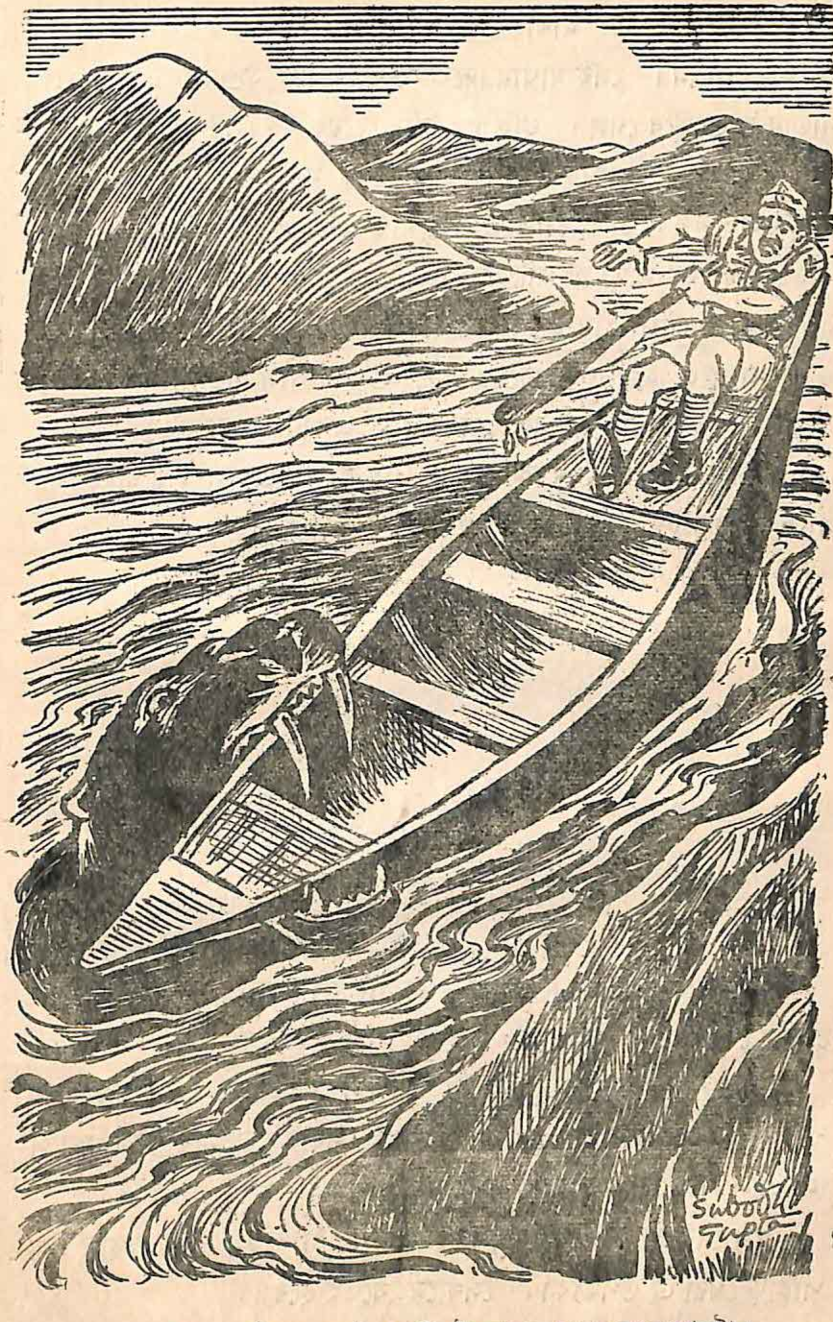
ঐ ত' ডাইনী দ্বীপ। ঐ পাহাড়। কিন্তু পাহাড়ে পৌঁছতে হলে অনেক কিছু বাধা অতিক্রম করতে হবে। তবু এত ঐশ্বর্য সে কি ফেলে যাবে কাছে এসে ? হীরে তার চাই। হীরের জন্য যদি জীবনটাই বিসর্জন দিতে হয়, তাও দেবে। টাকা না থাকলে জীবন রেখে কি লাভ ?

জামাটা গা থেকে খুলে ফেলল ইন্দ্রনীল। আস্তিন গোটান ছিল, মেলে ধরল সামনে। সেই আস্তিনের ওপর নক্‌সা আঁকা। কাগজের নক্‌সা সে হাতে পেয়েছিল, পেয়েই ভেবেছিল যে এটা একদিন আবার হাতছাড়াও হয়ে যেতে পারে। তাই জামার আস্তিনে নক্‌সার নকল তুলে রেখেছিল।

নক্‌সা দেখেই বোঝা যায় সুংটান দ্বীপ থেকে সোজা দক্ষিণে ডাইনী দ্বীপ। ডাইনী দ্বীপের একটা নদী সমুদ্রে এসে পড়েছে। সেই নদীর ধারা এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। নদীর তীরে অরণ্য, অরণ্য পেরিয়ে প্রান্তর। সেই প্রান্তরেরও শেষ হয়েছে ঐ পাহাড়ের পায়ের গোড়ায়। যে কোন দিক দিয়ে গেলেও পৌঁছোতে হবে পাহাড়েই।

কিন্তু পাহাড়ে উঠবার উপায় কি ? খাড়া পাহাড়। পাখির মতো পাখা পিঠে না থাকলে ঐ পাহাড়ের মাথায় ওঠার আশা নেই। অথচ পাহাড়ের ওপিঠে উপত্যকায় রয়েছে হীরের খনি।

জামাটা আবার গায়ে দিয়ে তৈরী হল ইন্দ্রনীল। নদীর মোহনার কাছে সে এসে গিয়েছে। ঐ নদীতে ঢুকতে হবে। বেশ বড় মোহনা, স্রোতও প্রবল। সেই স্রোত উজিয়ে যেতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে



সেই দাঁত দিয়ে নৌকার গলুইয়ের দিকটা কামড়ে ধরল জানোয়ারটা।

ইন্দ্রনীল।

এমন সময় একটা মাথা ভেসে উঠল জলের উপরে, ঠিক তার নৌকার সামনে। সেই মাথার দিকে চোখ পড়তেই ইন্দ্রনীলের হাত পা নাড়ার শক্তি উবে গেল। হাতীর মাথার চেয়েও বড় সেই মাথাটা। আর তার মুখের চেহারা অনেকটা সিন্ধু ঘোটকের মতো। তফাতের মধ্যে সিন্ধু ঘোটকের মতো দুটো সাদা লম্বা দাঁত নেই। তার বদলে আছে হাঙ্গরের দাঁতের মতো দু' পাটি হলদে দাঁত। সেই দাঁত দিয়ে নৌকার গলুইয়ের দিকটা কামড়ে ধরল জানোয়ারটা। আর সেই মুহূর্তে রাইফেল তুলে নিয়ে তার চোখের ভিতর গুলি চালাল ইন্দ্রনীল।

গুলি খেয়েই জানোয়ারটা নৌকাটাকে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিল। নৌকা উল্টে গেল সেই ঝাঁকুনিতে। তার ফলে ইন্দ্রনীল তার রাইফেল, মাংস ও বিস্কুটের টিন সব নিয়ে নদীর জলে ছিটকে পড়ল।



আট

সমুদ্র, নদী, অরণ্য, প্রান্তর—তারপর পাহাড়। সেই পাহাড়ের ঘেরার ভেতর উপত্যকা।

সমুদ্র পেরিয়ে ডাইনী দ্বীপে পৌঁছল অভিজিৎ, অরিজিৎ আর সুব্রত। কিন্তু নদী তো চোখে পড়ে না। নদীর মোহনায় তারা আসে নি, এসে পড়েছে মোহনা থেকে অনেক দূরে।

যেখানেই তারা এসে যাক্, ডাইনী দ্বীপ তো বটে! গন্তব্যস্থান হল পাহাড় ঘেরা ঐ উপত্যকা। সেখানে যেতেই হবে।

যদি দরকার হয়, পরে নদীটা খুঁজে নেওয়া যাবে। এখন সব চেয়ে বেশী জরুরী হল ডাঙায় নেমে রান্নার আয়োজন করা। অন্ততঃ ডাল ভাতও তাদের খেতে হবে। যেখানে ভেলা পৌঁছাল, সেখানেই লগি পুঁতে ভেলা বেধে ফেলল ওয়াংগা। তারপর তা থেকে মালপত্র সব টেনে তুলতে লাগল পাড়ের উপর। ঢালু বালির পাড়, টেনেটুনে ভেলাটাকেও খানিকটা দূরে টেনে আনা সম্ভব হল। তারপর সেখানে দু'খানা লগি পুঁতে, শক্ত করে ভেলা আটকে রেখে তিনজনে ঢুকল অরণ্যের মধ্যে। বালির চড়া পেরিয়েই অরণ্য শুরু হয়েছে।

একটা বড় গাছের তলায় রান্না চড়াল ওয়াংগা। আর সুব্রত একখানা জ্বলন্ত কাঠ উনুন থেকে তুলে নিয়ে বসল অভিজিতের সঙ্গে। আর আগুনের উপর মেলে ধরল সুরজিতের খাতা। সাদা পাতাগুলোর রহস্য তাকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। রহস্য যে আছে ঐ পাতাগুলোর ভেতর সে বিষয়ে সুব্রত নিঃসন্দেহ।

অরিজিৎ প্রথমে কিছু বুঝতে পারে নি, কিন্তু একটু পরেই আনন্দে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আগুনে ধরতেই সেই সাদা পাতায় ফুটে উঠতে লাগল কাল কাল লেখা। প্রথম পাতায় শুধু কয়েকটা কথাই ফুটে উঠল—যে পথে আমি গিয়েছি তার মাঝে মাঝে সাদা খড়ি-মাটির তীর আঁকা আছে।

দ্বিতীয় পাতায় একটা বীভৎস জীবের চেহারা আঁকা। একটা মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটা অতি খুদে আকারের। তার মুখে সুরজিতের আদল অতি স্পষ্ট।

সেই ছবিটা দেখে আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে অরিজিৎ বলল, 'ঐ ভয়ঙ্কর প্রাণীটার সামনে দাদা কি করে দাঁড়িয়েছিলেন? যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন ঐ প্রাণীটা তাঁকে কুটিকুটি করে ছিড়ে ফেলল না কেন?'

সুব্রত বলল, 'সুরজিৎ ঐভাবে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল, এটা বোধ হয় ছবির অর্থ নয়। সুরজিৎ বোঝাতে চাইছে জন্তুটা একটা মানুষের তুলনায় কত উঁচু আর কত মোটা। তা দশ বারোগুণ তো হবেই।'

অভিজিৎ বলল, 'বাব্বা! দশ বারোগুণ। দাদা ছিলেন পুরো ছয়ফুট লম্বা। ঐ জন্তুটা তা হলে ষাট-সত্তর ফুট উঁচু ?'

সুব্রত বলল, 'আর মোটাও সেই অনুপাতে। একটা বড় হাতিও এর কাছে যেন দৈত্যের পাশে বামন। মনে হচ্ছে এই জন্তুটাই হল প্রাচীন যুগের ডাইনোসরস। অত লম্বা সরু গলা, সামনের দিকে ছোট ছোট পা, অতি ছোট মাথা আর অতি ধারাল দাঁত—ঐ জন্তু ডাইনো-সরস না হয়ে যায় না।'

অরিজিৎ বলল, 'দাদা এদের দেখেছিলেন তা'হলে। একটা দেখবার মতো জিনিস দেখেছিলেন বলতে হবে।'

সুব্রত বলল, 'আমরাও দেখব নিশ্চয়ই, এবং সুরজিতের অবস্থাতেই পড়ব।'

একটা ভয় ও রোমাঞ্চ জেগে উঠল অরিজিতের মনে।

এমন সময় হঠাৎ ওয়াংগার চীৎকার শোনা গেল। কি হল ? উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল সবাই। লাফিয়ে উঠে সেদিকে ছুটে যেতেই তারা দেখতে পেল—মানুষের মত চেহারার একটা জীব বসে আছে বড় গাছটার সব চেয়ে নীচের ডালে। তার হাতে ওয়াংগার ভাতের হাঁড়ি।

অভিজিৎ রাইফেল তাক করল সেই জীবটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আগেই সেটা এক লাফ দিয়ে মাথার উপরের অন্য একটা ডাল ধরে ফেলল এবং লুকিয়ে পড়ল গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে। তারা ছুটে গাছটার পেছন দিকে গিয়ে হাজির হল, কিন্তু জীবটার আর দেখা পাওয়া গেল না।

ওয়াংগার কি রাগ! দাঁত খিঁচিয়ে সে বলল, 'এরাই সেই বনমানুষ, যাদের কথা বাওয়ানা লিখে গিয়েছে, যারা তার চোখ উপড়ে নিয়েছিল। ওদের দেশে পা দিতে না দিতেই ওরা আমাদের পেছনে লেগেছে। এখন কি হবে ?'

সুব্রত বলল, 'এই জঙ্গলের ভেতর আর রান্নার চেষ্টা করে কাজ নেই ওয়াংগা। চল আমরা বন পেরিয়ে প্রান্তরে পৌঁছাই, সেখানে এদের

উৎপাত হবে না বোধ হয়। এ বেলাটা টিনের খাবার খেয়েই কাটিয়ে দিই।'

তাই করা হল। খাওয়া শেষ করে কয়েকখানা গাছের ডাল কেটে ফেলল ওয়াংগা। তাই দিয়ে একটা মাচা তৈরী করে সব জিনিসপত্র তার উপর চাপাল। এই মাচা বয়ে নিয়ে যেতে হবে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ধরাধরি করে ঠিক সন্ধ্যা হবার মুখে মাচাখানাকে তারা বনের সীমানায় এনে ফেলল।

সামনে খোলা মাঠ। তারই ভেতর তাঁবু খাটিয়ে তারা রাতটা কাটাতে লাগল। তু'জন ঘুমায় তু'জন রাইফেল হাতে পাহারা দেয়। তা ছাড়া আগুন জ্বালিয়ে রাখল তাঁবুর চার কোণে চার জায়গায়। এতে সাপ বা অন্য বন্য প্রাণীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এভাবেই তারা রাতটা কাটাল। রাত্রিতে কোন শত্রু তাদের শান্তিভঙ্গ করতে এল না।

সকালবেলাতেই তাদের সকলের মনে একটা কৌতূহল জেগে উঠল। সকলেই সকলকে জিজ্ঞেস করতে লাগল—পাহারা দেবার সময়টা কার কিভাবে কেটেছে।

সুব্রত ও অভিজিৎ প্রথম রাতের দিকে জেগেছিল। তারা বলল, 'আমরা শুনেছি গম গম ঢাকের আওয়াজ। মনে হল পাহাড়ের মাথা থেকে আওয়াজ আসছিল।'

ওয়াংগা বলল, 'ওটা হয়ত বনমানুষের টমটম বাজনা। মাটির ঢিপিতে ডাণ্ডা পিটিয়েও ওরা ঐ রকম শব্দ বার করে।'

অভিজিৎ বলল, 'প্রায় মাঝরাত্রের দিকে আমি শুনেছি এক বীভৎস একটানা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। যেন হাজারটা অতিকায় শূকর এক সঙ্গে চীৎকার করছে। আওয়াজটা খুব দূরের বলেই মনে হল।'

ওয়াংগা বলল এক অদ্ভুত কথা। সে বলল, 'শেষ রাত্তিরে আমি শুনেছি আমার বাওয়ানার ডাক। চাঁদের আলোতে আমি যেন তাকে দেখতে পেলাম। সে সোজা হেঁটে চলেছে পাহাড়ের দিকে। মাঝে

মাঝে মুখ ফিরিয়ে সে যেন ডাকছে—ওয়াংগা, চলে আয় শীগ্‌গীর !'

এবার নীচের দিকে নামতে হবে। মাচাখানা ভাগ্যিস ছিল। আবার তাতে বোঝাই করা হল সমস্ত মালপত্র। পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের নীচে যখন তারা এসে পৌঁছল তখন বেলা দুপুর।

আগাগোড়া খাড়া দেওয়াল বটে, কিন্তু ডানদিকে একটা জায়গায় ব্যতিক্রম রয়েছে। সেখানে পাহাড়ের গা কতকটা ঢালু, কোন রকমে তা বেয়ে ওঠা যেতে পারে। কিন্তু উঠে কি হবে? মাটি থেকে আন্দাজ দু'শ ফুট উপরে গিয়ে পাহাড়ের এই অংশটা একটা দ্বীপের আকার ধারণ করেছে। ডাইনে বাঁয়ে প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া অতল খাদ। সে খাদের দু'দিকে পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া। প্রাণপণ চেষ্টা করে কেউ যদি ঐ পাহাড়ের মাথায় ওঠে, তবু সেখান থেকে সে পাহাড়ের অন্য কোন অংশে যেতে পারবে না। ঐ অতল গহ্বর হবে প্রধান অন্তরায়।

নাঃ, এখান দিয়ে উপরে উঠে কোন লাভ নেই। খুঁজে দেখতে হবে—এই পাহাড় প্রাচীরের কোন অংশে উপরে উঠবার রাস্তা আছে কি না।

হঠাৎ অরিজিৎ চীৎকার করে উঠল, 'ঐ যে! ঐ যে! বাঁ দিকে ঐ খড়িমাটি দিয়ে আঁকা তীর দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে।'

এগিয়ে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করতেই সত্যি একটা খড়িমাটির আঁকা সাদা তীর দেখতে পেল অভিজিৎ আর সুব্রত। বোধ হয় বৃষ্টিতে ভিজে শক্ত পাথরের গায়ের সাদা দাগ কতকটা অস্পষ্ট হয়েছে। তবু বুঝতে কষ্ট হয় না—তীরের মুখ ছিল বাঁ দিকে। ঐ বাঁ দিকেই তা'হলে গিয়েছিল সুরজিৎ। এই দিকেই বোধ হয় পথ আছে পাহাড়ের উপর উঠবার।

এখন এক সমস্যা তাদের সামনে। নক্সায় আছে—এই খাড়া পাহাড় চক্রাকারে ঘুরে এসেছে সারা দ্বীপটা। কতদূর গেলে পাহাড়ের উপরে ওঠার পথ পাওয়া যাবে তার কিছু আভাস দেওয়া নেই। এ অবস্থায় এই এতগুলো মাল ঘাড়ে করে কতদূর যাবে তারা?

অবশেষে নানা চিন্তা ভাবনা করে তারা ঠিক করল, এখানেই পাকা-পাকি ভাবে তাঁবু ফেলা যাক্। মালপত্র নিয়ে ওয়াংগা এখানেই থাকবে। আর থাকবে অরিজিৎ। সামান্য কিছু খাবার আর দুটো রাইফেল নিয়ে অভিজিৎ আর সুব্রত বেরিয়ে পড়বে অভিযানে।

তাঁবু খাটানো হল। এখানে কোন বড় গাছ নেই, আছে ছোট ছোট কাঁটার ঝোপ। প্রচুর সংখ্যায় সেই কাঁটা গাছ এনে ওয়াংগা আর অরিজিৎ সেগুলো বেঁধে দিল তাঁবুর গায়ে গায়ে বাইরের দিকে। বেশ পুরু করে এই কাঁটার বেড়া দেওয়ার ফলে তাঁবুটায় ছোটখাটো জন্তু জানোয়ারের প্রবেশ করার পথ বন্ধ করা হল।

ওয়াংগা রাইফেল চালাতে জানে না। একটা রাইফেল অবশ্য কেনা হয়েছিল তার জন্য। অভিজিৎ ভেবেছিল, সুযোগ মত তাকে শিখিয়ে নেবে। কিন্তু সুংটান দ্বীপে সেটা চুরি হয়ে গেল। তবু রক্ষা অরিজিৎ রাইফেল চালাতে জানে। তাই খুব বেশী অসুবিধা হবে না।

পরের দিন সকালেই রওনা হয়ে গেল অভিজিৎ ও সুব্রত। কবে তারা এখানে আবার আসতে পারবে তা সঠিক তারা বলতে পারল না। তবে আশ্বাস দিল—ওপরে ওঠার পথ যদি পাওয়া যায়, তবে ওয়াংগা আর অরিজিতকে না নিয়ে তারা উঠবে না।

অরিজিৎ আর ওয়াংগার জন্য মনে উদ্বেগ থাকলেও, খোলা হাত পায়ে এগুতে পেরে অভিজিৎ আর সুব্রতর মেজাজটা বেশ হালকা। নানারকম কথা বলতে বলতে তারা দ্রুত পদে পথ চলতে লাগল। তাদের বাঁদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তার সীমারেখায় দেখা যায় অরণ্যের অস্পষ্ট আভাস, সেই অরণ্যের শেষে তবে সমুদ্র। সেই সমুদ্রের কূলে বাধা আছে তাদের ভেলা। বাইরের জগতের যোগসূত্র এখান থেকে অনেক দূরে। আর যে রহস্যময় বিভীষিকা ভরা পাহাড়বেষ্টিত উপত্যকার সন্ধানে তারা এসেছে তা অনেক দূরে না হলেও অনেক বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে সেখানে যেতে হবে।

পাহাড়ের গা ঘেঁষেই চলেছে তারা। সাদা সাদা খড়িমাটির তীরের

দাগ পাহাড়ের গায়ে দেখতে পাচ্ছে। সেই তীরের ফলা অনুসরণ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

হঠাৎ বেশ কিছুটা দূরে একটা সমতল জায়গার দিকে তাকিয়ে তারা চমকে উঠল। সেখানে রয়েছে যেন কয়েকটা মানুষের কঙ্কাল। অভিজিৎ চীৎকার করে বলে উঠল, 'ওগুলো কি সুব্রত দা? মানুষের কঙ্কাল না অন্য কিছু!'

সুব্রত জবাব দিল, 'হ্যাঁ, মানুষের কঙ্কাল বলেই মনে হয়। কিন্তু কতদিনের কঙ্কাল তা দেখে বুঝবার উপায় নেই। গায়ে একটুকরো কাপড়ও কারুর নেই যে দেখলে বিচার করা যাবে কোন্ দেশের লোক।'

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, 'এখানে মানুষ এল কিভাবে। কোত্থেকেই বা এল?'

সুব্রত বলল, 'আমার মনে হয় পাহাড়ের মাথা থেকে কেউ তাদের নীচে ফেলে দিয়েছিল।'

অভিজিৎ বলল, 'কিন্তু এই মানুষগুলি কি এদেশেরই বাসিন্দা, দাদার অভিযানের সঙ্গী?'

সুব্রত চিন্তিত ভাবে বলল, 'শুধু কঙ্কাল দেখে দূর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই।'

তবে দু'জনেই বুঝতে পারল, পাহাড়ের উপরে এমন নির্মম হিংস্র কোন জীব আছে যারা মানুষকে শুধু মেরে ফেলেই ক্ষান্ত হয় না, আরও বেশী যন্ত্রণা দিতেই আনন্দ পায়। কিন্তু কোথায় সেই হিংস্র জীব? তাদেরও কি সেই জীবের মুখোমুখি হতে হবে?

দু'জনেরই বুক অজানা আশঙ্কায় ধুকপুক করতে লাগল। তবু এগিয়ে যেতে লাগল তারা। এখনও মাঝে মাঝে পাথরের গায়ে দেখা যাচ্ছে সাদা তীর। যতক্ষণ তীর দেখা যাবে, ততক্ষণ এগোতেই হবে। সুরজিৎ যে পথে গিয়েছিল সে পথ এখনও শেষ হয়নি।

অবশেষে বুঝি পথ শেষ হল। তাঁবু থেকে যাত্রা করার পর দ্বিতীয়

দিন সকালে তারা দেখতে পেল তীর এখানে আর মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আঁকা নেই। তীরের ফলা উর্ধ্বমুখী। অর্থাৎ সুরজিৎ এখান থেকে উপর দিকে উঠেছে।

কৌতূহল সহকারে অভিজিৎ আর সুব্রত পাহাড়ের গায়ের দিকে তাকাতে লাগল।

প্রায় চোদ্দ পনের গজ উপরে পাহাড়ের দেয়ালে একটা পাথরের মুখ অস্বাভাবিকভাবে এগিয়ে আছে। অনেকটা গাছের মোটা ডালের মতো। তার উপরে নীচে কিন্তু খাড়া দেওয়াল একেবারে মসৃণ। সুরজিৎ এখান দিয়ে কিভাবে উপরে উঠে গিয়েছিল ? ব্যাপারটা কম আশ্চর্যের নয় তো !

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। দড়ি তো আছে তাদের সঙ্গে। সরু অথচ খুব শক্ত দড়ি। রাইফেল, দড়ি ও একটা ছোরা তারা এসব কথা ভেবেই ওয়েলিংটন থেকে কিনেছিল।

দড়ি আছে ত্রিশ গজ। এখন দড়ির একটা মুখ কোনরকমে ঐ পাথরটাকে ঘুরিয়ে আনতে পারলেই উপরে উঠবার একটা সুরাহা করা যায়। ঐ জায়গা পর্যন্ত উঠতে পারলে আরও উঁচুতে উঠবার একটা ফন্দি বের করা যায় হয়ত। তা না হলে সুরজিৎই বা উঠেছিল কেমন করে ?

দড়ির একদিকে একটা পাথরের টুকরা বেঁধে তারা ঐ পাথরটাকে ঘুরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগল ! কিছুক্ষণের মধ্যেই চেষ্টা সফল হল তাদের। দড়ির দুটো মুখ একসঙ্গে বেঁধে দড়ির একটা দিক দিয়ে উঠতে লাগল অভিজিৎ আর একটা দিক দিয়ে উঠতে লাগল সুব্রত। পিঠে রাইফেল আর কোমরে খাবারের থলি তারা আগেই ঝুলিয়ে নিয়েছিল।

উপরে উঠে তারা দেখল—একটা খাঁজ এবং সরু চাতালের মত জায়গা রয়েছে সেখানে। চাতালের একটু উপর থেকেই আবার শুরু হয়েছে খাড়া দেওয়াল। সেই দেওয়াল বেয়ে ওঠা মানুষের অসাধ্য।

তবে? সুরজিৎ এখান থেকে কোন্ পথ ধরেছিল?

তাদের সামনেই এক গাদা ধুলোবালি জমা হয়ে আছে। আর কিছু করবার নেই বলেই তারা বসে পড়ে সেই ধুলো মুঠো মুঠো করে নীচের দিকে ছুড়ে ফেলতে লাগল। কি আশ্চর্য, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেখানে বেরিয়ে পড়ল একটা ফোকর।

উপরের দেওয়ালের ঠিক গোড়ায় একটা গোলাকার সুড়ঙ্গ। কোন রকমে একটা লোক শুয়ে শুয়ে এগোতে পারে তার ভিতর দিয়ে। সূর্যের আলো তার ভিতরে ঢুকেছে বটে ধুলোবালি সরিয়ে ফেলার পরে, কিন্তু সে আলোতে বেশীদূর চোখের নজর চলে না। তার পরেই কাল অন্ধকার।

তারা ভাবতে লাগল ঐ সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকবে কী? কিন্তু কে জানে ঐ অন্ধকার সুড়ঙ্গে কোন বিপদ ওৎ পেতে আছে কিনা! একবার এর ভেতর ঢুকলে আর বেরুনো সম্ভব হবে কিনা, কে জানে।

তবু—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। যেতেই হবে। এই তো পথ। এই পথেই সুরজিৎ পাহাড় পেরিয়েছিল। তাদেরও এই পথেই যেতে হবে। অন্য কোন পথ নেই।

'আমি আগে যাব।' অভিজিৎ বলল।

'না, আমি আগে।' হেসে বলল সুব্রত। 'বয়সে আমি বড়। ওর ভেতর যদি অজগর সাপ থাকে, তা হলে তার পেটে যাবার প্রথম দাবি আমার।'

অভিজিৎ আর কোন কথা বলতে পারল না। সাঁতার দেওয়ার ভঙ্গিতে বুকে ভর করে সুব্রত সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। রাইফেল পিঠে আছে, খাবারের থলিটাও পিঠে নিতে হল এবার।

দেখতে দেখতে সুব্রত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার ঢুকে পড়ল অভিজিৎ। দু'জনে হাতড়ে হাতড়ে পাহাড়ের অন্ধকার জঠরে ঢুকতে লাগল। অনবরত ডাইনে বাঁয়ে আর মাথার উপরে হাত নাড়ছিল সুব্রত। দু'ধারের পাথরের দেওয়াল আর মাথার উপরকার

পাথরের ছাদ শরীর থেকে কতদূরে সেটা অনুমান করে নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আর সেই খবর জানিয়ে দিচ্ছিল অভিজিতকে। এক সময় সে বলে উঠল, 'এবার বোধ হয় উঠে বসা যাবে। ছাদ যেন এখানে একটু উঁচু।'

প্রথমে সুব্রত তারপর অভিজিৎ উঠে বসল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারল দু'জনেই। এ জায়গাটা সব দিক দিয়েই চওড়া। অন্ধকারও এখানে খুব গাঢ় নয়। ভাল করে তাকিয়ে দেখলে দূরের জিনিসও একটু একটু দেখা যায়। ঐ দূরে একটা আলোক রশ্মি যেন। অতি সূক্ষ্ম—তবু আলোক।

ঐ আলোর রেখা ধরে নূতন উৎসাহ নিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

কিন্তু সেই উৎসাহ নিভে যেতেও দেরি হল না। একটা এবড়ো-থেবড়ো দেওয়ালের সামনে এসে তারা বাধা পেল। বড় বড় পাথর, একটার উপর একটা সাজিয়ে দেওয়াল তৈরী হয়েছে। ভালভাবে মিলিয়ে বসানো হয়নি পাথরগুলো। তারই জন্য একটু ফাঁক দিয়ে একটা সরু আলোর রেখা গুহার ভিতর ঢুকে অনেক দূর পর্যন্ত ঠিকরে এসেছে।

দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওটা কিসের আলো? আশার আলো না বিপদের সংকেত?

হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা উৎকট আওয়াজ উঠল কোন্ এক অদৃশ্য জানোয়ারের কণ্ঠ থেকে। ঐ হাতে গড়া পাথরের দেওয়ালের ওদিকে নিশ্চয় কোন বিরাট জীব দাঁড়িয়ে আছে। এরকম আওয়াজ কোন ক্ষুদ্র বা দুর্বল প্রাণীর মুখ থেকে কিছুতেই বের হতে পারে না।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল একটা কণ্ঠের আওয়াজ। এবার শোনা গেল আরও অনেকগুলি মিলিত কণ্ঠের শব্দ। অভিজিতের মনে পড়ে গেল, কয়েকদিন আগে তাঁবুতে পাহারা দেবার সময় মধ্যরাত্রিতে সে দূর থেকে ভেসে আসা একরকম শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তবে এটা আরও স্পষ্ট, আরও ভয়াবহ।

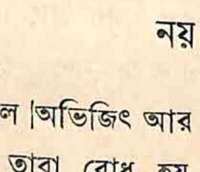
অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, 'কিসের শব্দ ওটা ? কাদের শব্দ ?'

সুব্রত বলল, 'দাঁড়াও, পরখ করে দেখা যাক্।'

সুব্রত অভিজিৎকে নিজের কাঁধের উপর উঠে দাঁড়াতে বলল। যে ফাঁক দিয়ে আলোর রেখাটুকু আসছিল, সেই ফাঁকে চোখ রাখল অভিজিৎ। রাখতেই একটা ভয়ার্ত চীৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

তারপর অভিজিৎ নামল, সুব্রত উঠল তার কাঁধে। সেও দেখল সেই বিভীষিকার দৃশ্য। প্রায় একশ' বনমানুষ। বুনো মোষের মতো কাল চেহারা, সারা দেহে লম্বা লম্বা কাল লোম। একটু কুঁজো হয়ে গুহার সামনে তারা দাঁড়িয়ে আছে আর কিসের যেন গন্ধ পেয়ে থ্যাবড়া থ্যাবড়া মোটা মোটা নাক আকাশে তুলে হাওয়া শুঁকছে। তাদেরই কণ্ঠ থেকে ক্রুদ্ধ গর্জন বেরুচ্ছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ!

অভিজিৎ আর সুব্রতর মনে হল ঐ ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যে দিয়ে যেন বেরিয়ে আসছে—হাঁউ মাঁউ খাঁউ—মানুষের গন্ধ পাঁউ!



নয়

পুরো একটা দিন সেই গুহার ভিতর বসে রইল অভিজিৎ আর সুব্রত। বনমানুষগুলো সেখান থেকে নড়ছে না। তারা বোধ হয় জানতে পেরেছে যে শত্রুর আগমন হয়েছে গুহার মধ্যে। তাই তারা পাহারা দিচ্ছে হীরের ভাণ্ডারে ঢুকবার সিংহদ্বার। হয়তো সুরজিৎকে তাড়াবার পরে তারাই পাথরের দেওয়াল গেঁথে এই দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল। দেওয়াল ভেঙ্গে যদি নতুন শত্রু তাদের দেশে ঢুকতে চায়,

গোড়াতেই আদিম বাসিন্দারা ধারাল নখে তাদের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

শেষ বেলায় একটা নতুন জায়গা দিয়ে এল নতুন একটা আলোক রেখা। সেটা পড়ল গিয়ে বাঁয়ের দেওয়ালে। সেই আলোকিত জায়গাটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল তারা—ঐ তো আর একটা তীরের ফলা। সুরজিৎ যে ঐ দিক দিয়ে উপত্যকায় প্রবেশ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন নিশ্চয়ই সেখানে বনমানুষদের পাহারা ছিল না।

এখন ? এখন এ পথে পা বাড়ানোর কোন আশাই নেই। প্রথম বাধা দেওয়াল। পাথরগুলো এত বড় বড়, আর এত পুরু করে সাজানো যে তা ভেঙ্গে বেরোনোর মত শক্তি সাধারণ মানুষের নেই। আর বেরুতে পারলেই বা কি হবে ? সম্মুখীন হতে হবে ঐ মারমুখো বনমানুষ বাহিনীর। দুটো মাত্র রাইফেল নিয়ে ওদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়তে যাওয়ার অর্থ হল সাধ করে মরণের পথে পা বাড়িয়ে দেওয়া।

রাত্রিটা গুহাতেই কাটিয়ে পরদিন অভিজিৎ আর সুব্রত ফিরে চলল বাইরের জগতে। দড়ি বেয়ে তারা নীচে নেমে গেল সহজেই কিন্তু শত চেষ্টাতেও নীচ থেকে আর দড়ি খুলে নামাতে পারল না। পাথরের খাঁজের ভেতর দড়িটা কেমন করে যেন আটকে গেছে।

থাক পড়ে দড়ি, তারা নিজেদের পথ ধরল। এ পথ আর সুরজিতের পথ নয়, এ পথে আগে কোনদিন মানুষ এসেছে কিনা সন্দেহ। তবু তাদের আসতে হল। পাহাড়টার চারদিক ঘুরে আর কোন পথের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাই তারা দেখবে।

ক্রমে প্রান্তরের শেষ প্রান্তে এসে গেল তারা। এর পর থেকে একটা বিস্তীর্ণ জলার পাশ দিয়ে তাদের চলতে হল। জায়গায় জায়গায় জল এসে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। সেখানে হাঁটু বা কোমর জল ভেঙ্গেও তাদের চলতে হচ্ছে। পচা, দুর্গন্ধ কালো জল, ছোট বড় কত রকমের জলজ উদ্ভিদ সেই জলে ! আর সেই উদ্ভিদের ঝাড়ে ঝাড়ে কত যে সাপ ! কোনটা ছুটে পালায়—কোনটা কামড়ে দেবার জন্য এগিয়ে

আসে। তখন ছুড়তে হয় বুলেট। কোনটা মরে, কোনটা জলে ডুবে কোথাও উধাও হয়ে যায়।

এভাবে প্রাণের দায়ে বুলেট খরচ করে করে তারা ভয়ানক বিরক্ত হয়ে ওঠে। ওদিকে জলার রাজ্যও শেষ হয়। শুরু হয় অরণ্য। তারা পাহাড়টার চারদিক ঘুরতে ঘুরতেই চলেছে। তাদের মনে হল, পাহাড়-টার বেশি অংশই ঘুরে আসা হয়েছে, আর সামান্যই হয়তো বাকী। এর পরেই তারা তাঁবুতে ফিরতে পারবে, যেখানে ওয়াংগা আর অরিজিৎ অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে তাদের জন্য।

হঠাৎ সামনে পড়ল নদী।

পাহাড়ের দেওয়াল ভেদ করে তোড়ে বেরিয়ে আসছে নদীর জল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। অথচ পাহাড়ে উঠবার কোন উপায় নেই। সাঁতার দিয়ে নদী পার হবে কিনা, সে কথাই ভাবছে তারা। কিন্তু তাতে বিপদও অনেক। জলের প্রচণ্ড স্রোত, তা ছাড়া মারাত্মক জলজন্তুও থাকতে পারে।

কি ভাবে পার হবে সেকথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তারা দু'জনেই চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু সেই চীৎকার ভয়ের নয়, আনন্দের। নদীর কূলে বালির উপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একখানা চামড়ার নৌকা। তাদের সেই নৌকা, যা চুরি গিয়েছিল ওটাম্বা দ্বীপ থেকে।

ইন্দ্রনীল যে আগেই এ দ্বীপে এসে গেছে, এটা তারই প্রমাণ। কিন্তু সে চিন্তা এখন নয়। আপাততঃ এই নৌকা নিয়ে পার তো হওয়া যাক্।

নদীর স্রোত প্রচণ্ড, হালকা চামড়ার নৌকায় পার হতে তাদের খুবই কষ্ট হল। জলের তোড়ে নৌকা ভেসে গেল প্রায় মোহনার কাছাকাছি। সেখানে গিয়ে তবে তারা ওপারে যেতে পারল।

নৌকাটাকে নিয়ে কি করবে এখন? হাতে ঝুলিয়ে তাঁবুতে নিয়ে যাবে? কিন্তু কি লাভ? ওখানে নৌকার কোন প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে এখানেই থাক্, পরে যদি আবার এদিকে আসা হয় তখন কাজে লাগাতে পারবে।

তাঁবুর দিকে যেতে যেতে দু'জনেই জল্পনা কল্পনা করতে লাগল—ইন্দ্রনীল কোথায় গেল। সে তো এখানেই এসেছে, তবে আছে কোথায়? সেও কি তাদের মতই পাহাড়ে উঠবার জন্য ঘুরছে?

হাঁটতে হাঁটতে তারা তাঁবুর কাছে এসে গেল। পাঁচদিন পরে। বিদেশ থেকে বাড়ি ফেরার মত আনন্দ তাদের মনে। ওয়াংগা আর অরিজিৎ কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে কে জানে! তাদের এ ভাবে ফেলে যাওয়া উচিত হয় নি, কিন্তু তাছাড়াও কোন উপায় ছিল না।

তাঁবুর অনেকটা কাছে এসে তারা ডাকতে লাগল—ওয়াংগা-ওয়াংগা—অরিজিৎ-অরিজিৎ!

কিন্তু কোন সাড়া নেই। তাঁবুর সামনে উনুন জ্বালান হয়েছিল, তার আধপোড়া কাঠ ছড়ান রয়েছে আশে পাশে। মনে কি রকম আশঙ্কা যেন জাগল তাদের। আবার তারা ডাকল—অরিজিৎ-অরিজিৎ! ওয়াংগা-ওয়াংগা!

এবারও কোন সাড়া নেই। তাঁবুর কাছে এগিয়ে আসতেই তারা শুনতে পেল একটা কাতরানির শব্দ।

তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকেই তারা চমকে উঠে দেখল—ওয়াংগা নয়, অরিজিৎও নয়—বিছানায় পড়ে আছে ইন্দ্রনীল।

ইন্দ্রনীল! এখানে? কি আশ্চর্য!

এতই তার দুঃসাহস! বলে অভিজিৎ কাছে এগিয়ে গেল। দেখল, ইন্দ্রনীলের জ্ঞান নেই। তার কপালে রক্ত। কালো, জমাট বাধা রক্ত।

তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সুব্রত দেখল—রক্তটা কপাল থেকে বেরোয় নি। বেরিয়েছে মাথা থেকে। সেখানে প্রায় তালুর কাছাকাছি এক ইঞ্চি গভীর একটা গর্ত!

'টেরোড্যাক্‌টাইলের ঠোকর!' বলে উঠল সুব্রত।

দু'জনেই চিন্তা করতে লাগল, ইন্দ্রনীলকে কখন কি ভাবে এই দানবীয় জন্তু আঘাত করল? অরিজিৎ আর ওয়াংগাও কি এই জন্তুর কবলে পড়েছে? কিন্তু কোথায় গেল তারা?

সুব্রত লটবহরের ভিতর থেকে ফার্স্ট-এডের বাক্সটা খুঁজে বের করল। এখন প্রথম কর্তব্য ইন্দ্রনীলকে সুস্থ করে তোলা। সে সুস্থ হয়ে উঠলে তার মুখ থেকেই হয়ত অরিজিৎ আর ওয়াংগার খবর পাওয়া যাবে।

ভয়ানক উদ্বিগ্নতার ভিতর দিয়েই সময় কাটতে লাগল।

সুব্রত ডাক্তার মানুষ, দু'তিনটা ইনজেকসন দিয়ে আর ঘায়ের মুখে মলম লাগিয়ে সুস্থ করে তুলল ইন্দ্রনীলকে।

সত্য মিথ্যা মিলিয়ে অনেক কথাই ইন্দ্রনীল বলল তাদের কাছে। নৌকাডুবি হয়ে একটা কিম্ভূত কিমাকার জলজন্তুর হাতে সে মরতে বসেছিল। কোনরকমে ডুবসাঁতার কেটে কূলে এসে উঠেছে। তারপর বনের মাঝে বনমানুষ আর প্রান্তরে রাক্ষুসে পাখির সঙ্গে জীবনমৃত্যুর লুকোচুরি খেলতে খেলতে শেষে এসে পৌঁছেছে এই তাঁবুতে। দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল এই তাঁবু অভিজিতদের না হয়ে যায় না। সে সঙ্কল্প করেছিল, অভিজিতের হাত ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করে তার কাছে আশ্রয় চাইবে। কিন্তু ভিতরে এসে কাউকে দেখতে পেল না। সে ছিল ভয়ানক ক্লান্ত ও দুর্বল, তাই অনুমতি ছাড়াই সে এই তাঁবুর শয্যায় আশ্রয় নিল।

অভিজিৎ সন্দেহ ও কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি তুমি কাউকে এখানে দেখতে পাও নি?'

ইন্দ্রনীল জবাব দিল, 'না।'

তা'হলে? তা'হলে কোথায় গেল অরিজিৎ আর ওয়াংগা?

ইন্দ্রনীল বলতে লাগল, 'আমি কিছুটা সুস্থ হয়ে এখান থেকে চাল ডাল নিয়ে বাইরে দু'টি রান্না চাপিয়েছি, এমন সময় মাথার উপর সোঁ সোঁ শব্দ উঠল একটা। আর মুখ তুলে উপর দিকে তাকাবার আগেই মাথার উপর পড়ল সঙ্গীনের খোঁচার মত একটা আঘাত, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল মাথা দিয়ে। অজ্ঞান হয়ে পড়তে পড়তে আমি দেখলাম একটা রাক্ষুসে পাখি ভাতের হাঁড়িটা দু'পায়ের নখে তুলে দূর আকাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।'

ইন্দ্রনীলের এ বিবরণে অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না। কিন্তু অরিজিৎ আর ওয়াংগার অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে তার কোন হাত আছে কিনা সেই সম্ভাবনাও মন থেকে উড়িয়ে দিতে পারল না তারা। এখন কি কর্তব্য? ইন্দ্রনীলকে আশ্রয় না দিয়ে এই অবস্থায় বনে জঙ্গলে তাড়িয়ে দেওয়ার কথাও অভিজিৎ বা সুব্রতর মনে উদয় হল না। লোকটার অস্ত্র নেই, খাদ্য নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, ওকে তাড়িয়ে দেবার মানে ওকে মরণের মুখে ঠেলে দেওয়া। সেটা করতে অনেকেই দ্বিধা করত না, কিন্তু অভিজিৎ ও সুব্রত সে ধরনের লোক নয়।

ইন্দ্রনীলকে তাঁবুতে রেখে পাগলের মত অভিজিৎ ও সুব্রত খুঁজে বেড়াল মাঠ, বন, সমুদ্রের ধার পর্যন্ত গোটা অঞ্চল। ইন্দ্রনীল খুবই অসুস্থ। এই অবস্থায় বিছানা থেকে উঠে কোথাও চলে যেতে পারবে না সে, বিশেষ কোন ক্ষতিও করতে পারবে না, তাই একটু নিশ্চিন্ত ভাবেই তারা অরিজিৎ ও ওয়াংগাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না তাদের। ফিরে আসার পথে নদীর ধারে একটা ঝোপের কাছে হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল একটা রাইফেল। অভিজিৎ তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিল, বুঝতে পারল এটা অরিজিতের রাইফেল।

বুকটা কেঁপে উঠল অভিজিতের। বলল, 'সুব্রতদা, নিশ্চয়ই অরিজিতের কোন বিপদ হয়েছে। শেষ সময়ে হয়ত রাইফেল দিয়ে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।'

সুব্রত রাইফেলটাকে পরীক্ষা করে দেখল। বলল, 'এটা ব্যবহার করা হয়নি। মনে হয় ব্যবহার করার কোন সুযোগ সে পায়নি।'

'তা হলে?'

'কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

অরিজিৎ আর ওয়াংগা বেঁচে নেই, এই সিদ্ধান্ত করে দু'জনেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। অভিজিতের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠতে লাগল গভীর শোকে ও বেদনায়। অশ্রুসিক্ত নয়নে তারা তাঁবুতে ফিরে এল।

ইন্দ্রনীল সেখানেই রয়ে গেছে। আগের চেয়ে অনেক সুস্থ হয়ে

উঠেছে সে। এখন চলাফেরা করে, তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সে কিন্তু খুব জোর গলাতেই বলল—'তোমাদের অরিজিৎ আর ওয়াংগা মরেনি। নিশ্চয়ই পথ ভুল করে অন্য কোন দিকে চলে গেছে। একদিন নিশ্চয়ই তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে।'

ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রনীল অভিজিৎ ও সুব্রতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়ে গেল। একদিন সুব্রত তার সামনেই বলে ফেলল, 'গোটা পাহাড়টা চক্কর দিয়ে এলাম। একটি মাত্র জায়গা দেখেছি যেখান দিয়ে পাহাড়ে ওঠা যায়। সেই জায়গাটা কিন্তু এখান থেকে কাছেই। কিন্তু তাতে উঠেও কোন লাভ হবে না। সেখান থেকে পাহাড়ের অন্য অংশে যাওয়ার কোন উপায় নেই।'

সুব্রতর সংকেতে নির্দেশিত জায়গাটার দিকে ইন্দ্রনীল তাকিয়ে দেখল। তারপর একটু ভেবে বলল, 'উপায় আছে সুব্রতদা। ঐ দেখছেন —দ্বীপাকার চূড়াটার ধারে দেবদারু গাছের মত একটা বড় গাছ। ওটা কেটে শুইয়ে দিলে বোধ হয় ওর মাথা খাদের উপর দিয়ে ওধারে পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

অভিজিৎ হঠাৎ লাফিয়ে বলে উঠল, 'বুঝেছি, একটা সাঁকো তৈরী হয়ে যাবে। সত্যি তোমার বুদ্ধি আছে ইন্দ্রনীল। তোমার সমস্ত দুষ্কর্মের কথা আমি মন থেকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি। হাতে হাত মেলাও এবার।'

ইন্দ্রনীলের হাত চেপে ধরল অভিজিৎ এবং সুব্রতও।

তারপর পরামর্শ করতে বসল।

পরদিন ভোর বেলাতেই কুড়ুল হাতে করে উপরে উঠে গেল ইন্দ্রনীল। কাটতে লাগল সেই গাছটা। মাঝে মাঝে অভিজিৎ ও সুব্রতও তাকে সাহায্য করল বৈকি। তিন জনের সমবেত চেষ্টায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই মড়মড় করে গাছটা ভেঙে পড়ল খাদের উপর। তৈরী হয়ে গেল একটি চমৎকার সেতু।

অভিজিৎ একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'সেতুটা সত্যি চমৎকার হত

যদি একটু গলদ না থাকত। গাছের গোড়াটা একেবারে ধার ঘেঁষে পড়েছে। একটু যদি কোনরকমে নড়ে যায় তা হলে গোটা গাছটাই খাদের ভেতর পড়ে যাবে।'

সুব্রত বলল—'ওসব ভাবলে কি চলে ? আমরা গোড়ায় নাড়া দেব কেন ? আর আমরা এমন কি ভারী ? সোজা চলে যাব হেঁটে উপর দিয়ে।'

হেঁটে যাওয়া অবশ্য সম্ভব হল না। পা যদি কেঁপে যায় ? তা'হলে নীচে অতল খাদে পড়ে গিয়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যেতে হবে। ঐ রকম দুঃসাহস করার কোন অর্থ হয় না। তাই বসে বসেই অনেকটা হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গীতে পার হয়ে গেল অভিজিৎ আর সুব্রত। পিঠে রাইফেল আর খাবারের থলে, কোমরে একখানা ছোরা আর গলায় বুলেটের মালা। অরিজিতের রাইফেলটা তারা সঙ্গে আনে নি। সেটা সেই তাঁবুর পাশেই এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে এসেছে। ইন্দ্রনীল তখন অসুস্থ ছিল, সে কিছু জানতে পারে নি।

খাদের ওপারে গিয়ে অভিজিৎ আর সুব্রত ভেবেছিল ইন্দ্রনীলও তাদের পিছনে পিছনে আসবে। কিন্তু তা না করে সে কুড়োলটা নিয়ে গাছের একটা ডাল কাটতে গেল।

অভিজিৎ বলল, 'ইন্দ্রনীল, তুমি দেরি করছ কেন ? শীগগীর পার হয়ে এসো ! ওটা করছ কি ?'

ইন্দ্রনীল বলল, 'আমার তো বন্দুক নেই, একটা মোটা লাঠি অন্ততঃ থাক্।' বলেই সে হঠাৎ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠল।

মোটা লাঠিগাছটা নিয়ে ইন্দ্রনীল এগিয়ে এল গাছের গুঁড়িটার দিকে। তারপর সেই লাঠি দিয়ে গাছের গোড়াটায় জোরে চাড় দিল। তার ফলে গাছটা তুমুল শব্দে গড়িয়ে পড়ে গেল খাদের ভিতর।

আবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল ইন্দ্রনীল। মনে হল ওটা যেন কোন মানুষের হাসি নয়—পিশাচের কুটীল হাসি !



দশ

মানুষ এত নরাধমও হতে পারে ?

এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে রইল অভিজিৎ আর সুব্রত। তারপর হঠাৎ সুব্রত রাইফেল তুলল। ঐ মানুষরূপী পিশাচটাকে ধরাধাম থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু ইন্দ্রনীল শয়তান হলেও বুদ্ধিতে প্রখর। সে জানে এরপর কি ঘটতে পারে। তাই মুহূর্তের মধ্যেই সে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

সুব্রত বলল, 'ঐ পাষণ্ডটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আবার নিজেদের কত বড় ক্ষতিটাই করলাম। তাঁবুতে আমাদের ফিরে যাবার পথ সে আর রাখল না। এমন কোন উপায় আর আমাদের নেই যাতে জীবনটাকে বাঁচাতে পারি। এই পাহাড়ের মাথাতেই আছে সেই বনমানুষের দল—যাদের দূর থেকে দেখেই সেদিন আমরা ভয়ে পালিয়ে এসেছি। ঐ পাহাড়ের নীচেই রয়েছে টেরোড্যাকটাইলের আস্তানা, ডাইনোসরের আড্ডা। নিশ্চিত মরণের হাতে ঠেলে দিয়েছে আমাদের।'

অভিজিৎ বিস্ময়ে ও দুঃখে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না। কিছুক্ষণ পর বলল, 'অরিজিৎ আর ওয়াংগাকে এই শয়তানটাই হত্যা করেছে সুব্রতদা।'

সুব্রত বলল, 'দু'দুটো শক্তিমান লোককে একা কেমনভাবে সে ঘায়েল করল, সেটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়। আর ঐ রাইফেলটাও তো সে আত্মসাৎ করতে পারত! সব কিছুই যেন এক রহস্যময় ব্যাপার।'

অরিজিতের বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হল। বিষাদক্লিষ্ট স্বরে বলল, 'এই অভিশপ্ত অভিযানে বের না হলেই ভাল হত সুব্রতদা।'

সুব্রত বলল, 'এখন সেকথা ভেবে দুঃখ করে কোন লাভ নেই অভিজিৎ। দেখা যাক আমাদের ভাগ্যে কি আছে। এবার আমাদের বাঁচবার পথ খুঁজতে হবে।'

দু'জনেই পাহাড়ের মাথার দিকে চোখ ফেরাল। সেখানটা বেশ সমতল। কাঁটা ঝোপের অন্ত নেই, বড় বড় গাছও আছে মাঝে মাঝে। চওড়াও প্রায় আধমাইল হবে বলে মনে হল।

সুব্রত বলল, 'ঐ জায়গাটুকু পেরিয়ে গেলেই হীরের উপত্যকা হয়ত আমাদের চোখে পড়বে। চল, এগিয়ে যাই।'

দু'জনেই এগিয়ে চলল পাহাড়ের কিনারার দিকে।

বাইরের দিকে পাহাড় যেন একটা খাড়া দেওয়াল, ভিতরের দিকটা কিন্তু ক্রমশঃ ঢালু হয়ে একটা সমতলে মিশেছে। সমতল বটে, কিন্তু একে উপত্যকা না বলে অধিত্যকা বলাই বোধ হয় ঠিক। কারণ অত উঁচুতে দাঁড়িয়ে তারা পাহাড়ের দু'দিকের পিঠটাই দেখতে পাচ্ছে। ভিতরের ভূতল বাইরের চাইতে অনেক, অনেক উঁচু।

অভিজিৎ মনে মনে বলল—ঐ হল হীরের উপত্যকা। আমার দাদা ওখানেই গিয়েছিলেন।...মুগ্ধ হয়ে অভিজিৎ তাকিয়ে রইল পাহাড়ের ঢালু পথের দিকে আর সমতলের খোলা মাঠের দিকে। মাঠের ওদিকে গভীর অরণ্য, তার উপরে ওটা কি? উপত্যকা না হ্রদ?

হ্রদই হোক আর উপত্যকাই হোক, তার ওপারে আবার পাহাড় এবং সেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওসব কি? এদিকে ওদিকে নড়ে বেড়াচ্ছে যেন! ওরা কি হিংস্র প্রাণী, বনমানুষ, না আর কিছু।

বাইনাকুলার আছে খাবারের ঝোলায়। চোখে লাগিয়ে সুব্রত বলল, 'ডাইনোসরের লীলাভূমিতে অত ছোট হিংস্রপ্রাণী থাকতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। বনমানুষ হতে পারে। কিন্তু বনমানুষ কি নৌকা চালাতে পারে? হ্রদের জলে—হ্যাঁ, ওটা হ্রদই বটে, ওর জলে নৌকার

উপরেও দেখতে পাচ্ছি ঐ রকম জীব। আচ্ছা, তুমি দেখ তো—'

সুব্রত বাইনাকুলারটা অভিজিতের হাতে দিল।

বেলা প্রায় দুপুর। কিছু খেয়েদেয়ে ওরা দু'জনে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সেই উপত্যকার অঞ্চলে প্রবেশ করল। প্রান্তরের মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপ। বড় গাছের সংখ্যা কম। এঁকে-বেঁকে একটা জলরেখা চলে গিয়েছে হ্রদের দিকে। সম্ভবতঃ পাহাড়ের গায়ে বা মাথায় কোন ঝরণা আছে, তাই থেকেই হয়েছে এর উৎপত্তি। সেই হ্রদের পাড় ঘেঁষে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল পাথুরে বালির ওপর বড় বড় পায়ের দাগ। তারা বুঝতে পারল অনেক জন্তুজানোয়ারই এখানে জল খেতে আসে। আর সেই সব জন্তু জানোয়ারের আকার এ যুগের প্রাণীদের চাইতে অনেক বড়।

এরা কি সেই ইতিহাসের আগের যুগের প্রাণী? তা'হলে অচিরেই হয়ত এদের দেখা পাওয়া যাবে।

উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহল নিয়েই এগিয়ে চলতে লাগল তারা। অভিজিতের মনটা মাঝে মাঝেই ভাইয়ের দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই মন থেকে তা দূর করে দেয়। আশায় ও হতাশায় দুলে ওঠে তার অন্তর।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে পৌঁছল অরণ্যের ধারে। চারদিকে গাছে ঘেরা সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে উবু হয়ে বসে আছে কয়েকটা অতিকায় প্রাণী। প্রথমে দেখেই মনে হল—সেকালের অতিকায় হাতী ম্যামথ। কিন্তু এদের তো শুঁড় নেই। তা'হলে এরা কি প্রাণী?

পেছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে এরা বসেছিল। সেই দু'টি পা ঠিক হাতীর পায়ের মতই মোটা। সামনের দুটি পা কিন্তু খুব ছোট আর সরু। বুকের কাছে জোড় করে রেখেছে দু'খানা হাতের মত গলা সরু আর লম্বা, মাথা ছাগলের মত লম্বাটে।

অবাক বিস্ময়ে সেই আজগুবি জন্তুগুলির দিকে ওরা তাকিয়ে আছে, এমন সময়ে প্রথমে সবচেয়ে বড়টা উঠে দাঁড়াল। সেই

বোধহয় পালের গোদা। তাই সঙ্গে সঙ্গে অন্য জন্তুগুলোও দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা বিরাট উঁচু গাছের মগডাল থেকে কচি কচি পাতা চিবিয়ে খেতে খেতে জন্তুগুলো অদ্ভুতভাবে শব্দ করতে লাগল।

অভিজিৎ প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক। জন্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এগুলো ইগুয়ানোডন। আশ্চর্য! লক্ষ বছর আগে পৃথিবী থেকে যাদের বিলুপ্তি ঘটেছে, তাদের বংশধরকে আজ আমরা চাক্ষুস দেখতে পেলুম।'

মনের আবেগে গলার স্বরটা একটু চড়ে গিয়েছিল তার, শব্দ শুনেই সেই অতিকায় জন্তুগুলি চমকে উঠল। পাতা খাওয়া ছেড়ে দিয়ে তারা জোর পায়ে হেঁটে পালাতে লাগল গভীর বনের দিকে। কুঁজো হয়ে পেছনের দু'পা দিয়েই তারা চলে, মাঝে মাঝে টাল সামলাবার জন্য মাটিতে সামনের পায়ে ভর দেয়।

সুব্রত বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ অভি? জন্তুগুলোর প্রত্যেকটারই কাঁধে একটা করে গোল কাল দাগ?'

অভিজিৎ বলল, 'না, তা তো লক্ষ্য করিনি। কিন্তু গোল কাল দাগ প্রত্যেকটার কাঁধে কেন থাকবে?'

'কেন থাকবে তা কেমন করে বলি? তবে প্রাচীনকালে গৃহ-পালিত পশুর গায়ে মালিকরা কোন না কোন চিহ্ন এঁকে দিত। এটা সেই রকম কিছু একটা হতে পারে হয়ত।'

'গৃহপালিত? এই বিরাট ইগুয়ানোডনেরা?'

'অসম্ভব কি? জন্তুর দেহ যত বিরাটই হোক, মাথা তার ছোট। মস্তিষ্কের জোরে খুদে মানুষ ইগুয়ানোডনকে পোষ মানাবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?'

কথা বলতে বলতে তারা হেঁটে চলেছে বনের ভিতর দিয়ে। বন এখানে গভীর। বড় বড় গাছ অসংখ্য, তবে মাটিতে আগাছা বা ঝোপঝাড় খুব কম। চলা-ফেরার কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। বেশ

জোরে জোরে পা চালিয়েছে তারা।

হঠাৎ কে যেন উপর থেকে অভিজিতের গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। একটা ভয়ার্ত চীৎকার তার গলা থেকে বের হতে গিয়ে আর বের হল না। গলাটা যেন কে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে। অভিজিৎ মাটি ছেড়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরে, আরও উপরে। উপরে তাকিয়ে যা দেখল অভিজিৎ, তাতে তার বুকের ভেতরকার ধুকধুকুনি স্তব্ধ হয়ে গেল যেন।

প্রকাণ্ড গাছটার ডালে ডালে বড় বড় লোমশ বনমানুষ অন্ততঃ একশ'। কালো কালো মুখের ভেতর থেকে হলদে হলদে দাঁত বেরিয়েছে, দাঁতে দাঁত ঘষছে বিষম আক্রোশে। ওরা টুঁটি ছিঁড়ে নেবে অভিজিতের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুব্রত একটু আগে আগে হাঁটছিল। কথার জবাব না পেয়ে সে পেছন ফিরে তাকাল। কোথায় অভিজিৎ? উবে গিয়েছে হঠাৎ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে সুব্রত। নেই সে। তারপর সে তাকায় উপরের দিকে। দৃশ্য দেখে সে চীৎকার করে ওঠে।

গাছের ডালের উপর অভিজিৎকে ফেলে তার ঘাড়টাতে মোচড় দিচ্ছে বনমানুষটা। আর একটা বনমানুষ এগিয়ে আসছে। বেঁকে যাচ্ছে অভিজিতের ঘাড়, টনটন করছে, মড়মড় করছে, হয়ত ভেঙে যাবে এক্ষুণি।

দুম্! গুলি ছুটল সুব্রতর রাইফেল থেকে। আর বনমানুষগুলো এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে পড়ল অজানা ভয়ে। যে বনমানুষটা অভিজিতের ঘাড়ে মোচড় দিচ্ছিল, সে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। আর তার ঠিক পাশেই পড়ল অভিজিৎ।

ঘাড়ে খানিকটা ব্যথা ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি অভিজিতের। কিন্তু এক মুহূর্তের ভেতর সে যেন যমপুরী থেকে ঘুরে এসেছে।

কিন্তু এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। বিপদ এখনই আবার ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। তারা বাঁদিক লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। সেদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বৃক্ষহীন প্রান্তরে বনমানুষের



দৃশ্য দেখে সুব্রত চীৎকার করে ওঠে

উৎপাত হয়ত থাকবে না।

ছুটতে ছুটতে তারা মাঠের মাঝামাঝি এসে পড়ল। পেছনে তাকিয়ে দেখল কোন বনমানুষের চিহ্ন নেই। এতক্ষণে তারা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এ প্রান্তরে ঝোপঝাড়ের চাইতে বড় বড় পাথুরে ঢিবিরই প্রাচুর্য। এদিকে-ওদিকে কেবল ঢিবি। ঢিবির কাছাকাছি আসতেই একটা পচা গন্ধ তাদের নাকে এসে ঢুকল। কি বিশ্রী গন্ধ। তারা ভাবল ছুটে অন্যদিকে চলে যাবে।

কিন্তু পরক্ষণেই অভিজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'না, পচা দুর্গন্ধের ভয় পেয়ে সরে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না। কিসের দুর্গন্ধ তা আমাদের দেখতে হবে।'

সুব্রত মনে মনে ভাবল, 'অরিজিৎ আর ওয়াংগার মৃতদেহ এখানে পড়ে আছে কিনা কে জানে। সেই মৃতদেহই পচে গলে হয়ত ওই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।'

ঢিবির গায়ে, ঢিবির মাথায় ছোটখাটো অনেক ঝোপঝাড়। সেগুলোর পাশ কাটিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠল। কিন্তু কোথাও পচাগলা কোন মৃতদেহ তাদের চোখে পড়ল না। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়েই তারা চমকে উঠে ভাবল—এই কি নরক!

তাদের সামনে একটা বড় ডোবার মত গর্ত। সে গর্তের চারদিকেই ঢালু পাড়ে শত শত টেরোড্যাকটাইল নিঝুম হয়ে বসে আছে। ডিমে তা দিচ্ছে তারা। বড় বড় হলদেপানা থলথলে -চামড়ার থলের মত ডিম। পুরুষ পাখিগুলো ডোবার মাথার উপরে সারি দিয়ে বসে আছে। তাদের লাল চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে। আর বাচ্চাগুলো ঘুরছে-ফিরছে ডোবার একেবারে তলায়—যেখানে দেখা যায় নীল কাদার মাঝে মাঝে পচা নীলচে জল।

পাখি না সরীসৃপ? এতদিন তারা মাঝে মাঝে উড়ন্ত রাক্ষুসে

পাখি দেখেছে বটে, কিন্তু ওদের দেহের বৈশিষ্ট্য তখন ঠিক চোখে পড়েনি। দেহের পিছন দিকটা দেখলে মনে হবে গোসাপ বা কুমীরের মত, মাথার বীভৎস চেহারাতেও তাদেরই আদল অনেকখানি। কিন্তু ডানা? পাতলা-পাতলা চামড়ায় ঢাকা বিশাল বিশাল ডানা কোন কুমীরের থাকে না। সেগুলি গুটিয়ে রাখার জন্য এই বীভৎস জীবগুলিকে এখন মনে হচ্ছে গায়ে চাদর জড়ানো এক দঙ্গল বুড়ীর মত। শীর্ণ, শুকনো পেত্নীর মত ডাইনী বুড়ী।

ফিস ফিস করে অভিজিৎ বলল, 'মাওরিরা যে এ জীবকে ডাইনী নাম দিয়েছে, তা ভুল দেয়নি। দেখুন সুব্রতদা তাকিয়ে, ঠিক ডাইনীর মতই এখন দেখাচ্ছে ওদের।'

অভিজিতের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ সেই ডাইনী বুড়ীরা 'ক্কো—ও—ঔ' শব্দ করে হাওয়ার বুকে ধনুকের মত বাঁকা রেখা এঁকে আকাশে উঠে পড়ল। সুব্রত ও অভিজিতের মাথার ওপর চক্কর দিতে লাগল ক্রুদ্ধ চীৎকার করে। তাদের মতলব যে ভাল নয়, এ বুঝতে কারুর দেরি হল না।

খোলা মাঠে ওরা যদি সত্যি আক্রমণ করে, তা'হলে? রাইফেলের গুলি দিয়ে ওদের আটকানো যাবে কি? একসঙ্গে একশ'টা দুশমন ছুটে এলে ক'টাকে ওরা ঘায়েল করতে পারবে? কাজেই পালানো ছাড়া গতি নেই, এবং পালানোর দরকার বনের দিকে। বনের ভেতর এসব বৃহৎ পাখি ঢুকবে বলে মনে হয় না। ঢুকলেও সারি সারি গাছের গুঁড়ির ভেতর দিয়ে ওরা ছুটতে পারবে না। বনই এখন আশ্রয়। বনে বনমানুষ আছে বটে, তারাও হয়ত ওঁৎ পেতে আছে, তবু উপায় কি?

আপাততঃ এই বিপদ থেকে তো উদ্ধার পাওয়া যাক।

বনের দিকেই ছুটল অভিজিৎ আর সুব্রত। কিন্তু যত জোরেই তারা ছুটুক, পাখির গতিবেগের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কেন? দেখতে দেখতে পাখির ঝাঁক এসে ঘিরল তাদের। 'মাথা বাঁচাও'—চেঁচিয়ে

উঠল সুব্রত। দু'জনেই রাইফেল উঁচু করে মাথার উপর, যাতে ঠোঁটের এক ঠোকরে ওরা মাথার খুলি ফুটো করে দিতে না পারে।

সোঁ সোঁ পাখার দাপট, ক্কো-ও-ঔ ক্রুদ্ধ গর্জন—শত শত রাক্ষস যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিকারের উপরে। কানে তালা লেগে যায়, মাথা বন বন করে ঘোরে, পা টলতে থাকে প্রতি পদক্ষেপে।

মাথায় মারতে না পেরে রাক্ষুসে পাখিরা ঘাড়ে ঠোকর মারল। দরদর করে দু'জনের ঘাড় থেকেই বের হতে লাগল রক্ত। তারা ফিরে দাঁড়িয়ে কয়েকবার রাইফেল ছুঁড়ল। ঝপাঝপ মাটিতে পড়ে গেল অনেকগুলো রাক্ষুসে পাখি। বাকীগুলো আকাশ পথেই থমকে গেল। এরকম আওয়াজ তারা আগে শোনেনি কখনও, এরকম ভাবে এতগুলো পাখিকে এক সাথে মারা পড়তেও দেখেনি। আক্রমণ বন্ধ করে তারা আকাশে চক্কর দিতে লাগল। আর সেই ফাঁকে প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে বনের আশ্রয়ে ঢুকে পড়ল অভিজিৎ আর সুব্রত। পাখিরা অবশ্য আবার নেমে এল নূতন সাহসে, ছুটেও এল সীমানা পর্যন্ত, কিন্তু বনের ভিতর ঢুকে পড়ার উৎসাহ আর তাদের হল না। শত শত কণ্ঠে বীভৎস চীৎকার করতে করতে তারা ফিরে গেল তাদের পচা ডোবার নরককুণ্ডে।

সূর্য তখন অস্তাচলে। বনের ভেতর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। যেটুকু আবছা আলো তখনও রয়েছে, তা'তেই একবার উপরকার পানে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখল দু'জনে। নাঃ, বনমানুষেরা এ তল্লাটে আছে বলে মনে হয় না। একটু সাহস পেয়ে হাঁফ ছেড়ে নেবার জন্য তারা গাছতলায় বসে পড়ল। সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে যেন বেঁচে এল তারা।

দু'জনেরই ঘাড় থেকে রক্ত পড়ছে। তবে ক্ষত খুব গভীর হয়নি। যাক, অল্পেই রেহাই পেয়েছে। থলের ভেতর থেকে আয়োডিন তুলো বের করে দু'জনে পরস্পরের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বসল। ক্ষত যতটাই হয়ে থাক, ঐ নোংরা জীবের ঠোঁটের

আঘাতে বিষ থাকা খুব স্বাভাবিক। প্রিন্স উইলিয়াম জাহাজের ডাক্তার জনসনের কথা সুব্রতর মনে পড়ল। সুরজিতের শরীরে বোধ হয় কোন বিষ ঢুকেছিল, নইলে ঘা শুকিয়ে যাওয়ার পরেও সে মারা গেল কেন? টেরোড্যাকটাইল তো তাকেও ঘা মেরেছিল।

তুলায় আয়োডিন ঢালতে ঢালতে সুব্রত হঠাৎ একটা কথা বলল, 'আচ্ছা অভি, তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র। নীল কাদা দেখে তোমার মনে কি কোন কথা উঁকি মারছে?'

'নীল কাদা?' অবাক হয়ে জবাব দিল অভিজিৎ। 'নীল কাদা দেখে আমার মনে আবার কোন্ কথা উঁকি মারবে? আর সে কথাই বা কেন?'

সুব্রত বলল, 'টেরোড্যাকটাইলের আড্ডাখানা সেই ডোবায় যে কাদা দেখেছি, তার রং নীল। গর্তটা যে আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল এককালে, তাতে বোধ হয় সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। প্রান্তরময় ছড়ানো এইসব পাথরের ঢিবি—এরা আগ্নেয়গিরির লাভার সঙ্গে ছিটকে বেরিয়েছিল এককালে।'

'এককালে? সে কোন্‌কাল বলে আপনার মনে হয় সুব্রতদা?'

'ধরে নাও এক লক্ষ বছর আগে। কিন্তু আগ্নেয়গিরির কথাটা মাথায় রেখে চিন্তা করো। আগ্নেয়গিরি থেকে যখন নীল কাদা বেরোয় সে কাদায় কি পাওয়া যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন?'

'হীরা!' লাফিয়ে উঠল অভিজিৎ।

'আহা হা, নড়ো না। তোমার ঘাড়ে তুলোটা দেওয়া হয়নি এখনও। কিন্তু ঐ ডোবার ভেতর একবার না নামতে পারলে তো হবে না। হীরা যদি ঐ দ্বীপে থাকে, তা'হলে ঐ ডোবার ভেতরে আছে। তোমার দাদা যে হীরা দু'খানা পেয়েছিলেন, আমার দৃঢ় ধারণা তাদের জন্মস্থান ঐখানেই।'

'ঐ ডোবাতে নামতে হবে? এক হাজার টেরোড্যাকটাইলের

ভিড় ঠেলে? এর চেয়ে অসম্ভব কথা কিছু শুনিনি কখন। যার মত সাংঘাতিক জীব দুনিয়ায় নেই—'

'তাও হয়ত আছে। ঐ মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

অভিজিৎ ঐ মাঠের দিকে তাকাল। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে। সেই আলোতে দেখা গেল এক ভয়াবহ প্রাণী মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। ইগুয়ানোডনের মতই অতিকায়। কিন্তু মাথাটা এর ছাগলের মত নয়, বিরাট একটা কোলা ব্যাং-এর মত। ইগুয়ানোডনের মতই পেছনের গোদা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সামনের দিকের অতি ছোট পা দু'খানা হাতের মত জুড়ে রেখেছে বুকের সামনে। হঠাৎ একটা মৃদু গর্জন করে ক্যাঙ্গারুর মত সে সামনের দিকে লাফ দিল। এবং এক লাফে পেরিয়ে গেল অন্ততঃ তিরিশ হাত। এত বড় প্রাণীর এত বড় লাফ? কি জানোয়ার এটা?

প্রাণী বিজ্ঞানের গবেষক অভিজিৎ বলল, 'দেখুন সুব্রত দা, আমার মনে হয় এটা জুরাসিক যুগের মাংসাশী ডাইনোসর। দাদার খাতায় যে ছবি আঁকা আছে, সে বোধহয় এরই।'



এগার

ক্যাঙ্গারুর মত লাফাতে লাফাতে ডাইনোসরটা এগিয়ে আসছে বনের দিকেই। মাঝে মাঝে থেমে থেমে ঘাড় নীচু করে মাটি শুঁকছে এক একবার। বোধ হয় জানোয়ারটা মানুষের গন্ধ পেয়েছে।

অভিজিৎ বলল, 'সুব্রত দা, গাছে উঠে পড়ুন।'

সুব্রত বলল, 'তারপর ভোর হতে না হতেই যদি বন মানুষেরা দেখা

দেয় গাছের উপর ?'

'তখন দেখা যাবে। এখন তো বাঁচি।'

কিন্তু গাছের গুঁড়িগুলো অস্বাভাবিক মোটা আর সব চেয়ে নীচের ডালও অন্ততঃ দশ হাত উপরে। এ গাছে ওঠার তা'হলে উপায় কি ?

অভিজিৎ বলল, 'চলুন, বনের ছায়াতে ছায়াতে যতক্ষণ পারি দৌড়োই। গন্ধ শুঁকে শুঁকে যদি ওর আসতে হয়—দেরি হবে তো ?'

'কিন্তু এক এক লাফে যে তিরিশ হাত পেরিয়ে যায়! ধরতে কতক্ষণ লাগবে ?' বলতে বলতে সুব্রত ছুটতে লাগল।

বেশীদূর ছুটতে তাদের হল না। বিপদের উপর ঘটল আর এক বিপদ! বনবাদাড় ভেঙ্গে ফাঁকা মাঠের ভেতর বেরিয়ে পড়ল সেই ইগুয়ানোডনের দলটা, যাদের সঙ্গে কয়েকঘণ্টা আগেই একবার দেখা হয়েছিল।

এবার তা'হলে আর রক্ষা নেই। কি হবে ?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কোনদিকে ছুটবে সে কথাই ভাবতে লাগল অভিজিৎ আর সুব্রত। এমন সময় অঘটনও একটা ঘটে গেল। ডাই-নোসরটার চোখ পড়ল ইগুয়ানোডনের দলের দিকে। অনিশ্চিত শিকারের আশা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত শিকারের দিকেই সে ছুটে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এসে পড়ল সবচেয়ে গোদা ইগুয়ানোডনটার উপরে।

আকারে দুটোই প্রায় সমান, কিন্তু তৃণভোজীরা সব সময়েই মাংসাশীদের চেয়ে দুর্বল। কাজেই ডাইনোসরের দাঁত চোখের পলকে কামড়ে ধরল তার শিকারের গলা। তীব্র চীৎকার করে ইগুয়ানোডনটা আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দাপাদাপি করতে লাগল। বাকী চার পাঁচটা ইগুয়ানোডন ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চীৎকার করতে করতে তারা বনের ভেতর ঢুকে পড়ল।

সুব্রত আর অভিজিৎ তখন ছুটতে শুরু করেছে আরও জোরে।

ছুটতে ছুটতে তারা শুনতে পেল, পেছনে হতভাগ্য ইগুয়ানোডনটা

মরণ যাতনায় চীৎকার করেই চলেছে। ক্রমশঃ কমে আসে সেই চীৎকারের আওয়াজ। অনেকটা পথ অতিক্রম করে তারা যখন পাহাড়ের চড়াই পথে উপরে উঠতে লাগল, তখনও তাদের কানে হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল সেই হতভাগ্য জন্তুটার কান্না ভরা গোঙানি।

একদিনের ভেতর বহুবার মরণের মুখোমুখি হয়ে কয়েকমাইল পথ অতিক্রম করে তারা অবশেষে প্রাণ নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠল। কি জানি কেন, এখানে নিজেদের অনেকটা নিরাপদ মনে করল তারা। সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে তারা রাত্রির মত বিশ্রামের জন্য তৈরী হল। একসঙ্গে দু'জনের ঘুমিয়ে পড়লে না। পালা করে ঘুমাতে হবে। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে সারারাত।

প্রথম পাহারার ভার নিল সুব্রত। অভিজিৎকে জাগিয়ে দিয়ে সে যখন শুয়ে পড়ল তখন চাঁদ ডুবে গেছে। আবছা অন্ধকারে একাকার হয়ে মিশে আছে সব পাহাড় উপত্যকা। কান খাড়া করে অভিজিৎ বসে রইল। চোখে কিছু দেখা যায় না বটে, কানে তো শোনা যেতে পারে। জন্তু জানোয়ার এলে তার শব্দও পাওয়া যাবে।

হাতে রাইফেল। কিন্তু রাইফেল দিয়ে কি ডাইনোসর মারা যাবে? অভিজিৎ ভাবতে থাকে। মাথা ছোট হলেও ডাইনোসরের দেহটা বিশাল। সব অতিকায় জীবেরই তাই। ওদের প্রাণকেন্দ্র তাই মস্তিষ্কে নয়, সারা দেহে ছড়ানো। একটা দুটো রাইফেলের গুলি যেখানেই লাগুক না কেন—তাতে ওদের ঘায়েল করা যাবে না। এখন যদি একটা ডাইনোসর এসে পড়ে?

অভিজিতের মনের আতঙ্কই কি অদূরে অন্ধকারটাকে জমাট-বাঁধা একটা আবছা মূর্তিতে পরিণত করল? কি ওটা? ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মাটি শুঁকে শুঁকে? পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে থপ্ থপ্ থপ্!

টর্চ ফেলল অভিজিৎ। আর সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল। ডাই-নোসরই বটে! সেই ডাইনোসরটাই। একটু দূর থেকেও বোঝা

যাচ্ছে ওর কোলা ব্যাঙ-এর মত কালো মুখটা ইগুয়ানোডনের লাল রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।

অত বড় ইগুয়ানোডনটাকে নিশ্চয়ই ও খেয়ে শেষ করতে পারেনি। তবু গন্ধ শুঁকে শুঁকে আবার এতদূর আসছে কেন? আর কিছু নয়— জঘন্য হিংসাবৃত্তি!

সুব্রতকে জাগাতে গিয়েও নিবৃত্ত হল অভিজিৎ। এইমাত্র ঘুমিয়েছে বেচারী সারাদিনের পরিশ্রমের ও উত্তেজনার পরে। ঘুমাক সুব্রতদা, দেখা যাক্, একাই সে জানোয়ারটার সঙ্গে পেরে ওঠে কিনা। হাজার হলেও ওটা জন্তু আর অভিজিৎ মানুষ! রাইফেলে না মরুক, ভয় দেখিয়ে বা কোন কৌশলেও কি ওকে তাড়ানো যাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি এসে গেল অভিজিতের মাথায়। তারা যে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে তা তখনও জ্বলছে। সেখান থেকে একখানা লম্বা জ্বলন্ত কাঠ সে তুলে নিল। তারপর সেটা হাতে করে সে দৌড়ে গেল অতিকায় জানোয়ারটার দিকে। আরও এগিয়ে এসেছিল সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা। অভিজিৎ হঠাৎ জ্বলন্ত কাঠটা তার একটা চোখের ওপর ঠেসে ধরল।

তাতে কাজ হল যেন জাদুমন্ত্রের মত। অদ্ভুত একটা আওয়াজ তুলে অত বড় জানোয়ারটা পিছিয়ে গিয়ে এক লাফে প্রায় তিরিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। অভিজিৎ ফিরে এল নিজের জায়গায়। আগুনের জ্বালা সহ্য করা কোন জন্তুর পক্ষেই সম্ভব নয়, ডাইনোসরসের পক্ষেও যে সম্ভবপর হবে না তা বুঝতে বাকী রইল না অভিজিতের।

সুব্রত ঘুমুচ্ছে। এত বড় কাণ্ডটা সে টের পায়নি। যাক্, এখন অভিজিৎ অনেকটা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ওকি? দূরে ও কিসের আওয়াজ? বনমানুষের কি? তা হতেও পারে। কিন্তু তার সঙ্গে আবার মানুষের কোলাহল শোনা যায় যেন! মানুষ এখানে কোথা থেকে আসবে?

দেখা যাক্ কি হয়! ভয় ও অস্বস্তি নিয়ে সময় কাটাতে লাগল

অভিজিৎ। সুব্রতকে ডাকল না। সারাটা দিন গেছে নানা বিপদ ও ঝামেলার মধ্য দিয়ে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কত বিপদ মৃত্যুর সংকেত নিয়ে আসবে তা কে জানে?

আকাশে একটু আলো ফুটতেই চোখে বাইনাকুলারটা তুলে ধরল অভিজিৎ। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখল। ঐ দিক থেকেই নানা রকম শব্দ আসছে।

হঠাৎ চমকে উঠল অভিজিৎ। ও কি! শত শত বনমানুষ জড়ো হয়েছে ঐ পাহাড়ের মাথায়। এখান থেকে খুব বেশী দূর হবে না—তবে একেবারে কাছেও নয়। ভয়ঙ্কর হৈ-চৈ করছে ওরা।

দেখতে দেখতে আরও অনেক বনমানুষ এসে হাজির হল। সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়াল প্রায় হাজারের মত। উঁচু একটা ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে একটা বেশ জোয়ান বনমানুষ ওদের ভাষায় ও সংকেতে কি যেন বলতে লাগল। একটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

ঐ ফাঁকা জায়গাটিতে বাইনাকুলারের মধ্য দিয়ে অভিজিৎ দেখতে পেল একটি লোককে। কাল চেহারা, ঠিক ওয়াংগার মতোই লম্বা চওড়া। পাহাড়ে পোঁতা একটা খুঁটির সঙ্গে শক্ত দড়ি কিংবা লতা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বন্দী বেচারীর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে।

ওয়াংগা নয় তো? কিন্তু অরিজিৎ কোথায়? পাশে তো অরিজিৎকে দেখা যাচ্ছে না।

অভিজিৎ ব্যস্ত হয়ে ঠেলতে লাগল সুব্রতকে—'সুব্রতদা, সুব্রতদা, উঠুন শীগ্‌গীর! আমাদের ওয়াংগা বোধহয় ধরা পড়েছে বনমানুষদের হাতে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল সুব্রত। 'এ্যাঁ, তাই নাকি? কোথায়?'

অভিজিৎ বাইনাকুলারটা তুলে দিল সুব্রতর হাতে। সুব্রত সেটা চোখে লাগিয়ে স্তব্ধ হতবাক হয়ে গেল।…হ্যাঁ, ওয়াংগাই তো! কিন্তু অরিজিৎ কোথায়?

তারা নানা কথা ভাবতে লাগল।

ওদিকে বনমানুষদের কোলাহলের অন্ত নেই। সারা ডাইনী দ্বীপ জুড়ে যেন সাড়া পড়ে গেছে।

আজ বনমানুষদের নরবলি উৎসব।

হ্রদের ওপারে দ্বীপের শেষ সীমানায় পাহাড়ের গায়ে এক সারি গুহা আছে। সেই গুহায় বাস করে আদিম কালো মানুষদের একটা অতি ক্ষুদ্র বংশধারা, সংখ্যায় তারা হাজারখানেকের বেশী নয়। কখন কোন পথ দিয়ে এরা ডাইনী দ্বীপে এসেছিল, তা কেউ জানে না।

যে জলধারাটি—পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে দ্বীপের বুক চিরে হ্রদে এসে মিশেছে, তার এপারে বনমানুষদের রাজত্ব, ওপারে আদিম মানুষদের। বনমানুষরা মানুষের রাজ্যে যায় না, যেতে পারে না। কারণ হ্রদ পেরিয়ে যাওয়ার শক্তি তাদের নেই। কিন্তু মানুষদের বনমানুষদের রাজ্যে না এলে চলে না। তাদের ওদিকটায় মাছ ছাড়া কোন খাদ্য নেই। এমন জায়গা নেই যেখানে একটা গাছ গজাতে পারে বা একটা পশু চরতে পারে। কাজেই ফল আহরণের জন্য বা পশুপালনের জন্য তাদের হ্রদ পেরিয়ে আসতেই হয়। তাদের পশু হল ঐ অতিকায় ইগুয়ানোডন। জন্তুগুলোর গায়ে গোলাকার কাল দাগ এঁকে দিয়ে তারা বনে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। তারা গাছের পাতা খেয়ে বড় হতে থাকে, তারপর মাংসের প্রয়োজনে মালিকরা এসে তাদের গলায় একদিন ছুরি বসায়। এই তাদের পরিণতি!

কিন্তু ইগুয়ানোডন মেরে তার মাংস নিয়ে কালো মানুষেরা সব সময় নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারে না। তাদেরও দু'একজনকে বনমানুষদের হাতে মারা পড়তে হয়। কালো জাতির মানুষরা হাজার হাজার বছর আগে যেদিন প্রথম এসে এই দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিল, সেদিন থেকেই বনমানুষেরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি। দু'জন, চারজন মাঝে মাঝেই মারা পড়েছে

বনমানুষদের হাতে।

কাল দিনের বেলায় ছয়জন কালোমানুষ এসেছিল ইগুয়ানোডন ধরতে। তাদের মাত্র দু'জন প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে, বাকী চারজন বন্দী হয়েছে। আজ তাদেরই হত্যা করা হবে পাহাড়ের মাথা থেকে ছুড়ে দিয়ে। পাহাড়ের নীচে যে সমতল জায়গা আছে—সেই মৃত্যু উপত্যকায় ফেলে দেওয়া হবে বন্দীদের। মাথা আর হাড়গোড়গুলি তাদের গুঁড়িয়ে যাবে।

ওয়াংগাকে দেখতে পেয়েই অভিজিৎ আর সুব্রত সেখানে পৌঁছবার জন্য ছুটে চলল। যদি কোন রকমে উদ্ধার করা যায় ওয়াংগাকে আর সেখানে অরিজিৎকেও খুঁজে পাওয়া যায়!

বনমানুষদের উল্লাসের চীৎকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আকাশ যেন ফেটে যাচ্ছে সেই শব্দে, সারা দ্বীপটা যেন কাঁপছে থর থর করে। খুঁটিতে বাঁধা একটা কালো মানুষকেই দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল অভিজিৎরা। কিন্তু আরও তিনটে মানুষ পড়েছিল তার পায়ের কাছে। বাইনাকুলারের সাহায্যেও তারা এত দূর থেকে তাদের দেখতে পায় নি।

তারা যখন আধ মাইল দূরে, তখন শুরু হল হত্যা উৎসব। একটা মানুষকে মাটি থেকে টেনে তুলে তার হাতের পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। হতভাগ্যটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল শুধু। পালাবার চেষ্টা করল না বা কাকুতি মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা করল না। কারণ তারা জানে দয়ামায়া বলে কোন জিনিস বনমানুষদের অন্তরে নেই। তা ছাড়া এতগুলো বনমানুষদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়াও যাবে না।

দুটো মানুষ ধরল কালো লোকটার দুটো পা আর দু'জন ধরল দুটো হাত। তারপর তাকে চ্যাংদোলা করে দোলাতে লাগল। দোলার বেগ ক্রমেই বাড়ছে। আরও বাড়ছে। হাজারটা বনমানুষ উত্তেজনায় লাফাচ্ছে আর চীৎকার করছে।

সোঁ-ও-ও! ছুড়ে দিয়েছে দেহটাকে বাইরের দিকে। এত জোরে ছুড়েছে যে বোঁ করে সেটা আকাশে উঠে গেল অনেকখানি। তারপর

পাক খেয়ে পড়ে গেল নীচে—অনেক নীচে। মৃত্যু উপত্যকায় পড়বার আগেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তার গলা থেকে কোন চীৎকার শোনা গেল না।

এবার দ্বিতীয় লোকটার পালা। অভিজিৎরা তখনও দূরে। হাওয়ার বেগে ছুটছে তারা। ওয়াংগার আর অরিজিতের পালা আসবার আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে কিনা তা তারা জানে না। আর পৌঁছলেও তারা এতগুলো বনমানুষদের হাত থেকে মাত্র দু'টি রাইফেলের সাহায্যে কি ভাবে অরিজিৎ আর ওয়াংগাকে রক্ষা করবে তাও তারা চিন্তা করেনি। অরিজিৎ আর ওয়াংগা বিপন্ন—তাদের উদ্ধার করতে হবে—এই শুধু তারা জানে।

তৃতীয় লোকটার পালাও শেষ হল—এবার ওয়াংগার পালা। ওয়াংগাকেও চারটে বনমানুষ চ্যাংদোলা করে দোলাতে লাগল। একটু পরেই ছুড়ে ফেলে দেবে শূন্যে। তারপর সেই দেহটা পাক খেয়ে নীচে পড়বে সেই মৃত্যু উপত্যকায়। তারপর অরিজিৎকে—

আর নিজকে স্থির রাখতে পারল না অভিজিৎ। রাইফেলের গুলি ছুড়ল। লাগল না। এখনও পাল্লার ভেতর আসেনি তারা। ছুটতে ছুটতে আবার গুলি করল। এবার সুব্রতও গুলি ছুড়ছে। এক সঙ্গে দুটো গুলি গিয়ে লেগেছে দুটো বন মানুষের গায়ে। যে চারটে বনমানুষ ওয়াংগাকে দোলাচ্ছিল তাদের মধ্যে দুটোই চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল।

কিন্তু গুলি বেঁধবার একটু আগেই তারা ওয়াংগাকে ছুড়ে মেরেছে শূন্যে। ঐ যে পাক খেয়ে পড়ছে তার দেহ—মুহূর্তেই সেটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বনমানুষেরা অবাক হয়ে গিয়েছে—শেষ কালোটাকে ছুড়ে ফেলতে গিয়ে ওদের দু'দুটো মানুষ লুটিয়ে পড়ল কেন? এত হট্টগোলে রাইফেলের আওয়াজ তারা শুনতে পায়নি, আর শুনতে পেলেও হয়ত কিছু বুঝতে পারত না।

আর ওদিকে অভিজিৎ ও সুব্রত ভাবছে—ওয়াংগা গেল! তাদের চোখের সামনেই গেল? এত করে ছুটে এসেও ঐ শয়তানদের হাত থেকে তাকে তারা রক্ষা করতে পারল না। তবে তার মজা এবার দেখুক শয়তানরা!

গুলির পর গুলি ছুটতে লাগল দু'জনের রাইফেল থেকে। একটার পর একটা বনমানুষ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

এবার ওরা দেখতে পেয়েছে শত্রুদের। কেউ কেউ চিনতে পারল —এই শত্রু দু'টোকে কাল উপত্যকার বনের ভিতর মেরে ফেলবার চেষ্টা করে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। কাল একটা বনমানুষ ঘায়েল হয়েছে এদের হাতে। আজ আবার অনেকগুলো ঘায়েল হচ্ছে। কি করে যে এত অনায়াসে এসব হয় তা তাদের ছোট মাথায় আসে না। লাঠির মত দু'টো জিনিস যে তাদের হাতে আছে সে দুটোও তো ছুড়ে মারে না তারা। তা' হলে?

ভয় পেয়ে হাজারটা বনমানুষ মোড় ঘুরে পাহাড় থেকে নেমে পালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অনেকগুলো গিয়ে পৌঁছালও পাহাড়ের ঢাল পর্যন্ত।

ঠিক সেই সময়ে আর একটা বিকট কোলাহল শোনা গেল পাহাড়ের তলা থেকে। এ-কোলাহল কাল রাত্রি থেকেই পাহাড়ের দিক থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। অভিজিৎ শুনতে পেয়েছিল। কারণ তারা নিজেরাই মত্ত ছিল সেই কোলাহল থেকে শতগুণ বেশী কোলাহলে।

কালোদের জাতি এ দ্বীপে আসার পর থেকে কোনদিন যা ঘটেনি, তাই ঘটেছে আজ। যুগ যুগ ধরে তারা নীরবে মার খেয়ে এসেছে বনমানুষদের হাতে। আজ তারা পাল্‌টা মার দেবার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে। তারা তীর ধনুক আর বল্লম নিয়ে ধেয়ে এসেছে বনমানুষদের বংশ ধ্বংস করার জন্য।

কি করে সম্ভব হল এটা? কি কারণে চিরদিনের ভীরুরা আজ

হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠল ?

কারণ এই যে তারা আজ একজন সুযোগ্য নেতা পেয়েছে। আর পেয়েছে তার সঙ্গে একজন সহকারী।

সামনে আচমকা কালোদের বিরাট বাহিনী দেখে বনমানুষেরা হকচকিয়ে গেল। এতগুলো কালো মানুষ তীর ধনুক আর বল্লম নিয়ে তাদের উপর চড়াও হবে এ চিন্তাও তারা কোনদিন করে নি। শুধু তাই নয়, তাদের সামনের সারিতে আছে তীর ধনুক হাতে একজন সাদা মানুষ। এ এক নূতন ঘটনা। ভয়ে তারা আত্মরক্ষার সাহসও হারিয়ে ফেলল। তাদের বিক্রম যত বনের ভেতরেই। পাহাড়ে বা সমতলের উপর ছুটোছুটি করার অভ্যাস তাদের নেই। নীচের মানুষকে গলা টিপে ধরে উপরে টেনে তোলে, ঘাড় মটকে তাকে খতম করে দেয়—এই হল তাদের যুদ্ধ। আজ দলবদ্ধ সশস্ত্র শত্রুর সঙ্গে এই খোলা জায়গায় তারা লড়বে কি ভাবে ?

তা ছাড়াও শত্রু শুধু সামনে নয়, পেছনেও। ওয়াংগার মৃত্যুতে ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে অভিজিৎ আর সুব্রত। পেছন থেকে তারা রাইফেল চালাচ্ছে। বনমানুষরা পড়ছে আর মরছে। ভয়ে একেবারে বুদ্ধিহারা হয়ে পড়ছে তারা। পালাবার চেষ্টা পর্যন্ত না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে লাগল শুধু। পেছনে বন্দুক আর সামনে তীর বল্লম। রক্তের স্রোত বইতে লাগল পাহাড়ের গা বেয়ে। ডাইনী দ্বীপ থেকে বনমানুষের জাতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে।

শেষ দিকে অভিজিৎ আর সুব্রত গুলি চালায় নি। রাগ পড়ে এসেছে বলে নয়, বুলেট ফুরিয়ে যাবে এই ভয়ে। একটা বড় পাথরের চাইয়ের উপর তারা উঠে বসেছে। নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে যুদ্ধের গতি।

প্রায় সব বনমানুষই মারা পড়ল। কিছু সংখ্যক যারা বেঁচে রইল তারা কোথায় পালিয়ে গেল জানা গেল না। এমন সময় দেখা গেল একদল কালো মানুষ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। কিন্তু তাদের

ভেতর সকলের আগে যে আসছে সে তো কালো নয়—তাদের মতই মানুষ। কে সে ?

আরও কাছে আসতেই বোঝা গেল, সে অরিজিৎ। তীর ধনুক হাতে অরিজিৎ এগিয়ে আসছে আগে আগে। তার পেছনে বল্লম হাতে ও কে ? ওয়াংগা নয় ? হ্যাঁ, ওয়াংগাই তো ? সে কি তা'হলে বেঁচে আছে ? তারা কি তা'হলে একটু আগে বনমানুষের হাতে দোল খেয়ে যাকে মরতে দেখেছিল, সে ওয়াংগা নয় ?

কাছে এসে অরিজিৎ চেঁচিয়ে উঠল—'দাদা, সুব্রত দা !' ওয়াংগাও 'বাওয়ানা' বলে উল্লাস ধ্বনি করে উঠল।

সুব্রত জড়িয়ে ধরল অরিজিৎকে আর অভিজিৎ ওয়াংগাকে। পরস্পর আদর আর ভালবাসা বিনিময় যেন শেষ হতে চায় না।



বারো

ওয়াংগা আর অরিজিতের মুখে শোনা গেল সব কাহিনী।

অভিজিৎরা তাদের দু'জনকে তাঁবুর পাহারায় রেখে পাহাড়ের পথ খুঁজবার জন্য বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তারা ভাবতে লাগল, এখানে চুপচাপ বসে থেকে লাভ কি ? এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে, মাঝে মাঝে এসে দেখবে তাঁবুর জিনিসপত্র ঠিক আছে কি না।

অভিজিৎরা গিয়েছিল বাঁদিকের পথে, তারা বেরুল ডাইনে। নক্সায় তারা দেখেছিল ডানদিকে একটা নদী আছে। ভাবল, নদীটাই দেখে আসা যাক্।

বনের ভেতর বেশ খানিকটা গিয়েছে, এমন সময় অবাক হয়ে দেখল, ঠিক ওয়াংগার মত কালো একদল মানুষ সেখানে। তারা গাছে উঠে ফল পাড়ছে। ছোট ছোট কোন জন্তু পেলে শিকার করে হাতে ঝুলিয়ে রাখছে। তারা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে নদীর দিকে।

নদীর কাছাকাছি এসে দু'দল মুখোমুখি হল। ওরা কালো, ওয়াংগাও কালো। ওয়াংগা বন্ধুভাবে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। কিন্তু নাগালের ভেতর আসতেই ওরা সবাই এক সঙ্গে আক্রমণ করে ওয়াংগাকে বেঁধে ফেলল। শুধু তাই নয় অরিজিৎকেও বেঁধে ফেলল। অরিজিৎ প্রতিরোধ করার কোন সুযোগই পেল না। তার রাইফেলটাও হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল।

এমন কাণ্ড করার কি যে উদ্দেশ্য তা কিছুই বুঝতে পারল না ওয়াংগা আর অরিজিৎ। দু'জনেই বন্দী হল।

নদীর ধারে এসে কালোরা মিলিত হল আরও একদল স্বজাতির সঙ্গে। সবাই কিসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করছে। ওয়াংগা দেখল—ওদের দৃষ্টি পাহাড়ের গায়ের সেই জায়গাটায়—যেখান দিয়ে নদী বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের বুকের ভেতর থেকে।

ঝরণার মত জল নামছে আর পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ দেখা যাচ্ছে একটা। তিনখানা ছিপ নৌকা ওদের ছিল, ওরা ওয়াংগা আর অরিজিৎকে নিয়ে একটাতে উঠে বসল। পাহাড়ী নদীতে তখন ভাটি। জল যতদূর নামবার, নেমে গেছে। জলের উপর সুড়ঙ্গের ছাত তখন প্রায় মাথা সমান উঁচুতে। কিন্তু ভাটির টান তখনও প্রবল। কালোরা তখনও অপেক্ষা করছে।

অবশেষে জোয়ার শুরু হল। জল ঢুকতে লাগল সুড়ঙ্গের ভিতর। আর সেই জোয়ারে ছিপ ভাসিয়ে ওরাও সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, তবু নৌকা চালাতে ওদের অসুবিধা হল না। পথ ওদের খুবই পরিচিত—সুড়ঙ্গ খুব সরু নয়, খুব নীচুও নয়। তবে জোয়ার আর একটু ভরে উঠলেই নৌকার লোকদের মাথা সুড়ঙ্গের ছাতে ঠেকে যাবে।

কিন্তু জোয়ার ভরে উঠবার আগেই নৌকা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়ল।

নদী গিয়ে পড়েছে হ্রদে। হ্রদ বেশ চওড়া। আর হাজার হাজার রকম জলজন্তুতে ভরা। কিন্তু কালোরা নির্ভয়ে পেরিয়ে গেল হ্রদ। হ্রদের উপরেই পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে সারি সারি গুহাতে এই কালো লোকগুলি বাস করে। কত যে গুহা তার সংখ্যা নেই। গোটা জাতিটাই বাস করে ঐ সব গুহা-ঘরে।

ওপারে পৌঁছে ওরা অরিজিৎ আর ওয়াংগার বাঁধন খুলে দিল। এদিক ওদিকে যাওয়া আসার কোন নিষেধ তাদের রইল না। কেবল ওরা নজর রাখল নৌকা নিয়ে যেন ওয়াংগা আর অরিজিৎ পালাতে না পারে। ক্রমে ক্রমে ওয়াংগা আর অরিজিৎ ওদের ভাষা বুঝতে শিখল। তাদের কথাও কালো লোকগুলি কিছু কিছু বুঝতে লাগল।

সেই সময়ে একদিন গোটা গুহা অঞ্চলে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কি ব্যাপার? তারা জানতে পারল ছয় জন মানুষ মাংস আনতে হ্রদ পেরিয়ে বনে ঢুকেছিল, চারজন বনমানুষদের হাতে ধরা পড়েছে। এমন নাকি মাঝে মাঝেই হয়।

ওয়াংগার মনে পড়ল, বড় বাওয়ানার চোখ উপড়ে নিয়েছিল ঐ বনমানুষরাই। কাজেই ওয়াংগার খুবই রাগ ছিল বনমানুষদের উপর। ওয়াংগা তখন অরিজিতের সঙ্গে পরামর্শ করে কালো লোকগুলিকে বোঝাতে লাগল, তারা চেষ্টা করলেই ঐ শয়তানদের শেষ করতে পারে। পাঁচশো জোয়ান অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলে বনমানুষরা কতক্ষণ যুঝবে তাদের সঙ্গে? তাদের তো অস্ত্র নেই।

কালোরা বলল, 'এসব তো আমরা কোনদিন করিনি। ঠিকভাবে করতে পারব কি?'

অরিজিৎ আর ওয়াংগা বলল, 'আমরা তোমাদের সব দেখিয়ে দেব। ভয় কি তোমাদের? ঐ বনমানুদের কাছে কেন তোমরা মার খাবে?'

কালোরা উৎসাহিত হয়ে উঠল। কোথায় কোন্ পাহাড়ের মাথা থেকে বনমানুষেরা কালোদের ছুড়ে ফেলে, তা কালোরা জানে। তারাই ওয়াংগা আর অরিজিৎকে পথ দেখিয়ে দিল। লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে চলল কালোর দল। অরিজিৎ হল দলের নেতা। সঙ্গে রইল ওয়াংগা। কলেজ জীবনে অরিজিতের তীর ছোঁড়ার অভ্যাস ছিল। সে হাতে নিল তীর ধনুক আর ওয়াংগা নিল বল্লম।

কালোদের ভাগ্য ভাল ছিল যে সেই সময়ে অভিজিৎ আর সুব্রতও রাইফেল নিয়ে হাজির ছিল। পেছন থেকে তারা গুলি না চালালে কালোরা এত সহজে বনমানুষদের ধ্বংস করতে পারত না।

কালোদের গুহারাজ্যে অতিথি হতে হল অভিজিৎ আর সুব্রতকে। যাদের সাহায্যে যুদ্ধ জয় হয়েছে ; সেই পরম বন্ধুদের একটু খাতির যত্ন না করে কালোরা ছাড়বে না। ওয়াংগা ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল যে বাওয়ানাদের বা তার নিজের গতিবিধির উপর কালোরা কোন বাধানিষেধ আরোপ করবে না। যখনই এরা হ্রদের এপারে আসতে চাইবে, তখনই নৌকা করে কালোরা তাদের এপারে রেখে যাবে।

হ্রদের এপার ওপার দেখা যায় না। কাল জল মাঝে মাঝে টগবগ করে ফুটে উঠছে। অথচ সে জল সাধারণতঃ গরম নয়। জলস্তম্ভ উঠছে এক কোণে, সবুজ রংয়ের বিশাল বিশাল সাপ ফণা তুলে সাঁতার দিচ্ছে অন্য দিকে। অভিজিৎদের নৌকার অল্প দূরেই একটা সরু লম্বা গলা উঁচু হয়ে উঠল একবার। সেই গলার নীচে যে ধড়টা একবার পলকের জন্য দেখা গেল সেটা একটা তিমির মত প্রকাণ্ড এবং মোটা।

পেলসিওরাস! পেলসিওরাস! বলে চেঁচিয়ে অরিজিৎ রাইফেল বাগিয়ে ধরেছিল, ওয়াংগা তাকে গুলি চালাতে নিষেধ করল। বলল, 'এরা শুধু মাছ খায়, মানুষের কোন ক্ষতি করে না। কেন ওদের মারবে?'

হ্রদের পাড়েই পাহাড়। পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় যতদূর দৃষ্টি

যায়—ততদূর লম্বা একসারি গুহা। গুহাগুলির সামনে একফালি সরু চাতাল। ঠিক টানা বারান্দা যেন একটা। সরু সিঁড়ি—পাহাড়ের গা কেটে বের করা হয়েছে হ্রদের তীর থেকে বারান্দা পর্যন্ত। ওঠা নামা চলে তারই সাহায্যে। ওয়াংগা বলল, 'আমি জানতে পেরেছি শত্রু এলে এই সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তারা বল্লম আর তীর ছুড়তে থাকে।'

'এখানেও শত্রু?' জিজ্ঞেস করল সুব্রত।

ওয়াংগা বলল, 'শত্রু ওপার থেকে আসে না, হ্রদ থেকেই ওঠে। সে বড় ভয়ানক শত্রু। আমি দেখি নি এখনও, দেখবার সাধও নেই।'

সাধ না থাকলেও দেখতে হল পরের দিনই। বেলা প্রায় দুপুর হয়েছে, এমন সময় একটা নৌকা দেখা গেল হ্রদের মাঝখানে। একজন মাত্র লোক তাতে।

কে আসে? কে আসে? নানা জল্পনা কল্পনা করে কালোরা। কারণ তাদের কোন লোক আজ সকালে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বলে তাদের জানা নেই।

লোকটা প্রথমে একটু গড়িমসি ভাবে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। গুহার সামনে কালোদের জমায়েত দেখে এগোবে কি পিছিয়ে যাবে ঠিক করতেই পারছিল না যেন। কিন্তু হঠাৎ তাকে মন স্থির করে এগোতে হল সামনের দিকেই—অর্থাৎ গুহারাজ্যের দিকে। তার পেছনে জল থেকে মাথা তুলল এক ভয়াবহ জীব। অভিজিতের মনে হল—এ তাদের পরিচিত সেই ডাইনোসর। কিন্তু ডাইনোসর কি জলে বাস করে? শোনা যায় নি তো! এটা—এটা—অভিজিতের চট্ করে মনে পড়ে গেল—এ তা হলে স্ট্রেগোসরাস—যারা জলে স্থলে সমান চলাচল করতে পারে। কিন্তু আঘাত না পেলে আক্রমণ সহজে কাউকে করে না। ঐ নৌকার আরোহী কি তা' হলে আঘাত করেছে ঐ জন্তুটাকে।

হয়ত তাই। তা না হলে জন্তুটা এমন আক্রোশে ওই নৌকার পেছনে ছুটে আসছে কেন? কি ভয়াবহ ব্যাপার! জলের উপর উঁচু হয়ে উঠছে একটা তালগাছের মত। তারপর ভীষণ শব্দে

ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামনের দিকে। যত জোরেই নৌকা ছুটুক, ওর হাত থেকে আর পরিত্রাণের উপায় নেই।

লোকটা একবার পেছনের দিকে তাকায় আর চীৎকার করে উঠে। সামনের দিকে ফিরে পাগলের মত হাত নেড়ে সাহায্য প্রার্থনা করে। কে সাহায্য করবে? কিভাবেই বা সাহায্য করবে? এতদূর থেকে তীর ছুঁড়ে জলের ভেতরকার শত্রুকে ঘায়েল করা যাবে না। আর বল্লম দিয়ে ঘায়েল করার তো কোন প্রশ্নই নেই।

সুব্রত বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে! কিন্তু অভিজিৎ? সে ছটফট করছে লোকটার বিপদ দেখে। অবশেষে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। জন্তুটা নাগালের ভেতর এসে পড়েছে মনে হতেই সে গুলি ছুঁড়ল। স্টেগোসরাসটা তখন লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য খাড়া হয়ে উঠেছে। গুলি গিয়ে বিঁধল তার বুকে। একটা গুলিতে অত বড় জন্তুর ঘায়েল হবার কথা নয়, কিন্তু ঝাঁপ না দিয়ে সে ডুব দিল জলের ভেতর, আর উঠল না।

'যাক, লোকটা এ যাত্রায় রক্ষা পেল।' বলে উঠল অভিজিৎ।

'কাকে রক্ষা করলে?' বাইনাকুলার নামিয়ে রেখে অদ্ভুতভাবে হাসল সুব্রত। 'ও যে ইন্দ্রনীল!'

চমকে উঠল অভিজিৎ—'অ্যাঁ ইন্দ্রনীল!'

ব্যাপার বিচিত্রই বটে!

ওয়াংগা আর অরিজিৎকে যখন কালোরা ধরে নিয়ে যায়, নৌকা নিয়ে যখন তারা পাহাড়ের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে, তখন গাছের মাথায় লুকিয়ে ইন্দ্রনীল তা দেখেছিল। পাহাড় পেরোবার রাস্তা যে এইখানে, ভাটির শেষে জোয়ারের প্রথম মুখে অদৃশ্য সুড়ঙ্গ মুখ যে এক-একবার করে অল্পক্ষণের জন্য দেখা দেয়, তা সে বুঝতে পেরেছিল। নৌকা তার আছে, সেও তাদের পিছু পিছু তখনই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ত। কিন্তু

কয়েকদিন আগে নৌকাডুবি হয়ে তার রাইফেল জলে ডুবে গিয়েছে, খাবার জিনিসও কিছু তার সঙ্গে নেই। অভিজিৎদের আস্তানা খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে ওসব সংগ্রহ করবার মতলব নিয়েই সে বন পেরিয়ে তাঁবুতে এসেছিল। আশার চাইতে বেশী সুযোগ পেয়েছিল সে, তাঁবুটাকে দেখতে পেয়েছিল জনহীন, অরক্ষিত। তু'টি ভাত রান্না করে খেয়ে নিয়ে তারপর প্রয়োজন মত জিনিসপত্র নিয়ে নৌকায় গিয়ে উঠবে এই ছিল তার মনের অভিপ্রায়। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। টেরোড্যাক্টাইলের ঠোঁটের আঘাতে সে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে রইল। তাকে বাঁচাল অভিজিৎরাই।

সুস্থ হয়েই সে শয়তানী মতলব ফাঁদতে বসল। নিজে যে পাহাড় পেরুবার পথ আবিষ্কার করেছে—সে কথা একদম চেপে গিয়ে সে পরামর্শ দিল পাহাড়ের মাথায় উঠে গাছ কেটে সেতু তৈরী করবার। তারপর সেতুর উপর দিয়ে অভিজিৎ ও সুব্রত পার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সেতু ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল। সে অভিজিতের মুখেই শুনেছে পাহাড়ের মাথায় হিংস্র বনমানুষদের রাজ্য। শত্রুরা পাহাড়ে উঠে বনমানুষদের হাতে মারা পড়ুক, সে ওদিকে সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে নিরাপদে পৌঁছাবে হীরের মুলুকে। নিরাপদে সে নিশ্চয়ই যাবে, কারণ ঐ কালোর দল তো নিরাপদেই এল আর গেল।

মনে তুষ্টবুদ্ধি থাকলে কিন্তু তাদের বিপদও আবার ঘটে পদে পদে। পাহাড় থেকে নামবার সময় পড়ে গিয়ে তার পায়ে আঘাত লাগল। তাই সুড়ঙ্গপথের অভিযানে যাত্রা করতে তার দেরি হয়ে গেল তুটো দিন। সুস্থ হয়েই সে রওনা হয়ে পড়ল। নৌকা অভিজিৎরা নদীর পাড়ে রেখে এসেছিল, অল্প খুঁজতেই সেটা সে পেয়ে গেল।

নিরাপদেই সে হীরে উপত্যকায় পৌঁছাল বটে, কিন্তু তুটো দিন তার দেরি হয়েছে, আর এই তুটো দিনের মধ্যেই সব কিছু উল্‌টে গেছে একেবারে। অভিজিৎ আর সুব্রতকে এখন ডাইনী দ্বীপের রাজা বললেই চলে।

পরের দিন বেত ও বাঁশ দিয়ে চারখানা খাঁচা তৈরী করে নিয়ে এল কালোরা। অরিজিতের পরামর্শ মতই তৈরী হয়েছে এগুলি। খাঁচাগুলি মানুষের শরীরের অর্ধেক মাপের। উপরের দিকটা গোল, নীচের দিকটা সরু! হাত দুটো বাইরে রেখে পিঠ আর বুকের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া যায়। তাতে মাথাটা থাকবে নিরাপদ। অথচ দু'হাত দিয়ে সব কাজ করা চলবে। চারটি খাঁচা আর একখানা নৌকা নিয়ে অভিজিতরা বিদায় নিল সেখান থেকে। ইন্দ্রনীল একা দূরে বসেছিল, তাকেও ডেকে বলল, 'চলি আমরা।'

ইন্দ্রনীল কোন জবাব দিল না।

হ্রদ পেরিয়ে প্রান্তর, প্রান্তর পেরিয়ে টেরোড্যাক্‌টাইলদের ডোবা। এবার চারজনে খঁাচা মাথায় দিয়ে ডোবার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। কালোরা রাক্ষুসে পাখির ভয়ে লুকিয়ে রইল জঙ্গলের ভিতরে।

খঁাচা মুড়ি দিয়ে সুব্রত আর অভিজিৎ নামল গিয়ে ডোবার ভিতর। তাদের কাঁধে রাইফেল থাকলেও হাতে একখানা করে বড় ছোরা। অরিজিৎ আর ওয়াংগা খঁাচা মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডোবার পাড়েই। অরিজিতের হাতে রাইফেল আর ওয়াংগার হাতে বর্শা।

মানুষ দেখেই মেয়ে টেরোড্যাক্‌টাইলেরা চীৎকার করতে লাগল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। আর পুরুষ পাখিরা চক্কর দিতে লাগল ওদের মাথার উপর। তারপর চলল আক্রমণ। পাখিরা শেঁা করে নেমে আসে, ছোঁ মারে ধারাল ঠোঁট দিয়ে কিন্তু ওদের ঠোঁটের ঠোক্কর খঁাচার শক্ত বেত আর বাঁশে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। সুব্রত ও অভিজিৎ খঁাচার ফাঁক দিয়ে দেখে গুলি চালায়।

অরিজিৎ ও ওয়াংগা এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। এবার তারাও নেমে পড়ল। ধীরে ধীরে নেমে পড়ল ডোবার একেবারে তলায়—নীল কাদার ভিতর। যে সব পাখিরা আকাশে উড়ছে তাদের বেশী আক্রোশ গিয়ে পড়ল অরিজিৎ আর ওয়াংগার উপরে। তারা কিন্তু আক্রমণকারীদের বিশেষ গ্রাহ্যই করছে না, কারণ খঁাচার ভেতর তারা

নিরাপদ। কোন পাখি খাঁচার ফোঁকরে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিয়ে কোন সুবিধা করতে পারে না।

চটচটে থক্‌থকে কাদার ভেতরে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে কী যেন খুঁজছে সবাই। মাঝে মাঝে পাচ্ছেও। এক একটা ছোট ছোট ঢেলা। কোমরে ঝুলান ব্যাগের ভেতর ঢেলাগুলো ফেলে দিয়ে আবার তারা নতুন করে খোঁজা স্থুরু করছে।

অনেকক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে তারা উপরে উঠে এল। তখন তারা কাদামাখা ভূত। চারজনে একত্র হয়ে ফিরে চলল নদীর দিকে। কালোরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বিশেষ করে অরিজিৎ আর ওয়াংগার চেহারা দেখে অবাক। সবাই তখন জলে নেমে স্নান করছে! কিন্তু ঐ কাদা কি সহজে গা থেকে উঠতে চায়?

পাথরগুলো কিন্তু ব্যাগ থেকে কেউ আর তখন বের করল না। হীরার সন্ধান কালোদের দিয়ে লাভ কি? অবশ্য হীরার মূল্য ওরা জানে না। কিন্তু ওর উজ্জ্বলতা দেখলে গয়না করবার জন্য ওরা ক্ষেপে উঠতে পারে।

স্নান সেরে উঠে অভিজিৎ ও স্থব্রত নৌকায় চেপে বসল। একটু পরেই উঠল অরিজিৎ আর ওয়াংগা। কালোরাও উঠে দাঁড় ধরল। অতিথিদের পাহাড়ের বাইরে রেখে আসবে ওরা স্নুড়ঙ্গ পেরিয়ে।

কালোরা ফিরে এল পরের দিন।

হেসে হেসে কত গল্প তাদের গাঁয়ের লোকের কাছে। রাক্ষুসে পাখির ডোবার মধ্যে গিয়ে খাঁচা মুড়ি দিয়ে কত কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করেছে অতিথি মানুষেরা। কি পেয়েছে কে জানে! তারা গাছের মগডালে বসে দেখেছে শুধু।

ইন্দ্রনীল সব কথা শুনতে পেল। কতক বুঝল, কতক বুঝল না। বুঝল শুধু রাক্ষুসে পাখির ডোবা…খাঁচা মুড়ি দেওয়া ও কাদা ঘাঁটা। কিছুটা ইঙ্গিতে, কিছুটা আভাসে কয়েকটা কথা বুঝে নিয়ে সে উঠে

দাঁড়াল্। বিদায় চাইল কালোদের কাছে। নৌকা তার নিজেরই আছে। অভিজিৎরা ঘৃণা করে নিজেদের নৌকাখানাও তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায়নি।

হ্রদ পেরিয়ে প্রান্তর। কিছুদূর যেতেই নদীর ধারে দেখতে পায় অভিজিৎদের পরিত্যক্ত চারখানা বাঁশ ও বেতের তৈরী খাঁচা। ঘটনাস্থল তা' হলে এখানেই—সে কথা ইন্দ্রনীল বুঝতে পারে।

একখানা খাঁচা মুড়ি দিয়ে হেঁটে চলল ইন্দ্রনীল। কিন্তু খাঁচা কি ভাবে বুকে পিঠে বাঁধবে তা সে জানে না। কাজেই কোন রকমে মুড়ি দিয়েই সে চলল। চললে চলতে ভাবল—অভিজিৎরা শুধু শুধু নিশ্চয়ই কাদা ঘাঁটে নি। বিজ্ঞান পড়েছে ইন্দ্রনীলও। আগ্নেয়গিরির নিভন্ত গহ্বরে যেখানে কাদা দেখতে পাওয়া যায়, হীরাও পাওয়া যায় সেখানে—এটা সে শুনেছে।

হীরে অভিজিৎরা পেয়েছে। তাকেও পেতে হবে।

কিন্তু ও কি! টেরোড্যাক্‌টাইলেরা ঝাঁক বেঁধে আসছে। তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে যেন। আক্রোশে আক্রমণ করতে আসছে শত্রুকে। ইন্দ্রনীলের কোন অস্ত্র নেই প্রতিরোধ করবার।

ঠোঁট দিয়ে খাঁচা কামড়ে ধরে পাখিগুলি সোজা উপরে উঠে যায়—আর খাঁচাও দুলতে দুলতে উঠে যায় হাওয়ার রাজ্যে।

মুহূর্তের মধ্যে প্রায় বিশটা রাক্ষুসে পাখির ঠোকর এসে পড়ে ইন্দ্রনীলের মাথায়। মাথা ফুটো হয়ে যায়। রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোতে থাকে।

অভিজিৎ! বাঁচাও ভাই—বাঁচাও!! কাতর চিৎকার করতে করতে লুটিয়ে পড়ে হতভাগ্য ইন্দ্রনীল। তার দেহটা আচ্ছন্ন হয়ে যায় টেরো-ড্যাক্‌টাইলদের পাখার নীচে। হীরে পাবার লোভ এ জন্মের মত তার শেষ হয়ে যায়।

অভিজিৎ, সুব্রত, অরিজিৎ আর ওয়াংগা তখন ভেলায় চড়বার জন্য

তৈরী হচ্ছে। তারা যাবে ওটম্বা থেকে মাচাং দ্বীপ, মাচাং থেকে অরিগোণ্ডা। অরিগোণ্ডাতে কাঠের নৌকা আসে মাঝে মাঝে। বড় বড় সমুদ্রগামী বজরা কাঠ বোঝাই করে নিয়ে যায় অরিগোণ্ডা থেকে, সেই কাঠ পৌঁছে দেয় মায়মুনা দ্বীপে। কিছুদিন অপেক্ষা করলে সেখান থেকে স্টীমলঞ্চও পাওয়া যেতে পারে।

ওয়াংগা এখানকার পথঘাটের খবর অনেক কিছু জানে।

সুব্রত বলল, 'কোন রকমে আমরা দেশে পৌঁছে যেতে পারবই।'

অভিজিৎ বলল, 'পৌঁছে তো যাবই, ফিরেও আসব আবার। যদি না-ও আসি, এখানে এমন এক চিহ্ন রেখে যাব যা দেখে ভবিষ্যতের যে কোন অভিযাত্রী বুঝতে পারবে, এখানে এক সময়ে এসেছিল কয়েকটি দুঃসাহসী বাঙালী ছেলে—যারা মৃত্যুকে ভয় করেনি।'

অরিজিতও তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেল পতাকা ও কাঠের দণ্ড তৈরী করতে। পাথরের গায়ে নাম খোদাই করবে আর পুঁতে দেবে তাদের বিজয়ের পতাকা।

